অমৃত ছিল না

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬

এগারো টাকা

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : গৌতম রায়

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে শ্রী এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসুভাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীভারতী প্রেস ১১৪।১এ রাজা রামমোহন সরণি, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

শ্রদ্ধেয়া ছোটমাসি,

শ্রীমতী রহিমা বেগমকে

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের

বিভ্রান্ত

অমৃত ছিল না

এক

কে এই আগন্তুক : একটি রম্যরচনা (?)

দোমোহানীঘোষের ডাঙার ইদানীং চাঞ্চল্যকর খবর 'ফটিকের প্রত্যাবর্তন কিংবা রতনকুমারের আগমন : কে এই আগন্তুক ?'

নোলে ভটচাষের দোমোহানী পল্লীবার্তায় প্রথম পাতায় বেরিয়েছে। যুক্তি, কটাক্ষ, কৌতুক এবং রহস্য আছে। কয়েকটি কুও আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, স্থানীয় লোকেরা খালি লেখাটারই প্রশংসা করল। রহস্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাল না। এমন কী, দোমোহানী থানার দারোগা নীলমণিবাবু প্রগতি প্রেসের সামনে দিয়ে সাইকেল চেপে যেতে-যেতে আধ মিনিটের জন্মে থেমে বলে গেলেন—ভেরি ভেরি ইণ্টারেস্টিং র‍্যাইটিং, নলিনীবাবু! খুব এনজয় করেছি।

রাস্তার একপাশে দোমোহানী, অন্যপাশে ঘোষের ডাঙা। এই রাস্তা এবং দুই গাঁয়ের মাঝখানে নোম্যানস্ ল্যাণ্ডের মতো সেকালের পোড়ো জমিগুলোতে এখন বেশ জমজমাট বাজার হয়েছে। বাজারের শেষ দিকটায় রাস্তা যেখানে ঘুরেছে, সেখানে বাঁকের মুখে দুটো বাঁশের ডগায় একফালি টিনের সাইনবোর্ড আছে। তাতে আলকাতরা লেপে সাদা অয়েলপেণ্টে লেখা আছে : 'প্রগতি প্রেস। এখানে যাবতীয় ফরম, বিয়ের পদ্য, রেজিস্টার বহি ইত্যাদি সুলভে ছাপা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয় !!'

তার তলায় : 'দোমোহানী পল্লীবার্তা। দলমতনিরপেক্ষ স্বাধীন ও নির্ভীক পাক্ষিক। পল্লীবাংলার নিজস্ব মুখপত্র। সম্পাদক—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য সাহিত্যভারতী কাব্য সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ। বার্ষিক চাঁদা বারো টাকা। ষাণ্মাসিক ছয় টাকা। ত্রৈমাসিক তিন টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৬০ পয়সা মাত্র। নিজে পড়ুন, অপরকে পড়ান !!'

চারফুট-তিনফুট সাইনবোর্ডে এত সব কথা পড়তে গেলে খুব কাছে এসে দাঁড়াতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে চোখে পড়বে বেড়াঘেরা একটুকরো ফুলবাগিচা। সেখানে টিনের ছোট্ট ফলকে লেখা আছে : 'ফুল দেখুন! ছিঁড়িবেন না।' সামনে বারান্দা। সিমেণ্টের চটা উঠে ফাটাফুটি

অবস্থা। প্লাস্টার করা চুন মাখানো মাটির দেয়াল। টালির চাল। ঘরের কোণায় টুলে বসে কম্পোজ করছেন একজন রোগাটে ঢ্যাঙা ও প্রৌঢ় ভদ্রলোক। গায়ে আধ-ময়লা গেঞ্জি, হাঁটু অ.. টানো লুঙি, পৈতে দেখা যাচ্ছে কাঁধের ফাঁকে। মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের জঙ্গল। লম্বা শক্ত নাকের ওপর চওড়া কপাল। ঝাকড়-মাকড় খয়াখর্বুটে চুলে মাথা ভর্তি। হাতের কাছে হরফের খালি খোপে অনেকগুলো বিড়ি আর দেশলাই আছে। ঘন ঘন বিড়ি টানেন। চশমা নাকের ডগায় ঝুলে আসে ... বার এবং ঠেলে তুলে দিতে গিয়ে নাকে কালির ছোপ। ইনিই নোলে ভটচায।

একটা ট্রেডল মেসিন আছে। নিজেই কম্পোজ করেন। নিজেই প্রুফ দেখেন। নিজেই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে প্যাডেল করে ছাপেন। ঝুলন্ত ষাট পাওয়ার বাল্বের সামনে কাগজ তুলে ছাপার কালি ও স্পষ্টতা পরীক্ষা করেন। বছর পাঁচেক আগে ক্ষুদ্রশিল্প খাতে ঋণ পেয়েছিলেন দোমোহানী ব্লক আপিস থেকে। সেই ... কেও হ্যা ... কিস্তি বাকি পড়েছে। সুদের ফোঁড়া চা ... মুখ তুলেছে। ... হলে গঙ্গাপুজো সারার মতো ব্লক আপিসের হরেকরকম ফরম ছেপে টাকা শোধের মতলব ছিল। তাছাড়া ... কো-অপারেটিভ আছে তারাও আশ্বাস দিয়েছিল, রেগুলার ম্যাটার সাপ্লাই করবে। কোথায় কী? কালেভদ্রে অল্পস্বল্প।

শেষ অব্দি 'দোমোহানী পল্লীবার্তা' পত্রিকাকেই ভরসা করে বসে আছেন।

এই ভরসার কিছু ভিত্তি আছে নিশ্চয়। লোকের মতে, নোলে ভটচাযের কলম খোলে ভাল। ভয়ডর না করে হাটে হাঁড়ি ভাঙেন। সেবার ইলেকশানের মুখে 'ইহা কি সত্য' শিরোনামে পর পর তিন কিস্তি একটা রহস্য ফাঁসের পর কে বা কারা তাঁর প্রেসের ঘরের দেয়ালে কাঠকয়লা বুলিয়ে লিখেছিল ঃ নোলে শালা সাবধান, মুণ্ডু যাবে। ইদানীং পাড়াগাঁয়ে মুণ্ডুপাতের উপদ্রব যথেচ্ছ সত্ত্বেও নলিনীবাবু একটুও ভড়কে যাননি।

আর আজকাল চাঞ্চল্যকর খবর বলতে তো পাড়াগাঁর ব্যাপার-স্যাপারই। কলকাতার দোনকরা পাড়াগাঁকে পাত্তা দেয় না। অথচ কত বিচিত্র ঘটনা ঘটছে এখানে। কত মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি, কেলেঙ্কারি। কত অভাব-অভিযোগ, মগের মুল্লুক কাণ্ড, তাবড়ো তাবড়ো অন্যায়-অবিচার। পল্লীমায়ের দুঃখ-বেদনাকে কে ভাষা দেবে? কে শোনাবে তাকে অভয়বাণী? ওঠ মা ওঠ! মোছ মা তোমার অশ্রুজল! সাত কোটি সন্তান হিন্দু-মুসলমান…

নোলে ভটচায যৌবনে চমৎকার পার্ট করতেন থিয়েটারে। দোমোহানী তরুণ সংঘ 'সিরাজদৌল্লা' শুনে নাক সিঁটকোয়। জেনারেশন গ্যাপ। তা না হলে বামুনের ছেলে শিবু চক্রবর্তী গয়লাদের পেশা নেবে কেন? ডেয়ারি করে একদঙ্গল গাইগরু পুষেছে। হরিয়ানা থেকে ষাঁড় কিনে এনেছে, যার বাবা হাঙ্গেরীয়ান, মা নাকি ভারতীয়।

সেই প্রকাণ্ড ষাঁড়ের আগমন সংবাদও খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।

দোমোহানী পল্লীবার্তায় রসালো একটি ষণ্ড সমাচার বেরিয়েছিল। নোলে ভটচায যখন মাস্টারী করতেন, শিবু তাঁর ছাত্র ছিল। তাই বেনামে না লিখে উপায় ছিল না। ক'দিন ধরে দোমোহানী-ঘোষের ডাঙায় দলে দলে অসংখ্য লোক আসতে দেখে সম্পাদক একটু বোকা বনে গিয়েছিলেন। যেন তাঁর পত্রিকার এই বিস্ফোরণ। পরে বুঝলেন, ও হরি! এ শালারা সবাই ভুষো—গরু ছাড়া কিছু বোঝে না। সেই টানে আসছে।

তাই বলে হাল ছাড়বার পাত্র নোলে ভটচায নন। পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়ার চর্চা বেড়েছে। অথচ্চে গাঁয়ে দু-চারজন করে এ. পাশ, এমন কী এম. এ. বি. টিও গজিয়েছে। দোমোহানী পল্লীবার্তার বড় ভরসা এখানেই। পাড়াগাঁয়ের নিজস্ব মুখপত্র। একদিন না একদিন গ্রামভারত বনাম নগরভারতের মধ্যে বড় রকমের সংঘর্ষ বাধবেই—যদি এমনি অবহেলা বরাবর চলতে থাকে। সম্পাদক সেই আশায় আছেন। তখন এই কুটিরে ফ্ল্যাট মেশিন বসবে। গ্রাহক সংখ্যা বাড়তে থাকবে। পরে একদিন রোটারি মেশিনও এসে যাবে। সেকেণ্ডে বিশ-পঞ্চাশখানা কাগজ বেরিয়ে আসবে। মহকুমার জনসংখ্যা এখনই সাত লক্ষাধিক। এক যুগ পরে দশ লক্ষাধিক হবেই—সেটা ঠেকানো যাবে না। এর সিকিভাগ লেখাপড়া জানলে গ্রাহক পোটেন্সিয়ালিটি মেরে-কেটে দেড় লাখ।

ঘরের কোণায় টেবিল-চেয়ার আছে। গোব্দা ডাইরি আছে। বুকের ভেতর সেই গোপনীয় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ আছে। নোলে ভটচায হতাশার সময় ওখানে বসে এই হিসেব-নিকেশ করেন। বিড়ির সুতো পোড়ার গন্ধে হঠাৎ টের পান, ব্যাপারটা কি আরব্য উপন্যাসের আলনস্করীয় উপাখ্যান হয়ে উঠছে না? তখন তাঁর ভেতরকার শক্ত মানুষটি বলে ওঠে—ছ্যাখ ভাই নোলে! অ্যামেরিকা বল্ অ্যামেরিকা, ইউরোপ বল্ ইউরোপ—তাকিয়ে ছ্যাখ দিকি একবার! ওই হচ্ছে ভবিষ্যৎ। দেশ সে-পথেই এগোচ্ছে রে বাবা! তখন কোথায় আর এই গাঁগেরাম, সবই নগর আর নগর! ওই ছ্যাখ ইলেক-

টিরির খাম্বা। ওই ত্থাখ দড়ির মত মোটা তার। মড়ার খুলির তলায় আড়াআড়ি হাড়। এগারো হাজার ভোল্ট। সাবধান। আর ভাই, নোলে রে! চোখের সামনে এই আড়াই যুগ ধরে দেখছিস্ তো দোমোহানী-ঘোষের ডাঙার রূপান্তর। কী ছিল, কী হয়েছে। অতএব লড়ে যা। তোর হাতে ছাপাখানা, এ যুগের ব্রহ্মাস্ত্র। তোকে ঠেকায় কোন ব্যাটা?

নোলে ভটচায আনমনে কিন্তু-কিন্তু করে বলেন—তদ্দিন কি বাঁচবো রে?

—তুই না বাঁচিস, তোর জামাই বাঁচবে। সে তোর কাগজ চালাবে দেখবি।

নোলে হাসেন।—কী যে বলিস! রাম না হতে রামায়ণ! গাগুর বি এ পার্ট টু পরীক্ষা বাকি। ওর বিয়ের কথা এখন ভাবাই অপরাধ। পাশ করুক। একটা চাকরি-বাকরি হোক-টোক।

—মলো ছাই! মেয়েকে কি আইবুড়ি করে চিরকাল রাখবি? নাকি নিজেও সে তা থাকবে? হাঃ হাঃ হাঃ।

—হেঃ হেঃ হেঃ! হয়তো ঠিকই বলছিস। আজকালকার মেয়ে। তবে গাগুমা ইনটেলিজেন্ট। ভেরি কেয়ারফুল।…

এই স্বগত-সংলাপ আজকের নয়। গত রোববার রাত নটার। তখন পাশের ঘরে গাগু অর্থাৎ গার্গী মঙ্গলকাব্যের নোট মুখস্থ করছিল। নোলে ভটচায আবার একটি বিড়ি ধরিয়ে 'ফটিকের প্রত্যাবর্তন কিংবা রতনকুমারের আগমন: কে এই আগন্তুক' লিখতে শুরু করেন। তার পুরো বয়ান এখানে দেওয়া হল।

"……সম্প্রতি ঘোষের ডাঙায় এক নব্য যুবকের আবির্ভাব ঘটেছে। সে নিজেকে শীতল ঘোষের সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছে—যে কিনা সুদীর্ঘ সতের বৎসর পূর্বে এমনি আশ্বিনের অপরাহ্ণে একটি হাতির পিছু-পিছু গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। শীতল মৃত। তার স্ত্রী তরুলতাও জীবিত নাই। শীতলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণপদ গত বছর ভয়াবহ বন্যায় বিলাঞ্চলে পশুচারণে গিয়ে ভেসে যায় এবং একটি গাছে আশ্রয় নেয়। তিন দিন পরে তাকে রিলিফের নৌকা উদ্ধার করে আনে। কৃষ্ণপদের মুখে রা-বাক্য ছিল না। তদবধি সে বদ্ধ উন্মাদ। বিড়বিড় করে কী সব বলে। সব সময় গম্ভীর। জোর করে খাইয়ে না দিলে খায় না। বাড়িতে থাকে না। পাকা রাস্তায় আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। সে অন্যান্য পাগলের মতো দুষ্টামি-নষ্টামি করে না বলে তাকে বেঁধে রাখা হয়নি।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন: এই হতভাগ্য উন্মাদ কৃষ্ণপদের পক্ষে তো ভ্রাতুষ্পুত্রকে

সনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সময়টাও বড় কম নয়। সুদীর্ঘ সতের বৎসর! তৎকালীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অনেকেই মৃত। কেউ কেউ বেঁচে থাকলেও এখন স্থবির। অন্যান্যদের কথা আর কী বলব? সকলেই হুজুগে মেতে উঠেছে। সকলেই এক-বাক্যে মেনে নিয়েছে এই সেই ফটিক। কৃষ্ণপদের স্ত্রী শৈলবালা কস্মিনকালে ফটিককে দেখে নাই। সে তো সবার আগে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ভাসুরপোর সেবার জন্য ছুটোছুটি শুরু করেছিল। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ করা স্বাভাবিক। কারণ ফটিক নাকি ধনবান হয়ে ফিরে এসেছে। আমরা তার আগমনকালে বাস স্ট্যাণ্ডে উপস্থিত ছিলাম না। শুনেছি, তার সঙ্গে প্রচুর জিনিসপত্র বাক্সোপেঁটরাদি ছিল। একটি টেপরেকর্ডার যন্ত্রও ছিল। সেটি জাপানে নির্মিত। একটি ক্যামেরা ছিল। সেটিও নাকি প্রখ্যাত একটি জাপানী ক্যামেরা। (এত জাপান কেন?) ইহা ছাড়া হরেক প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিদেশী বিলাসদ্রব্যাদির কথাও শুনতে পাই। সে কিছু কিছু দ্রব্য বিতরণও করেছে। ন্টু চক্রবর্তী মহাশয়কে একটি দামী বিলাতী কলম উপহার দিয়েছে। চক্রবর্তী মহাশয় কি ওই কলম দিয়ে বৃদ্ধ বয়সে মেঘদূত লিখবেন? (উনি আমাদের প্রাণাধিক বয়স্য বলেই কিঞ্চিৎ রসিকতা।)

যাই হোক, আপাতদৃষ্টে ফটিকের এসব আচরণে তাকে মহৎপ্রাণ যুবক বলে ধারণা হয়। এই স্বার্থক্লিষ্ট ক্ষুদ্রপ্রাণ সংকীর্ণতা-মনস্ক গ্রাম্য পরিবেশে ঈষৎ উদারতা, স্বীকার করি, মরুভূমিতে মরুদ্যানতুল্য (মরীচিকা নয় তো?) অথচ আমাদের কিছুতেই সংশয় ঘোচে না। সত্যই কি সে শীতলের সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ফটিক—যে এমন এক আশ্বিনের সুন্দর অপরাহ্নে এক সন্ন্যাসীর হাতির পিছু পিছু গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি? শুনতে পাই, শীতলের মৃত্যুর একান্ত কারণ পুত্রশোক। তৎকালে বালকটির বয়স আন্দাজ দশ-এগারো বৎসর ছিল। চেহারাও নাকি বড় লাবণ্যময় ছিল। বৃদ্ধদের কাছে তার রূপের সুখ্যাতি সম্ভবত আমরা শুনে থাকব। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ফটিককে আমাদের দেখার সুযোগ হয় নাই। পরমুখে শুনি, সেও নাকি বড় রূপবান ও লাবণ্যময় আকৃতির যুবক। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। এখানেই কিন্তু রহস্য ঘনীভূত হয়। শীতল ও কৃষ্ণপদ উভয়েরই গাত্রবর্ণ মলিন শ্যাম। উহারা জাতিতে গোপ। উহাদের জীবনের অধিকাংশ সময় প্রান্তরে-প্রান্তরে পশুচারণায় কেটে গিয়েছে। বিস্তর রৌদ্র-বায়ু-শীত-বৃষ্টির প্রহার সইতে হয়েছে। তাহলেও সংশয় ঘোচে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ? তরুলতাকে আমাদের মনে

পড়ে না। জনৈক ব্যক্তির কাছে শুনলাম, তরু গয়লানী নাকি ঈষৎ গৌরবর্ণা ছিল। সত্য কি?

অবশ্য একথা স্বীকার করি, গোপভ্রাতাভগ্নীরা আবাল্য দুগ্ধঘৃতমাখনাদি ভক্ষণের সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং স্বাভাবিক নিয়মে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পশুপালক গোষ্ঠীর লোকেরা রূপবান, চিক্কনদেহী স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিমান হয়। এই স্থলে কিঞ্চিৎ পুরাতাত্ত্বিক বিষয় অবতারণা করতে চাই। পাঠক, বাহুল্য ভাববেন না। আমরা পশুপালক আর্য থেকে ক্রমে মহাভারতে পৌছাব। পরিশেষে ঘোষের ডাঙায় গোপ সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমী উৎসবে শূকর-শিশুনিধনের 'বাধাল' পরবে আপনাদের উপস্থিত করে দিয়ে আপাতত বিদায় নেব। পরবর্তী কিস্তিতে আবার রহস্য। সে নাকি রতনকুমার বলে নিজের নতুন পরিচয় জাহির করতে উৎসুক। কারণ হিসাবে সে বোম্বাই সিনেমা জগতে নিজের বিশদ গতিবিধির গল্পও শুনিয়েছে। স্মরণ রাখা কর্তব্য, বোম্বাই চোরাচালান-চক্রের সুবৃহৎ ঘাঁটি। অতএব পাঠক, আদাজল খেয়ে প্রস্তুত থাকুন। ফটিক রহস্য আরব্য সাগরের জলের মতো লবণাক্তও বটে!……"

॥ দুই ॥

রতনকুমার বনাম নোলে ভটচায

সেদিন সকালে নোলে ভটচায সবে চা খাচ্ছেন, বাঁশের গেটের কাছে কে এসে দাঁড়াল। ভেতর থেকে দেখতে পেয়ে নলিনী বারান্দায় বেরোলেন। চোখ ঝলসে গেল। এ আবার কী মূর্তি রে বাবা! লাল জামা, ঝকঝকে সাদা ঢোলা পাতলুন পরনে। নলিনীর দাড়িতে একটা মুড়ি লেগে আছে। হাতে চায়ের গেলাস। মূর্তিটি যেন গজুবাবুর দোকানের দেওয়ালে সাঁটা পোস্টার থেকে নেমে প্রগতি প্রেসে উঁকি মারতে এসেছে। গা থেকে রঙ চুইয়ে পড়ছে।

দু'তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই নলিনীর পিলে থেকে মগজ অব্দি একটা নীলচে ঝিলিক খেলে গেল। সামলে নিয়ে ভারি গলায় বললেন—কাকে চাই?

আফটার অল তুমি তো সেই শীতু গয়লার পো রে বাবা! বোম্বেতে যাও, আর হিরোই হও—ঘোষের ডাঙায় তুমি ছোকরা সেই ফটকে। সন্ন্যাসীর হাতির পিছন পিছন গিয়ে কতকটা রূপকথার গল্পের মতো একটা কিছু ঘটিয়ে বসে আছ। বেশ করেছ। তা এখানে কী? ওসব ফোর-টোয়েন্টি বোম্বেতে

চলে। এটা দোমোহানী ঘোষের ডাঙা। মহা ত্যাঁদোড় জায়গা। অসংখ্য শিক্ষিত বামুন ভদ্রলোকের বাস। ওসব সুবিধে এখানে হবে না।

নলিনী মনে মনে এসব বলাবলি করছেন। পোস্টারের ঝলমলে মূর্তিটা মাজন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের হাসি হেসে বলল—আসতে পারি স্যার?

এই ছোঁড়াটা কি সারদা বিদ্যাপীঠে তাঁর ছাত্র ছিল? মনে পড়ে না নলিনীর। বছর সাতেক আগে রিটায়ার করেছেন। ঘোষের ডাঙার কিছু ছেলে পড়ত বটে স্কুলে। তাদের কেউই বিশেষ এগোতে পারে নি। কেবল নাথু ঘোষের ছেলে দিবাকর জুনিয়ার ল্যাণ্ড রেভেনিউ অফিসার হয়েছে। থাকে চব্বিশ পরগণা জেলায়। বাড়ি এলেই প্রণাম করে যায়।

আসলে পল্লীবার্তায় সেই রিপোর্টাজ বা রম্যরচনা (এখন রম্যরচনা বলতে রাজী) ছাপানোর পর নলিনী একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন। স্থানীয়দের তত ভয় পান না। চেনা আততায়ীকে তত ভয় করে না মানুষ। আসলে বোম্বাই ব্যাপারটা সুবিধের নয় কিনা। শুধু ভরসা, নলিনী নিজের জায়গায় আছেন। আর ফটিক বা রতনকুমার শীতু ঘোষের ছেলে। ঘোষেরা যতই মারমুখী স্বভাবের লোক হোক, দোমোহানীর বাবুদের তারা ভয় আর সমীহ করে চলে। বর্ণাশ্রম প্রথার বয়স কয়েক হাজার বছর। বাবুরা এখনও বাবু।

নলিনীর দাড়ি থেকে মুড়িটা পড়ে গেল। কারণ তাঁকে আশীর্বাদের জন্য হেঁট হতে হ'ল। ছোকরা এসে একেবারে পা ছুঁয়েছে। নলিনীর নাকে কড়া ঝাঁঝালো সেন্টের গন্ধ ঢুকে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। তিনি ঢ্যাঙা মানুষ। এ ছোকরা অত ঢ্যাঙা নয়। কিন্তু মুখের সামনে জলজ্যান্ত কার্তিক চেহারা —জাত্যাভিমানের সংস্কারে আত্মসম্বরণ করলেন।

—আমাকে চিনতে পারছেন না নিশ্চয়? ছোকরা অমায়িক হেসে বলল। আমিই রতনকুমার। মানে……

নলিনী হেসে বললেন—সে কি আর চিনতে বাকি আছে বাবা? ঘ্রাণেন পরিচিয়তে। এস, এস—ভেতরে এস্।

রতনকুমার বলল—থাক স্যার। বাইরে দাঁড়িয়েই দুটো কথা বলে চলে যাই। রোজই ভাবি, একবার দেখা করে আসি—হয়ে ওঠে না। আজ সোজা চলে এলুম। ভাল আছেন তো স্যার?

নলিনী ব্যস্তভাবে বললেন—দাঁড়িয়ে কী কথা হয় বাবা? তোমার সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে।

বলে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। গয়লার ছেলেকে চেয়ারে বসতে দেওয়া উচিত হবে কি না, এ এক সমস্যা। হঠাৎ কম্পোজিং বোর্ডের সামনে টুলটা দেখে সমস্যার সুরাহা হ'ল।

প্রথমে টুলটা বের করে নিয়ে গেলেন। ফুঁ দিয়ে বললেন—বসো বাবা, এখানে বসো। তারপর চেয়ার বের করে নিজে বসলেন। ঘরের ভেতর টেবিলে চায়ের গেলাসে তখনও আদ্ধেক চা। রেখেই আর মনে নেই।

রতনকুমার দাঁড়িয়েই রইল। মুখে সেই বিজ্ঞাপনের হাসি। বলল—বসব না স্যার। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, আমি ক্লাস থ্রিতে পড়তুম।

নলিনী বললেন—হ্যাঁ। সে কি আজকের কথা? তখন তো প্রাইমারি স্কুল ছিল মোটে। ফিফটি-টুতে হ'ল ক্লাস সিক্স অব্দি, ফিফটি-ফোরে এইট। সিক্সটি থেকে টেন। পরের বছর এ্যাফিলিয়েশান পেল। তারপর তো হায়ার সেকেণ্ডারি হ'ল। নকুলবাবু তাঁর মায়ের নামে······

রতনকুমার কথা কেড়ে বলল—সে তো দেখলুম। বিল্ডিং হয়েছে। কিছু চেনা যায় না। মা মুক্তকেশীর মন্দিরটা অবশ্যি পেছনে পড়ে গেছে। সারানো হয়নি দেখলুম।

নলিনী তেতো মুখে বললেন—দলাদলি। আর বলো কেন? তা যাক গে। এবার তোমার কাহিনীটা শোনা যাক। ভেরি ইণ্টারেস্টিং! উপন্যাসের মতো। বলো বাবা, শোনা যাক।

—কিন্তু আপনি তো দেখলুম সবই জানেন স্যার। আপনার ম্যাগাজিনে লিখেছেন।

নলিনী ওর হাসি ঢেকে জোরালো হেসে বললেন—পড়েছ বুঝি? ওতে কিছু মনে করো না বাবা! বুঝতেই পারছ তো! পল্লীগ্রামে কাগজ চালানো কী কষ্টকর। একটু-আধটু রসালো টিপ্পনী, যৎকিঞ্চিৎ মিসট্রি-ফিসট্রি ঢুকিয়ে না দিলে কেউ পড়তেও চায় না······বলে জিভও বের করলেন। ছি, ছি! তুমি আমার ছাত্র ছিলে। তুমি মিসট্রি-ফিসট্রি ঢুকিয়ে না দিলে কেউ পড়তেও কাছে কতবার এসেছে। কত দুঃখ করেছি! অমন একটা সুন্দর নিষ্পাপ বালক কোথায় যে চলে গেল!

—নিষ্পাপ বালক এখন পাপী হয়ে ফিরেছে। এই তো স্যার?

নলিনী তাকালেন। রতনকুমার এখনও হাসছে। কিন্তু এতক্ষণে মনে

হল, এই হাসিতে কী একটা আছে। ফের জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললেন —ছি ছি! তা আমি বলিনি!

—না স্যার, বলেছেন।

—আহা! কথাটা……

—আপনি বলেছেন আমি স্মাগলার। বোম্বেতে স্মাগলিং করতুম।

—না রে বাবা, না! ওটা স্রেফ রসিকতা। কাগজে না লিখলে……

—স্যার, দোমোহানীর বরুণ ব্যানার্জীর ছেলে গৌতমের কথা শুনলুম। সে ম্যাড্রাসে থাকে। সেও আমার মতো টেপরেকর্ডার ক্যামেরা ফরেনমেড গুডস্ আনে। পুজোয় সেও এসেছে। তার ওয়াইফ নাকি সাউথ ইণ্ডিয়ান। কই, গৌতমের কথা তো আপনার ম্যাগাজিনে লেখেন নি?

—আহা! কথাটা……

—আপনি আমার টিচার ছিলেন ছেলেবেলায়। বড় দুঃখ হয় স্যার। দোমোহানীর অনেক বাড়িতেই দেখলুম ফরেন গুডস ইউজ করে। প্রত্যেকটা ছেলের পরনে ফরেন ক্লথ। হয় লালগোলা বর্ডার, নয়তো নেপাল-নর্থবেঙ্গল থেকে এই হাইওয়ে নাম্বার থার্টি-ফোর দিয়ে আসছে। লক্ষ লক্ষ টাকার গুডস স্যার। আপনি কি খবর রাখেন দেশের কত গ্রেট গ্রেট লিডারের পকেটে স্মাগলারদের টাকা ঢোকে? খবর রাখেন স্যার, পলিটিকাল পার্টির ফাণ্ডে স্মাগলাররা কী হিউজ মানি ডোনেট করে?

নলিনী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। রতনকুমারের হাসিটা সরু হতে হতে ঠোঁটের কোণা থেকে ক্রমে মিলিয়ে গেল এবং মুখটা লাল, নাকের ফুটো ফুলে উঠেছে। চোখ নিষ্পলক।

—নিজে পেপার করেন। অথচ কোনো বিগ পেপার পড়েন না স্যার?

নলিনী মৃদু প্রতিবাদ করলেন এবার।—কী বলছ? পড়ব না কেন? ডেলি বিকেলে কাগজ আসে ডাইরেক্ট কলকাতা থেকে। কাগজ না পড়লে চলে আমার?

—পড়েন। অথচ আপনি লিখলেন, আমি স্মাগলার!

—বাবা ফটিক! তুমি ভুল বুঝেছ।

দরজার কাছে গার্গী এসে দাঁড়িয়েছে কখন, টের পাননি নলিনী। গার্গী বলে উঠল—কী হয়েছে, বাবা?

নলিনী মেয়েকে দেখে কোণঠাস্না অবস্থাটা কাটিয়ে ফেললেন। বললেন—

কী মুশকিল! কাণ্ড ছাখ মা গাগু, এ সেই ফটিক—মানে শীতল ঘোষের ছেলে। এই সক্কালবেলা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে। আমি ওকে বোঝাতে পারছিনে, রম্যরচনা হ'ল তো সাহিত্য। সাহিত্যে কিঞ্চিৎ কল্পনার ভেজাল না দিলে পড়বে কেন লোকে? রবি ঠাকুর বলেছেন, আর্ট মানেই বাড়াবাড়ি।

রতনকুমার গার্গীকে দেখছিল। গার্গী রতনকুমারকে। তারপর গার্গী একটু হেসে বলল—দেখুন রতনবাবু! প্লীজ, ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। এ কাগজ পড়েই বা ক'জন, গুরুত্বই বা কে ছায়? বাবার নেহাত খেয়াল। এক কপি কেউ পয়সা দিয়ে কেনে না। কাজেই ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নেবেন না।

নলিনী হতবাক। গাগু শীতু গয়লার ছেলেকে রতনবাবু বলছে—ওই ফোর-টোয়েন্টি কঅক্ষর গোমাংস মস্তান ছোকরাকে! তার ওপর দোমোহানী পল্লী-বার্তার এমন কুৎসিত অবমূল্যায়ন! আধমিনিট পরে চটে গেলেন —বাজে বলিস নে। বাজে কথা একদম বলবি নে গাগু! নিজের চরকায় তেল দিগে যা!

রতনকুমার গার্গীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—না। ইমপরট্যান্স আমি দিই নি। আমি শুধু ওঁর এ্যাঙ্গল অব ভিসানকে কনডেম করছি।

গার্গী গম্ভীরমুখে বলল—আপনি অত বেশি ইংরেজি বলেন কেন? বলতে হয় পুরোটাই ইংরেজিতে বলুন! বুঝব।

এতে একটু বিব্রত হল রতনকুমার।—সরি! অভ্যাস। আমি অনেক বছর বাংলাদেশে ছিলুম না। বাংলা বলতে—মানে ফ্লুয়েণ্টলি বলতে মুশকিলে পড়ে যাই।

গার্গী দাপট দেখিয়ে বলল—বেশ তো বলছেন অতক্ষণ ধরে। একটুও মুশ-কিলে পড়তে দেখছি না।

রতনকুমার এবার বিরক্ত হয়ে বলল—হবে। আমার অনেক ব্যাপারে ন্যাক আছে।

নলিনী ইতিমধ্যে সাহস ফিরে পেয়েছেন। তম্বি করে বললেন—তর্ক করে লাভ নেই। খামোকা তক্কো করে সময় নষ্ট। আমি এবার প্রেসের কাজে বসব।

কিন্তু তার কথায় গার্গী কান দিল না। গার্গীর তর্কের মুড এসে গেছে। সে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। শিকারী যেন রাইফেল ছোঁড়ার ধাক্কা সামলাবে এবং সামনে বাঘ।

বাঘ? হুঁউ। এ দোমোহানী-ঘোষের ডাঙায় পোস্টারের রঙচঙে ছবির এতো

কিছু ছেলেমেয়ে ইদানীংকালে দেখা যায়। হরু ঠাকুরের নাতি ক্যানাডায় থাকে। ইঞ্জিনিয়ার। বছরে একবার দেশে আসে ঠাকুর্দাকে দেখতে। মুসলমানপাড়ার গজ্জল আলির ছেলে ইউসুফ আমেরিকায় ডাক্তারী করে। সেও বাড়ি আসে কখনও-কখনও। নৃপের ঘোষের (ইনি কায়স্থ) মেয়ের শ্বশুরবাড়ি আগে ছিল দিল্লী। এখন লন্ডনে। সেও বরের সঙ্গে বাপের বাড়ি আসে।

ফরেন কথাটা দোমোহানীতে ডালভাত। ফরেন-ফেরতরা (আগে যেমন ছিল বিলেত-ফেরত) দোমোহানীর বাজারে দু-একবার চক্কর মেরে জাঁক দেখাতে ভোলে না। গুলি-গুলি চোখে চাষা-ক্ষেতমজুররা তাকিয়ে থাকে। নেপেনবাবুর মেয়ে দেবলানা প্যারাম্বুলেটারে ফুটফুটে বাচ্চাকে বসিয়ে এই হাইওয়েতে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তা কয়েকটি বাড়ি থেকে অনুসৃত হয়েছে। ঘনশ্যাম সাহার ছেলে সেবারই প্যারাম্বুলেটার কিনে এনেছিল। তবে এসব তথ্য আপাতত থাক। দোমোহানী-ঘোষের ডাঙা অঞ্চলে এর ফলে ফরেন হাওয়া ঝিরঝিরিয়ে বইছে, তাতে ভুল নেই। নিম্নবিত্ত, ক্ষয়াটে ও ডেকাডেন্ট, ঈর্ষা ও অভিমানকাতর বাবুগণ এবং মিয়াসাহেবগণ সিপাহী বিদ্রোহের সেই গরু ও শূওরের চর্বিসংক্রান্ত গুজবের মতো অসংখ্য গুজব রটান। গুজব এমন জিনিশ, তাতে সান্ত্বনা আছে। ইচ্ছাপূরণ আছে। প্রতিহিংসা ও অভিমানের চরিতার্থতা আছে। একদিন বিকেলে দোমোহানীর স্থায়ী বিদূষক ঝুটু চক্রবর্তী কলকাতা থেকে বাসে ফিরেই গলা চেপে রটিয়েছিলেন—দিল্লীতে মিলিটারী ক্যুপ হয়েছে! অমনি হিড়িক পড়ে যায়। অসংখ্য গলায় দুর্নীতিওয়ালাদের প্রতি শাসানি শোনা যায়—এবার? এবার? কেউ কেউ বলেছিল—আয়ুব খাঁ! আয়ুব খাঁ! লেফট্ রাইট, লেফট্ রাইট! শাঁই করে একখানি চাবুক পাছায়। যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল বাবা! শালারা সোনার ভারতটাকে শ্মশান করে দিলে হে!

ঠিক এমনি চাপা উল্লাস দোমোহানীর বাবুরা প্রকাশ করেছিলেন ১৯৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩ পর্যন্ত সমানে। জয় বাবা হিটলার! বহুত আচ্ছা বাপ্! চালিয়ে যা, চালিয়ে যা। এবং তাঁদের ছেলেপুলেরা তখন তিন ক্রোশ রাস্তা ঠেঙিয়ে শহরের স্কুলে পড়তে যায়। ফেরার পথে প্রাক্তন জেলা বোর্ডের এই সড়কের দু'ধারে ব্যানাবনে আগুন জ্বেলে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলত। ননী কম্পাউণ্ডার তোতলা মানুষ। সাহাদের আড়তে চাল ধার করতে গিয়ে হি-হি-হিটলার শোনাতেন। এখন ননীবাবু নেই। বেঁচে থাকলে সেই বিকেলবেলা সাহাদের একই আড়তে বসে মি-মি-মি-মিলিটারী করতেন।

সে যাই হোক, গার্গী এখন জুত করে রাইফেল ধরেছে দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং শিকারী জিম করবেটের মতো পিঠের দিকে শক্ত অবলম্বন পেয়েছে। সে রতনকুমারের ন্যাকের কথার জবাবে বলল—আপনার অনেক ব্যাপারে ন্যাক আছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসার ন্যাকও দেখছি।

রতনকুমার লাজুক হেসে বলল—আমি ঝগড়া করতে আসিনি। জাস্ট একটু প্রটেস্ট করতে এসেছি। স্যার আমাকে স্মাগলার বলেছেন!

নলিনী আবার আঁহা করতে যাচ্ছিলেন, গার্গী তাঁকে চেপে দিয়ে বলল—যদি ওইভাবেই মানে বুঝে থাকেন, তাহলে বলব—নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার ব্যাপারটা গোলমেলে কি না। বলুন না, লোকে আপনাকে কীভাবে নেবে প্রথমটা?

—বুঝলুম না। রতনকুমার হিরোর মতো মৃদু হেসে বুদ্ধদেবের মতো চোখ করে মাথাটা দোলাল।

—না বোঝার কী আছে? আপনি ছেলেবেলায় কোথায় নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। এতকাল বাদে এভাবে ফিরলেন।

—এভাবে মানে কী বলতে চান?

গার্গী ভড়কাবার পাত্রী নয়। বলল—আপনার পোশাক-আশাক, আপনার জিনিসপত্র······

রতনকুমার এবার সত্যি চটেছে। প্যান্টের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বলল—সী! জাস্ট সী দা কার্ড। মহতাব এক্সপোর্ট এজেন্সির আমি ওয়ান্ অফ দা প্রোপাইটার ছিলুম। কুয়াইত, আবুধাবি—হোল গালফ কোস্ট এরিয়ায় ফ্রুট, ফিশ, মিট এ্যাণ্ড ভেজেটিবলস সাপ্লাই করতুম আমরা। এই দেখুন এ্যাড্রেস। খোঁজ নিয়ে দেখুন না!

গার্গী কার্ডে চোখ রেখেছে, কিন্তু নিল না। খপ করে হাত বাড়িয়ে নলিনীই নিলেন কার্ডটা। পড়ে দেখে বললেন—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ভাল, ভাল। তারপর যথেষ্ট হেসে ফের বললেন—তাহলে বাবা ফটিক, বোঝা যাচ্ছে সেই সাধুর হাতিটি ছিল শ্বেতহস্তী—হোয়াইট এলিফ্যাণ্ট! তুলে নিয়ে গিয়ে রাজা করে দেয়। বাঃ, ভেরি ইণ্টারেস্টিং! ফটিক, এই সংখ্যাতেই আমি তোমার লাইফ ছাপব। হেডিং দেব: এক বাঙালী যুবকের রোমাঞ্চকর কাহিনী। কে বলে বাঙালী কর্মভীরু? এতদঞ্চলের যুববৃন্দের কাছে আমরা এবার একটি মহতী

প্রেরণার মূর্ত বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীমান ফটিকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। উদাত্ত-কণ্ঠে লাইনটি আওড়ানোর পর ভাবলেন, শীতু ঘোষের ছেলেকে মঘার দোকানের চা আনিয়ে খাওয়াবেন। প্রেসে ছাপতে আসা লোকেদের জন্তে তাই করে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ ছোকরা বারান্দা থেকে জুতোর শব্দ ছড়িয়ে নেমে গেল। ঢোলা পাতলুনের পায়ের দিকটা একবিঘৎ চওড়া বুঝি। অদ্ভুত আওয়াজ দিচ্ছিল। ফুলবাগিচার পাশ দিয়ে রঙচঙে বৃহৎ ও অলীক প্রজাপতি ফরফর করে উড়ে চলে গেল যেন। নলিনী একটু তাকিয়ে থাকার পর গার্গীর দিকে ঘুরলেন। গার্গী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—কেমন ইস্মার্টিং টোনে কথা বলছিল শুনলে? কেন তুমি ওসব ছোটলোকদের পেছনে লাগতে যাও, বুঝিনে!

নলিনী কার্ডে চোখ রেখে বললেন—হুঁউ। কেতা আছে। তারপর প্রেস-ম্যানসুলভ কারিগরি ভঙ্গিতে কার্ডের কাগজ ও মুদ্রণ পারিপাট্য পরীক্ষায় মন দিলেন।

গার্গী শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল—ওটা জাস্ট মুখোস! দেখেই বুঝেছি। আড়ালে স্মাগলিং চলে। তুমি ধরেছ ঠিকই। তবে ওসব লিখে লাভ কী? বরাবর দেখছ, তবু শিক্ষা হয় না তোমার।

নলিনী মুখ তুলে বললেন—ছোকরাকে কেমন মনে হল রে?

—কেমন মনে হল মানে?

—একটু তেজী। ওদের স্বজাতির স্বভাব ওটা। তবে আফটার অল ছোকরা তেমন ডেঞ্জারাস বলে মনে হল না। বরং ভদ্র খানিকটা। তোর কী ধারণা?

—মুখোস, মুখোস!

—আমাকে প্রণাম করে মাথায় ধুলো নিল, বুঝলি?

—শো! শো!

—না রে, ছাত্র ছিল বলল। বিদ্যাপীঠে থ্রিতে পড়ত। মনে পড়ছে না। কিন্তু কেমন কথাবার্তা, ইংরিজি উচ্চারণ—নিশ্চয় পরে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিল। পেটে বিদ্যে আছে রে!

- ছাই! আজকাল পোশাক আর কথায় বিদ্যে বোঝা যায় না। ইংরিজি? আজকাল মাঠের চাষাও বলে। তাছাড়া বোম্বেতে ছিল।......

তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। রতনকুমার আবার আসছে। গেট খুলে হন্ হন্ করে এসে একটু হেসে বলল—এক্সকিউজ মি স্যার! আপনার জন্তে এই

প্রেজেণ্টেশানটা এনেছিলুম। কাইণ্ডলি এ্যাকসেপ্ট দিস্ হাম্বল থিং ফ্রম ইওর হাম্বল স্টুডেণ্ট স্যার!

প্ল্যাস্টিকের মোড়কে ভরা একটি কলম। আর কী সায়েবী উচ্চারণ রে বাবা! নলিনী বিগলিত হয়ে কলম নিয়ে চোখ নাচিয়ে হেসে বললেন—মুটো চক্কোত্তিকে একটা দিয়েছ শুনলুম?

—উনি আমার বাড়ি গিয়েছিলেন, তাই। আচ্ছা, চলি স্যার। অন্যায় করে থাকলে ক্ষমা করে দেবেন।

নলিনী কলম বের করার তালে ব্যস্ত। রতনকুমার গার্গীর দিকে আর তাকায়নি। তেমনি ঘুরে আওয়াজ তুলে চলে গেল। গেট বন্ধ করতে ভুলল না। গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল—তুমি ভারী হ্যাংলা!

নলিনী মেয়েকে পাত্তা দিলেন না।—পড়ে ছাখ তো! ক্ষুদে হরফ। আতস কাচটা……

গার্গী 'তুমি পুজো করো গিয়ে' বলে রাগ দেখিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। নলিনী আতস কাচ আনতে গাত্রোত্থান করলেন। মুখে মৃদু হাসি। এই হাসিতে সেই সূক্ষ্ম তৃপ্তির চিহ্ন আছে, যা নাকি মাঘ মাসে মা সরস্বতীর মূর্তির ঠোঁটের কোণায় ফুটে ওঠে বলে শোনা যায়।……

॥ তিন ॥

শৈল গয়লানীর কীর্তি

কাকিমা শৈলবালার বয়স রতনকুমারের চেয়ে বেশি নয়। এ বাড়ির বউ হ' এসেছিল, তখন কচি বালিকা ছিল। একটু তেজী স্বভাবের মেয়ে। ছিপছিপে শরীর। নাকমুখের গড়ন মন্দ না। একটু শ্যামলা রঙ। এই বয়সেই ঝড়ঝাপটা খেয়েছে প্রচুর। তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ের মা হয়েছে। স্বামী কেষ্টপদ জীবন্মৃত। আজকাল আর বাড়ি আসে না। হাইওয়েতে ঘোরে এবং রাতে বাজারে কোথাও শুয়ে থাকে। শুয়ে থাকে বলা ভুল, রাত কাটায়। পাগলদের চোখে ঘুম নেই।

তিনটে গাইমোষ আর দুটো গাইগরু সেবার বড় বানে সেই যে ভেসে গেল, আর ফেরে নি। শৈলর মাথাকোটা অভিশাপের ফল ফলেছে, না ফলে নি—কে বলতে পারে? তবে শৈলর মনে হয়, ফলেছে।

গায়ের সোনা বেচে শৈল দুটো গাইগরু কিনেছিল। [illegible] দুধ দুইয়ে [illegible]। বড় ছেলের বয়স মোটে দশ। সে চরিত্রে [illegible] বিল্টুর [illegible] খরার সময়টা পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কাটিয়ে [illegible]। এতটুকু ছেলের ওইরকম 'স্ট্রাগলড লাইফ' দেখে রতনকুমারের কষ্ট হয়েছে। কাকা কেষ্টপদের অবস্থা দেখে চোখে জল এসেছে। সে আসা অব্দি বার বার বলেছে—সব্বাইকে বোম্বে নিয়ে যাব। কাউকে এখানে রাখব না।

শৈল দু'বেলা দুধ দিয়ে আসত শিবু চক্কোত্তির ডেয়ারীতে। রতনকুমার এসে সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। নিজে খায়। ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে বলে। কাকিমাকেও বলে—দুধ কখনও বেচে? রোজ অন্তত এক গেলাস করে খাও তো কাকিমা!

শৈল ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিল—তোমার কাকাকে ফেলে কোন্ প্রাণে দুধ খাই বাবা! দুবেলা দুমুঠো ভাত নিয়ে বসি। রোচে না।

রতনকুমার বলেছিল—ভেবো না। কাকাকে নিয়ে গিয়ে ভাল ডাক্তার দেখাব।

রতনকুমার এই কাকিমা আর তার ছেলেমেয়েব কথা ভাবে নি। নয়তো জামাকাপড় আনত। শহর থেকে এনে দিয়েছে। বাড়িতে এখন সুখ ভেসে যাচ্ছে। রেডিওতে গান বাজে। এখনও দফায় দফায় ভিড় কবে লোকেরা এসে শীতু ঘোষের ছেলেকে দেখে যাচ্ছে। ফটিক হয়ে ফিরলে এত উৎসাহ নিশ্চয় দেখা যেত না। তাব ওপর নাকি হিন্দি ফিল্মে কয়েকটা রোল করেছে। এইতে সাড়া পড়ে গেছে যুবকদের মধ্যে। দোমোহানী বাবুপাড়ার ছেলেছোকরারা এবেলা-ওবেলা আসে। বিকেলে তাকে হাইওয়েতে বেড়াতে নিয়ে যায়। বোম্বে ফিল্ম জগতের গল্প শোনে। তাদের মধ্যে যারা গোড়ায় সন্দেহ দেখাত, তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে। প্রমাণ? স্যুটিংয়ের ছবি। বুকলেটে রতনকুমারের নাম। ছবি মিলিয়ে দেখে তাবা খুশি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—শহরের ছবিঘরে কয়েকটি 'বই' এসেছিল বটে। ছোট্ট রোল ছিল রতনকুমারের। কোন্‌টা, কোন্‌টা? কে যেখানে অমিতাভ বচ্চন রেখাকে উদ্ধারের জন্যে লড়ে যাচ্ছে, ওর বন্ধু ওপর থেকে টাঁট্ টাঁট্ করে গুলি চালিয়ে তিন-তিনটে দুশমনকে শুইয়ে দিল? সেই বন্ধুর রোল। উরে ব্বাস। আখোঁকে কসমে সঞ্জীবকুমারের সঙ্গে হিরোইনের বিয়ে হচ্ছে,······রতনদা, হিরোইনটা কে গো? নবাগতা শিল্পী না? (সিল্পি বলা হয়) আপনি সঞ্জীবকুমারকে কেমন ঝাড়লেন মাইরি! হিঃ হিঃ হিঃ···

ঘোষের ডাঙায় কিছু বাড়ির চালে এখনও খড়। যেমন কেষ্টপদের বাড়ি। মাটির দেয়াল পড়ো-পড়ো অবস্থা। বেশির ভাগ বাড়িই অবশ্য মাটির দেয়াল এবং টালি চাপানো। কয়েকটিতে টিনের চালও আছে। ইটের বাড়ি বলতে একখানা। জে এল আর ও দিবাকর-ঘোষের বাড়ি। এই পাড়াটা আদ্যিকালে একটা বিশাল বাঁজা ডাঙায় গড়ে উঠেছিল। এখনও ক্ষয়াটে চেহারা। গাছপালা বিশেষ নেই। শুধু একটা পুকুরের পাড়ে কয়েকটা তেঁতুল গাছ আছে। ওই গাছে পালে পালে হনুমান বসে থাকত। ফটিক তেঁতুল কুড়োতে যেত। কালক্রমে হনুমানবংশ লুপ্ত। দোমাহানীর বদুবাবু বন্দুক কিনেই হনুমান মেরে হাত পাকাতেন। লোকের কথায় কান দিতেন না। হনুমান হত্যার পাপেই শেষ পর্যন্ত শূলের অসুখে মারা পড়ল। বিলে পাখি মারতে গিয়ে পেট যন্ত্রণা শুরু হয়। ধড়ফড় করে মারা যান। উপুড় হয়ে মাটি আঁকড়ে পড়েছিলেন। রক্তে ভেসে গিয়েছিল।

আজকাল আর হনুমান কেন, শেয়াল নেই। বেজী নেই। খরগোস, গন্ধগোকুল, উদবেড়াল নেই। পুকুরের পাড়ে প্রায়ই ভোরবেলায় মস্তো মাছ আধ খাওয়া পড়ে থাকত। সেই লোভে রোজ ফটিক যায়। একদিন পালিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল—ভূতে দাঁত দেখিয়েছে। তার মা তরু গয়লানী হেঁসে খুন। —হলুমান রে, হলুমান। তরু গয়লানী ছিল দুঃসাহসী মেয়ে। খরার সময় সেই বিলের বাথান থেকে রাতবিরেতে মাথায় বয়ে দুধ আনত একা। হাতে হেঁসো থাকত। ফিরে এসে ছেলেকে বানিয়ে-বানিয়ে ভূতের গল্প শোনাত। বাবা বাথানে। ছোট্ট কুঁড়েঘরে মা-ব্যাটা শুয়ে আছে। মাঝরাতে ঝড় উঠল। তারপর বৃষ্টি।—ফটিক রে! ও ফটিক! ওঠ বাবা, ওঠ দিকিনি। বলে ছেলেকে জাগিয়ে কোণার দিকে বিছানা পাতল।

রতনকুমার ধরা গলায় বলে—সব স্পষ্ট মনে আছে কাকিমা। ক্লিয়ারলি। ওই যে তুলসীগাছ, ওখানে ছিল ঘরটা এখনও দেয়ালের মাটি গলে পড়ার সাউণ্ড কানে ভাসে। যত বার সাউণ্ড হয়, মা এ্যালার্ট…

শৈল বলে—হ্'য় বাবা। তুমি ঠিক বলছ। আমার বিয়ের পরের বছর তোমার বাবা-কাকা দু'জনে মিলে ঘরটা ভাঙল। সাপের উৎপাত হয়েছিল; পুরানো ঘর তো।

তারপর শৈল্য চোখের জল মুছে বলে—বাবা-মা আজ বেঁচে থাকলে কত খুশি হত। আমাদের ছেলে নেকাপড়া শিখেছে। কত পাশ দিয়েছে। সাহেব

হয়েছে। বাবা রে বাবা! বাবুপাড়ার ওনারা আর তুচ্ছু করুক তো দেখি! হুঁ কথায় কথায় খালি ষাট বছরে নাবালক বলে ঠাট্টা! এবার? এবার বল্?

হ্যাঁ, ঘোষের ডাঙায় রতনকুমার এবার আবহমানকালের হীনমন্যতা দূর করতে পেরেছে—যা জে এল আর ও দিবাকর পারে নি। সে তো বাইরে বাইরে কাটায়। গাঁয়ের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। সব সরকারী সুযোগ-সুবিধে ওই দোমোহানীর বাবুরাই মেরে দিচ্ছে। তলানিটুকুও ওখানে বাঁকিরা যা হোক পাচ্ছে। কিন্তু ঘোষের ডাঙার বেলায় অষ্টরম্ভা। দিনের গোচারণের পথটা চাষীরা মেরে এনেছে প্রায়। একচিলতে আলপথে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওই পথে পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেত নাবাল মাঠে ধান আনতে। এখন আল কেটে জমির ওপর দিকে ধানের গাড়ি আসে। এদিকে গোচর খাস ছিল অনেক জায়গা। সব গায়ের জোরে দখল করে ধান ফলাচ্ছে।

তবে সে তো গেল মাঠের ব্যাপার। গাঁয়ের রাস্তাটার কী অবস্থা! আর ওই একটা মোটে টিউবেল। তাও মাঝে মাঝে অচল হয়ে যায়। তখন ছোট বাজারের টিউবেলে। ব্লকে গিয়ে নালিশ করলে পাত্তা দেয় না। বাবা অতনকুমার তুমি এবার আমাদের মাথা হও। এর পিতিকার করো। এই হল বুড়োদের বক্তব্য। রতনকুমার বলেছে, এসেছি যখন, তখন একটা কিছু করতেই হবে। তবে জাস্ট্ হালচালটা বুঝে নিই। একটু সময় চাই।

রতনকুমার কাকিমাকে বলেছে, এই ভিটেয় একটা বাড়ি তুলবে। কাছে ইট-খোলা আছে। হার্ডওয়ার স্টোর্স আছে সীতু দত্তের। সিমেণ্ট লোহালক্কড়ের জন্যে শহরে দৌড়তে হবে না। বাড়ি হয়ে গেলে ইলেকট্রিসিটি আনার জন্যে লড়ে যাবে। লড়তে লড়তে সে উঠেছে। তার এটা অভ্যাস।

আর টিউবেল? একটা টিউবেল সে নিজের টাকায় দেবে। বাবা-মায়ের স্মৃতিতেই দেবে।

শৈলর এখন একটু দেমাক হয়েছে এসবের ফলে। আজ সকালে বাজারে গিয়েছিল কী কাজে। ফিরে এসে হন্তদন্ত হয়ে বলেছিল—অতন! ও অতন! শুনছ কথা?

রতনকুমার নিজের শোওয়ার জন্যে একটা তক্তাপোশ কিনেছে। ঘরে জায়গা নেই। বারান্দায় পেতেছে। তাঁর ওপর বালিশ তোষক ও উৎকৃষ্ট চাদর। সুদৃশ্য বেডকভার মোড়া। সে আধশোয়া হয়ে হেডলি চেজ পড়ছিল। বলেছিল—কী কাকিমা?

—ও অতন ! নোলে ভটচায তোমাকে চোর বলেছে। কাগজে নেকেছে গো ! শুনে এলুম বাজারে।

রতনকুমার উঠে বসেছিল। বই মুড়ে বলেছিল—কাগজে ? কী কাগজে ?

—তা জানিনে ব্যবু ! ওর ছাপাখানা আছে যে ! বইকাগজ ছাপে। তোমার কুচ্ছো করে ছেপে দিয়েছে।

ব্যাপারটা দেখতে হয়। রতনকুমার বোঁয়ে গিয়েছিল। বাজারে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে একটা দোমোহানী পল্লীবার্তা যোগাড় করেছিল। পড়ে দেখে একটু রাগ হয়েছিল তার। এই সব গেঁয়ো লোক এখনও কোন্ যুগে পড়ে আছে ! এরা জানে না, পৃথিবীটার কত দ্রুত ট্রান্সফর্মেশন ঘটছে ! ওল্ড ইডিয়টস !

একটু দোনামনায় পড়েছিল সে। এসব তুচ্ছ করা উচিত। কিন্তু নোলে ভটচায লিখেছেন, আরও লিখবেন তার সম্পর্কে। তাই শেষ পর্যন্ত রতনকুমার বাড়ি ফেরে। সাজপোষাক ইচ্ছে করেই একটু উগ্র করে এবং সেণ্ট ছড়ায়। তারপর একটা কলমও উপহার হিসেবে সঙ্গে নেয়। এটা একটা প্রতিশোধ।

এরপর যা ঘটেছিল তা আমরা জানি। কিন্তু পরে ব্যাপারটা আরও কিছুটা ঘোরালো হল।

রতনকুমার নোলে ভট্টাচার্যকে কলম উপহার দিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে সতু হাজরার চায়ের দোকানে গেছে। ওটাই স্থানীয় মডবৃন্দের আড্ডা। (পাঠক, ইহারা চৌরঙ্গী এলাকার মত ছোকরাদের তৃতীয় প্রতিবিম্ব। দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব মফস্বল শহরগুলিতে দ্রষ্টব্য। প্রথম প্রতিবিম্ব কলকাতারই ক্ষয়াটে এলাকাসমূহের রোয়াকে ও রেস্তোরাঁয় দেখিতে পাইবেন।) রতনকুমারকে এখনও ওরা রহস্যময় অপরিচিতের দূরত্ববশত গুরু বলে সম্ভাষণ করে না। তবে এই সব গ্রামীণ মড ছোকরা এখনও মাস্তানের খোলস পুরো ত্যাগ করতে পারে নি। ওরা ভেঞ্চার্স কিংবা নীল ডায়মণ্ডের নাম সবে শুনেছে। দু-একজনের সংগ্রহে এসব রেকর্ডও আছে। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব রফি মান্না দে লতার প্রতি। বাংলা গান বলতে সেই লাউয়ের ডুগডুগি সার।

রতনকুমারকে [illegible] দত্তের ছেলে অশোক (নতুন জেনারেশনের নামগুলি [illegible]) সরে জায়গা দিয়েছে। রতনকুমার বলেছে—সিট ড্যাউন্, ম্যান। [illegible] কাঁধে হাত রেখে [illegible] আদর করেছে। [illegible] ওদের চেয়ে সে অনেক [illegible]। মাঝে মাঝে বি[illegible] বিশেষ নায়কের ভঙ্গী অনুকরণ করে
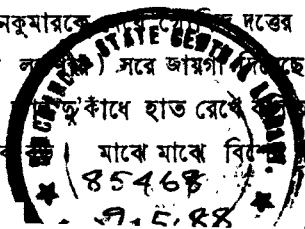
হিন্দির ডায়ালগ ঝাড়ে। ওরা এগুলো শুনতে ভালবাসে। কত প্রখ্যাত ডায়ালগ না মুখস্থ রতনকুমারের!

আর কাপড়চোপড়? কোন্‌টা কেমন কাপড়, প্যান্ট বা জামার কাটিংয়ে কোথায় ত্রুটি, কেমন হলে ভাল হত—এসবে রতনকুমার একজন এক্সপার্ট। বোম্বের ফ্যাশান পুরানো হতে হতে হাতফেরতা মফস্বলে আসতে অনেক দেরি হয়। সতুর চায়ের দোকানে আলোচ্য বিষয় বলতে এসবই।

এরপর চা খেয়ে অশোকদের বাড়ি গেছে সদলবলে। গোবিন্দ দত্ত এখনও ছহেতে ধুতি পরে কয়লা ও কেরোসিন বেচে। দোতলা বাড়ি আছে গাঁয়ের ভেতর দিকে। দোতলায় আলোকের ঘরে হাই-ফাই রেকর্ডপ্লেয়ার। খাঁটি বিদেশী জিনিস। মেট্রোর গলি থেকে জামাইবাবু কিনে দিয়েছিল। সেই রেকর্ডপ্লেয়ারে রেকর্ড চড়িয়ে অশোক নীচে গেল গেস্টের জন্য চা-ফা বলতে। জানলায় তার বোনেরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ন্যাংটো একটা বাচ্চা ঘরে ঢুকে হঠাৎ হিসি করে ফেলল। গলায় মাদুলি, পায়ে তামার বালা। কপালে সোনার টিকুরী। রতনকুমার খাট থেকে নেমে এসে বাচ্চাটাকে আদর করলে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

নীচের তলায় বাড়ির বউদিরা বলাবলি করছে—কে বলে গয়লার ছেলে! কপাল করে এসেছিল বটে! বড় বউদি বলল—দেওরের গুরুদেব এসেছে মনে হচ্ছে যে!

অশোক চোখ টিপে বলল—চুপ! সব সময় ইয়ারকি ভাল্লাগে না! কেটলি চাপাও।

অশোকের মা ফিসফিস করে ভর্ৎসনা করল ছেলেকে--একেবারে ওপরে নিয়ে তুললি! বাইরের ঘরে বসালে কী হত বাপু?

অশোক গর্জে বলল—চুপ করো তো! কী বোঝো তুমি?···

ওদিকে রতনকুমারের বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে শৈলও বেরিয়েছিল। ভালমানুষ ছেলেটা বড্ড ভদ্দরনোক। নোলে ভটচাযের আবার সবেতেই বাঁকা-বাঁকা কথা। তুচ্ছতাচ্ছিল্য। জেতের গরম।

তাই বলে তুমি চোর বলবে বিটলে বামুন? মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। শৈল নোলে ভটচাযের প্রেসের সামনে গিয়ে রতনকুমারকে দেখতে পায় নি। নোলে-বাবুর ধিঙ্গি মেয়েটা ফুলগাছের কাছে কেমন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শৈলকে দেখে বলল, কী গো?

শৈল ঝোঁকে এসেছে। একটু গলা চড়িয়ে বলল—হ্যাগো মেয়ে! তোমার বাবা কোমনধারা মানুষ বলো তো শুনি? ক্যানে সে আমাদের ছেলেকে চোর ছেপেছে? সে কী কারও খেয়ে পরে মানুষ—না কারও ঘরে সিঁদ দিয়ে বড়লোক হয়েছে? কী ভেবেছে ভোট্‌জে মশাই? হাতে ছাপাখানা পেয়ে স্বগ্‌গো ধরেছে?

গার্গীর মন খারাপ। 'লোকটা' এসে তর্কাতর্কি করে গেল সকালবেলা। জাত-টাত কোনো প্রশ্ন নয়; বাবার একটা সম্মান আছে দেশে। সেই সঙ্গে গার্গীরও আছে। তার মানে, গার্গীর এই ধারণা সেই সম্মান যেন চিড় খেয়েছে।

যুক্তি দিয়ে সব সময় কোন অবস্থা বিচার করা যায় না। গার্গীর মনে হচ্ছে একজন অচেনা নবাগত লোক তার কিংবা তাদের পরিবারের গুরুত্ব বা মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নয়। ওকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল বাবার। তা-না করে বাবা ওর সেই কলমটাতে কালি ভরে লিখতে বসেছেন। আর কী প্রশংসা কলমের!

গার্গীর একটা স্বভাব আছে। তাকে তর্কে কেউ হারালে সে-রাতে আর ঘুমই হয় না। কিন্তু এটাই অদ্ভুত, 'লোকটার' সঙ্গে তর্কে তার হারটা কীভাবে হল, স্পষ্ট ধরতে পারছে না। অথচ খালি মনে হচ্ছে, একজন অচেনা লোক এসে গালে চড় মেরে গেল। মুখের মতো জবাব দিতে পারল না। কিচ্ছু এলো না মাথায়।

এরপর শৈল গয়লানীর এই হামলা। গার্গী রেগে আগুন হয়ে বলল—বেশ করেছে বাবা। যা খুশি করো। এখানে চেঁচিও না।

শৈল আরও গলা চড়িয়ে বলল—ক্যানে চ্যাচাব না? যা খুশি নেকাবে, ছাপবে, চোর বলবে—আর ছেড়ে দেব? কই সে ভোট্‌জে মশাই? হাতির পাঁচপা দেখেছে, নাকি দিনের তারা দেখেছে?

নলিনী 'এক বাঙালী যুবকের কীর্তি ও সাধনা' লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। চ্যাচা-মেচি শুনে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। গার্গীর হাতে স্যাণ্ডেল দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠলেন। কারণ গেটের ওপারে শৈলবালার ওপর আশ্বিনের ঝকঝকে রোদ পড়েছে।—কী হচ্ছে? হচ্ছেটা কী? বলে দৌড়ে এলেন।

গার্গী স্যাণ্ডেল তুলে ইংরেজি-বাংলায় নিন্দাত্মক শব্দ আওড়ে যাচ্ছে। শৈল প্রকৃত কুঁদুলীর মতো কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুখে যা আসছে, তাই বলে গাল দিচ্ছে।

কাছেই বাজার শুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। নলিনী

দেখলেন, দিনকাল কত বদলেছে। আগের দিন হলে শৈলকে বাবুরা এসে জুতো-পেটা করতেন। এখন মজা দেখছেন। এ ভিড় ছত্রিশ জাতের। হিন্দু-মুসলমানের মহীবাবুর বোনমিলে হাড় কুড়িয়ে বেচতে যাচ্ছে যে সাঁওতাল মেয়েটা, সেও দাঁত বের করে হাসছে। তারপর ভিড় থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি বেরিয়ে এসে শৈলকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে থামাল। শৈল শাসাতে শাসাতে চলে গেল। তারপর প্রতিনিধিরা একবাক্যে বলল—তা যাই বলুন ঠাকুমশাই, শীতুর ছেলের নামে আজেবাজে কথা ছাপাটা আপনার উচিত হয় নি।

তারপর গার্গীর উদ্দেশে—ও মেয়ের সঙ্গে আপনি কি পারবেন মা? ওরা হল অশিক্ষিত মুখ্যু। আপনি শিক্ষিত মেয়ে। খামোকা অপমান হওয়া!

গার্গী হন হন করে ঘরে গিয়ে ঢুকল। নলিনী হতবাক। ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে ভাবতেই পারেন নি। এর আগে কতবার কতজনকে নিয়ে এরকম রসিকতা করেছেন, কোন গণ্ডগোল হয় নি। এবার হল কেন?…

চার

কিছু ট্রাডিশন, কিছু সেনশেসান

দোমোহানী-ঘোষের ডাঙায় বরাবর সেনশেসানের ব্যাপারে আছে। ব্লক আপিসের সমাজ শিক্ষা অফিসারের ট্রেনিংয়ের সময় তাঁদের গ্রুপকে পই পই করে একটি কথা শেখানো হয়েছিল: লোকাল ট্রাডিশন।

এখানে ট্রাডিশন কী? প্রথম আসার পর ঘোরাঘুরি করে ভদ্রলোক সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তার ভিত্তিতেই তিনি সেনশেসান শব্দটি পিক্‌আপ করেন।

(পাঠক, এত ইংরেজি শব্দে বিরক্ত হইলে বলিব, আপনি আত্মপ্রতারক কিংবা অন্ধ। আজিকার বাংলাভাষা বলিতে আমরা ইহাই বুঝি। মন্ত্রী বা আমলা হইতে মাঠের চাষাও এই বাংলা ব্যবহার করে। বিষয়কে বাস্তবানুগ করিতে হইলে এই আধুনিক ভাষা আমাদের ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃত চিত্র ফুটিবে না। ফ্লেভরও পাওয়া যাইবে না। সত্যমেব জয়তে।)

আজ থেকে ৩০-৪০ বছর আগে রোজ বিকেলে যুবকদের কাজ ছিল মাঠে শেয়াল মারতে বেরুনো। কালু, ভুলো, লালু এ-সব নামের গ্রাম্য কুকুরও দলে যোগ দিত। ফাল্গুন-চৈত্র ছিল শেয়াল শিকারের উপযুক্ত সময়। তখন আখের

ক্ষেত একটা করে উজার হয়ে যাচ্ছে। আখমাড়াই কল বসেছে দীঘির পাড়ে। বাতাসে ফুটন্ত গুড়ের মিঠে গন্ধ। ওই সময়টা আশ্রয়চ্যুত শেয়াল মাঠের আলে গর্ত খুঁজে হন্যে হয়ে বেড়ায়। তাদের কাচ্চাবাচ্চার জন্মকাল আসন্ন, কোনো শেয়ালনী ইতিমধ্যে বাচ্চা প্রসবও করেছে। দোমোহানী-ঘোষের ডাঙার যুবকদের হাতে সবংশে মারা পড়ত বেচারীরা। গর্তে আগুন ধরিয়ে দিত ওরা। তাড়া করত। সারা বিকেল মাঠে মাঠে সেই হইহই চ্যাচামেচি।

আজকাল যে শেয়াল দেখা যায় না, তার জন্য আগ্রাসী চাষবাস ও কীটনাশককে দায়ী করা ভুল। শুধু কি শেয়াল? সাপ, সোনাগদি, পাখি, বেজি, খটাস, উদ্‌বেড়াল সেকালেই যথেচ্ছ মেরে লোপাট করা হয়েছে। একে তো আদিবাসী ও হাঘরে অর্থাৎ যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেদের বারো মাস পেটের জ্বালা —কোনো না কোনো জনগোষ্ঠীর খাদ্য ছিল এসব প্রাণী--তার ওপর যুবক ও বালকদের ওই শিকার-শিকার খেলা। সেকালে এখানে ফুটবলের চেয়ে এটা জন প্রিয়ছিল। গুলতি ও তীরধনুক বাবুবাড়ির ছেলেদেরও অতি প্রিয় খেলা ছিল। অজস্র পাখি ও কাঠবেড়ালির প্রাণ যেত। সাঁওতালদের অনুপ্রেরণা, যাত্রার আসরের প্রেরণা, এবং রক্তের অন্তর্গত প্রিহিস্টোরিক ইন্সটিংক্টস।...

তারপর হনুমান খেদানো! সে আরও সেনশেসানাল। বনুবাবু বন্দুক কেনার পর ব্যাপারটা চরম নিষ্ঠুরতম হয়ে পড়ে। নয়তো মুসলমানপাড়ার দেরেশ আলিই যথেষ্ট ছিল। তার চেহারা নিগ্রোদের মতো। হনুমানের আবির্ভাব হলেই তাকে ডাকা হত। সে হনুমানের ভঙ্গিতে বিকট কিছু দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেই কী আশ্চর্য, হনুমানগুলো উঁপ-ঝাঁপ করতে করতে মাঠের দিকে পালাত। তারপর যখন তারা আলে সার বেঁধে বসেছে, যুবক বালক ও কুকুরবৃন্দ নিয়ে তখন হইহই করে দৌড়েছে।

এইসব ব্যাপারে খুবই উত্তেজনা ছিল। আসলে এ-সব তখন লোকেদের অবসরবিনোদন ছাড়া কিছু নয়। হাতে অঢেল সময়। রাতটা ঘুমিয়ে কাটানো যায়। দিনগুলো কাটতে চায় না। আর, এলাকার কিংবদন্তী অনুসারে দোমোহানী-ঘোষের ডাঙা বড় হুজুগে জায়গা।

তখন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের এই অংশটা ছিল জেলাবোর্ডের মহা খচ্চর একটা রাস্তা। বর্ষায় খোয়া ধুয়ে জায়গায় জায়গায় একহাঁটু পাঁক জমত। সারাদিনে বার-ছয়েক মোটরবাস চলাচল ছিল। দোমোহানী বাজারের এখানে এসে আটকে যেত। সেও এক সেনশেসান। অসংখ্য যুবক মজা দেখার তালে

হাটতলার আনাচে-কানাচে ওত পেতে থাকত, তাসও খেলত। তারপর দৌড়ে আসত হইহই করে। একবার মহকুমার এস ডি ওবাহাদুরও বাস ঠেলে যাত্রীদের অনুপ্রাণিত করেন। কারণ সেবার কি একটা ক্ষোভে স্থানীয় লোকেরা বাস কোম্পানির ওপর চটে গিয়েছিল।

তখন বাজার বলতে একটা হাটতলা। গোটাকতক ছোট ছোট খাবারের দোকান—বেশির ভাগই তেলেভাজা। দুটো দর্জির দোকান। পান বিড়ি ও পাসিংশো সিগারেট বিক্রি হত খোলা আকাশের নীচে। প্রথম চায়ের দোকান খোলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে। তখন এক শহুরে কণ্ট্রাক্টার এলাকার শিমুলগাছ উজাড করতে এসে আস্তানা গেড়েছিল হাটতলার পাশে কুমোরদের একটা ঘরে। তিনি ও তাঁর লোকেরা খুব চা খেত। জানতে পেবে গাজু মালাকার প্রতিমা তৈরীর অবসরকালে চায়ের দোকান খোলে। পরে গাজু তো প্রতিমা গডা ছেডেই দিল। এখন তার নাতি বাণীব্রত সেই দোকান চালাচ্ছে। নাম দিয়েছে নীলা কাফে। নীলা তার বউয়ের নাম। দোকানে ফ্যান আছে। কেবিন আছে তিনটে। কাউণ্টার আছে। বয়বৃন্দ আছে। মেনুর বোর্ড আছে। কাটলেটের দাম আশাতীত সস্তা—শহরের তুলনায়। অর্ডার দিলে মোগলাই পরোটাও সার্ভ করা হয়।...

কিন্তু কফি? কাপেতে কফি থাকবে না, তা কি হয়? বাণীব্রত কালের হাওয়ার গন্ধ টের পায়। এই সড়ক এখন জাতীয় সড়কের প্রেসটিজ পেয়েছে। শহীদ মিনার থেকে উত্তরবঙ্গগামী বাসগুলো দোমোহানী বাজার ছুঁয়ে যায়। এখানে তাদেব বাত পোহায়। ১৫ মিনিট বিশ্রাম ও চা-পান। সামনে নীলা কাফে। রাত চারটেয় কিচেনে আলো জ্বলছে। পাঁচটায় উনুনে গনগনে আগুন। মোড়ের দিকে সবুজ রঙের বাস বুকে বাঘের হলুদ মুণ্ডু ঝুলিয়ে তেড়ে-মেরে গাঁক গাঁক করে আসছে। বাণীব্রত ডাকাডাকি জুড়ে দেয়—ঘোঁতন! পুঁটে! এ্যাই গুপ্টে! এসে গেল।

এখানে বলা দরকার, আমাদের রতনকুমার নীলা কাফেতে এসে প্রথম দিনই অপমানিত বোধ করেছিল। বাণীব্রত তাকে পাত্তা দেয় নি—তার চেয়ে বড় কথা, সে খামোকা টেবিল আটকে রাখা পছন্দ করে না। যুবকদের খুব রাগ আছে তার ওপর। কিন্তু সুযোগ পায় না। বাণীব্রতের জামাইবাবু দোমোহানীর থানার সেকেণ্ড অফিসার। কী অপূর্ব যোগাযোগ!

সে রতনকুমারের উদ্দেশে বলছিল—টেবিল খালি করুন ভাই, টেবিল খালি করুন

সে রতনকুমারকে পাত্তা দেবে কেন? উত্তরবঙ্গ-কলকাতা যাতায়াতকারী বাসের যাত্রীদের মধ্যে অসংখ্য লম্বা চুল, ঢোলা-পাতলুন, রঙচঙে শার্ট এবং প্রকাণ্ড টাইও, এবং হাতে ভি আই পি ব্যাগ—এই প্রকার স্মার্ট মানুষ থাকে। তারা কেউ-কেউ নিয়মিত যাত্রী এবং হাই বাণীদা বলেও সম্ভাষণ করে।

আর তুমি সেই শীতু ঘোষের ব্যাটা—গুটিপোকা থেকে পরজাপতি হয়েছে। এখানে থাকলে মাথায় লাল ফেট্টি জড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে বিলে মোষ চরাতে যেতে। কখনও ড্রাম মাথায় নিয়ে নীলা কক্ষেতে দুধ সাপ্লাই করতে আসতে! অতএব ওসব ডাঁট অন্য জায়গায় দেখিও। এ বাণীর কাছে নয়।

ব্লকের সমাজ শিক্ষা অফিসারের ট্রেনিং-মতে দোমোহানী-ঘোষের ডাঙার লোকাল ট্রাডিশনের এটি কিন্তু একটি প্রচ্ছন্ন স্যাম্পেল। (অর্থাৎ সেই জাতিবর্ণ-ভেদাভেদ সংস্কার সমানে চালিয়েছে) নতুবা বরুণ ব্যানার্জীর ছেলে সেই গৌতম ব্যানার্জী—যে ম্যাড্রাসে থাকে এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান এক খ্যাদানাকীর প্রেমে পড়েছিল, সে অন্তত আধ ঘণ্টা ভ্যানর ভ্যানর করে গেল বাণীব্রতের সঙ্গে। তার বেলা?

অবশ্য বাণীব্রতের কৈফিয়ৎ থাকতে পারে। সে ইডলি ধোসা ইত্যাদি ব্যাপারে পরামর্শ নিচ্ছিল। ব্লকের কমিউনিটি সেণ্টারে সম্প্রতি এক সাউথ ইণ্ডিয়ান ইনস্ট্রাক্টর-কাম-এক্সপার্ট এসেছেন। ক্রমে আরও আগমন ঠেকায় কে? প্রভিন্সিয়ালিজম তুললে থাপ্পর মারব গালে। এই বিরাট দেশ ভারতে সবাই ভারতীয়। সন অফ দা সয়েল কথাটা পলিটিকস। বুঝেছ? অমুক ব্যাংকের দোমোহানী শাখায় আমরা অতি শীঘ্র অবাঙালী অফিসার ও কর্মী চাই। কারণ বাঙালী অফিসার ও কর্মী মহা টেঁটিয়া। খালি জল খায়, সিগারেট ধরায়। চা খায়, সিগারেট ধরায়। আর তক্কো করে। পায়চারি করে। তাবৎ কাগুজে বিষয় নিয়ে ভনভন করে। মাঝে মাঝে ব্যাজ পরে। বারান্দার নীচে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেয় কখনও। তার ওপর গ্রামাঞ্চলে লোড শেডিংয়ের তো মা-বাপ নেই। তখন বাবুরা হাইওয়েতে হাওয়া খেতে বেরোয়। মাথা ভেঙে মরলেই বা কী!...

(পাঠক, অপরাধ লইবেন না। এই পরিচ্ছেদের আগাগোড়া নোলে ভটচাযের পল্লীবার্তা হইতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিয়াছি। আমি বহুকাল হইল গ্রাম ছাড়িয়া কলকাতাবাসী। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে

আমার জ্ঞান পত্রপত্রিকা-লব্ধ। সুতরাং সর্ব্ব মতামত নোলে ভটচাযের বলিয়া গণ্য করিবেন।

তো এবার আরেকটি ট্রাডিশন উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি হল চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসব। দোমোহানীর তথাকথিত ছোটলোকেরাই এর উদ্যোক্তা। তবে ভদ্রলোকেরাও ধর্মভয়ে কিছুকিঞ্চিৎ যোগাযোগ রাখতেন। এই গাজনের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল সঙ এবং ব্যঙ্গরসাত্মক ছড়াগীত। মাধব ভটচায ওরফে মেধোঠাকুর ছিলেন কবিয়াল। নিজেকে লোককবি ও চারণ-কবি বলতেন। এই সঙ ও ব্যঙ্গগীতির বিষয় স্থানীয় কোনো কেলেঙ্কারি কেন্দ্র করেই রচিত হত। এসব রচনার বড়ো অংশ মেধোঠাকুরের। নিজেও নেচে নেচে গাইতেন। তবে হাটে হাঁড়ি ভাঙার এই ব্যবস্থাতে গ্রাম্য কনসেপশান অনুসারে আর্ট থাকায় মাথা ফাটাফাটি বিশেষ হত না। লোকেরা মৃদু হেসে উপভোগ করত। মেনে নিত। যেন আর্ট ফর আর্টস সেক।

গাজনের রবরবার যুগে শিবু চক্কোত্তি ষাঁড় কিনলে অবশ্যই ব্যাপারটা ভারি উপভোগ্য সঙ ও ছড়ার বিষয় হত। শিবু বাঁজা মানুষ। ঈষৎ ল্যাম্পট্যের-কুখ্যাতিও আছে। অতএব কী যে জমত, ভাবা যায় না!

তারপর রতনকুমারের প্রত্যাবর্তন বা ফটিকের পুনরাবির্ভাব! এ নিয়েও মেধোঠাকুর ও তাঁর বাগ্দী বায়েন কুনাই বাউরি অনুচরবৃন্দ কী কাণ্ড করতে পারতেন, বোঝাই যায়।

কিন্তু মেধোঠাকুর বেঁচে নেই। গাজনে ছোটলোক মানুষদের আর উৎসাহ নেই। আজকাল তারা প্রায় ভিখিরি হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ শহরে পালিয়ে গেছে পেটের দায়ে। কে আর গাজন করবে? টেস্ট রিলিফ বন্ধ। ভিটের সব তালগাছ খেজুরগাছ রস ঝরানোর বয়স পেতে না পেতে বেচে খেয়ে বসেছে। এখন আর তাড়ি জোটে না। নিধু শা মশায়ের পচুইয়ের দোকানে পয়সা জুটলে যায়, নয়তো বাজারে টো টো করে ঘোরে। টেস্ট রিলিফ চললে গম থেকে পচুই নিজেরা বানিয়ে খেতে পারত। যেমন ভগবান, তেমনি সরকার মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন। কী দোষটা করেছিলাম গ গতজন্মে? সরস্বতী বুড়ী —যে ছিল গাঁয়ের ধাইমা, বাস স্টাণ্ডে বসে মাথা কোটে। ও বাবারা! ও গ বাবারা! পয়সা দ্যাও না দ্যাও, বহলো যাও গ—কী দোষ করেছিলাম গতজন্মে? সব পোয়াতী আজকাল শহরে বিয়োতে যায়। শোনা যাচ্ছে, এখানেও মাতৃসদন হবে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেণ্টার বসে গেছে। গোড়ার দিকে ছোটলোকরা

টাকার লোভে নিজেদের এবং বউদের প্রজনন ক্ষেত্রটির বারোটা বাজিয়ে বসে আছে। অনেকে তিনবার-চারবারও। কেমন করে তা হয়? হয়। এ রহস্য নলে ভটচাযের কাগজে ফাঁস হয়েছিল। কোনো ফল হয় নি। বরং নোলে ভটচাযকে খুব অপমান করা হয়েছিল। গরীবরা দুটো পয়সা পাচ্ছে, এতেও আপনার চোখ? ধিক্ আপনাকে। নোলে ভটচায জানতেন, গরীবরা পাচ্ছে না তা নয়—তবে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দফায় পয়সাকড়ি অ-গরীবরাই বেশি মেরেছে।

তাহলে লোকাল ট্রাডিশন শেষমেশ কী দাঁড়াল? প্রকৃতি কখনও শূন্যতা সয় না। সেই গাজন এবং মেধোঠাকুরের রূপান্তর ঘটেছে। দোমোহানী পল্লীবার্তা এবং তার সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য সাহিত্যভারতী কাব্য-সরস্বতী বিদ্যাবিনোদ মশায়ের মধ্যে সেই পুনরাবির্ভাব। আর্ট ফর আর্টস সেক বলুন, হিতবাদী বিবেকপ্রসূত আদর্শবাদ বলুন, মোদ্দা ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছে।

আর সেই হুজুগ এবং হইহই? শেয়াল মারা হনুমান খেদানো উদ্দীপনা? ট্রাডিশান সমানে চলছে। ওই শুনুন, হাইওয়েতে একদল ছেলেছোকরা হই হই করে ছুটে চলেছে। শিবুর ষাঁড় ক্ষেপে বেরিয়েছে নাকি? বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ওরা কেষ্টপদর পিছনে হয়তো লেগেছে। আজকাল এই এক সেনসেশান। ব্যাপারটা দেখতে হয়।...

॥ পাঁচ ॥

আলেকজাণ্ডার, কেষ্টপদ ও গার্গী

ঘটনার সূত্রপাত এভাবে।

দোমোহানী বাজারের মধ্যে দিয়ে গেছে হাইওয়ে নম্বর থার্টিফোর। সকালে বিকেলে রাস্তার দুধারে এই আশ্বিনে স্তূপীকৃত পাট কুমড়ো লাউ বেগুন এসব আনাজপাতি ট্রাকের অপেক্ষায় থাকে। তার ফাঁকে জায়গা করে নেয় একদল বহিরাগত ফেরিওলা। এরা আসে দুপুর গড়িয়ে শহরের দিক থেকে বাসে চেপে। বাস থেকে বোঁচকা নামিয়ে ঝটপট এরা জায়গা নেয়। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রঙচঙে ফরেনমেড ফুলপ্যাণ্ট শার্ট আর ফ্রক ছড়িয়ে নিলাম নিলাম সোরগোল তোলে। প্রথমে লোকে ভাবত, এরা বুঝি কলকাতা থেকে এসেছে। পরে জানা গেছে,

এরা আসে পদ্মাসীমান্ত থেকে। এই পোশাকগুলো সিন্থেটিক ফাইবারে বোনা। নোলে ভটচাযের পল্লীবার্তায় প্রকাশ,এসব মাল আরব্য মুশলিম দেশগুলি ভাই-বেরাদর—ওপার বাংলার দুর্গতদের ইজ্জত ঢাকতে দান করেছিল। সব পাচার হয়ে পদ্মা ডিঙিয়ে চলে আসছে এপারে। একটা প্যাণ্টের দাম মোটে বাইশ টাকা। সীমান্ত এলাকায় নাকি আরও সস্তা। নিয়ামুদ্দির শ্বশুরবাড়ি ওদিকে। ক্লাস নাইনে পড়া মেয়ের জন্মে উজ্জ্বল বেগুনীরঙের সিন্থেটিক কাপড়ে তৈরি ফ্রক কিনে এনেছে মাত্র এগারো টাকায়। মেয়ে তো মেমসায়েব হয়ে গেছে। আর দোমোহানী-ঘোষের ডাঙায় এ পোষাকের এখন প্রায় ছড়াছড়ি। ঘোষেদের শ্যামা—যে কি না একমাত্র গাইমোষ বেচে ট্রানজিস্টার কিনে কীর্তি স্থাপন করেছিল, তার পরনে সেই প্যাণ্ট শোভা পাচ্ছে। সেই প্যাণ্ট পরে শ্যামা কোমরে ক্ষুদে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে এখন বিলের ধারে পিরিমল ঘোষের মোষটা চরায়। আশ্বিনে বিলের জল ভরা। কালচে ফাঁড়িঘাস গজিয়েছে জলে। নলের মতো এসব ঘাসের ডগায় শামুক ওঠামাত্র ভেঙে যায় এবং টুপ করে বেচারা আবার জলে পড়ে যায়। সারাক্ষণ এরকম রবার্ট ব্রুসের গল্প। আর দিগন্তবিস্তৃত জলের আকাশে লতা মুঙ্গেশকর ও রফি এনতার চ্যাচামেচি করেন। শ্যামা ত্রিভঙ্গঠামে ঠ্যাঙের ফাঁকে লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শোনে। মাঝে মাঝে অভ্যাসে মোষের উদ্দেশে বলে—ধোঃ ধোঃ !

এই শ্যামাই সূত্রপাত করল।

আজ সে মোষ চরাতে যায় নি। কারণ তাহলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে এবং তার শার্টটা কেনা হবে না। সে একটা শার্টের দর করছিল। পনের টাকা চা[illegible] বারোর বেশি সাধ্য নেই। দরাদরি করতে করতে হঠাৎ ফেরিওলাটা তাকে বলেছে— তাহলে আর চাঁদ নাই বা ধরলে (ওরা বড় রসিক) মাণিক !

হয়েছে কী, মাণিক শ্যামার বাবার-নাম। শ্যামা খাপ্পা হয়ে শার্টটা ছুঁড়ে ফেলতেই কালভার্টের ধারে গর্তে পড়েছে। সেখানে রাতের বৃষ্টির জল ছিল। ফেরিওলা চড় তুলেছে। শুধু তাই নয়, নাবালক বলে গাল !

এই শব্দটার ব্যাপারে ঘোষের ডাঙার স্পর্শকাতরতা অতি তীব্র। শ্যামা তার জামা খামচে ধরে গর্জে উঠেছে—কী বললি শালা ?

ব্যস ! ধস্তাধস্তি বেঁধে গেল। কাপড়গুলো পায়ের তলায় ছত্রখান। হঠাৎ কোত্থেকে পাগলা কেষ্টপদ এসে সেই ফাঁকে একগাদা কাপড় তুলে নিয়ে

দৌড়ুল। তখন ফেরিওলা শ্যামার কথা ভুলে চ্যাচাতে চ্যাচাতে তার পিছনে ছুটল। এতকাল বাদে তাহলে কেষ্টপদর 'রেনেশাস'! (নো. ভ. দ্র)

পাগল দৌড়ুলে একেবারে রকেট। লোকেরা হইহই করে মজা দেখছে। দৌড়ুচ্ছে ও সাবাস দিচ্ছে কেষ্টপদকে। কেষ্টপদ ব্লক এরিয়া পেরিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। ফেরিওলাকে দেখে আবার দৌড় শুরু করল। তারপর বাঁদিকে ঘুরে শিবুর খামারবাড়ি ও ডেয়ারিতে ঢুকে পড়ল।

শিবুর ষাঁড়ের নাম আলেকজাণ্ডার। আটচালায় সে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে চেন বাঁধা। কেষ্টপদ আলেকজাণ্ডারকে দেখে তার শিঙের ওপর কাপড়গুলো ছুঁড়ে ফেলে হি হি করে হেসে বলে উঠল—পেণ্টুল পর। জামা পর। সায়েব সাজ্।

কেষ্টপদর এ সাধ সম্ভবত অবচেতনায় ছিল বহুদিন থেকে। আলেকজাণ্ডার নাকি সায়েবষাঁড়। সায়েব হয়ে তার ন্যাংটো থাকাটা উচিত মনে হয় নি হয়তো। এতদিনে সুযোগ পেয়ে কেষ্টপদ তার জন্যে সায়েবী পোষাক সংগ্রহ করে এনেছে। জিভ কেটে বলতে থাকল—ছি ছি। ন্যাংটা থাকে নাকি? পেণ্টুল পর, জামা পর।

কী থেকে কী হয়। কেষ্টপদ এতকাল পরে কথা বলল। গেটের দিকে বারবার তাকায়, সে-লোকটা আসছে নাকি দ্যাখে, আর হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে চোখ নাচিয়ে বলে—পরে ফ্যাল! পরে ফ্যাল্!

একটু তফাতে বারান্দায় বসে শিবু নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। অন্যপাশে আটচালায় নলযন্ত্রে দুধ দুইছে নটবর। আর এদিকে আলেকজাণ্ডারের শিঙ ও মুখ ঢেকে গেছে কাপড়ে। সে মাথা নাড়া দিচ্ছে। গলার [illegible] ঝুন করে বাজছে। একটা জামা এমনভাবে শিঙ অব্দি জড়িয়ে গেল যে আর কিছুতেই সরাতে পারছে না আলেকজাণ্ডার। সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে তার নড়াচড়া বাড়ছে। কেষ্টপদ সমানে হাসছে। হাততালি দিচ্ছে। পোশাক পরতে প্ররোচিত করছে। শিবু উঠে দাঁড়াল।

আচমকা গাঁক করে উঠল আলেকজাণ্ডার। তারপর লাফ দিল। লোহার খুঁটি নড়ে গেল।

আসলে বোকামিটা শিবুর নিজের, সেটা পরে বুঝেছিল সে। লোহায় যে মরচে ধরে, এ কথা ভাবে নি। আলেকজাণ্ডার চোখ থেকে বাধা হটাতে ফের গর্জন করে যেই আরেক লাফ দিল, মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে এল লোহার গোঁজ।

তারপর ভয়ঙ্কর শক্তির আবির্ভাব ঘটল বলা যায়।

আলেকজাণ্ডার চোখ-ঢাকা অবস্থায় গর্জন করতে করতে দৌড়ুল। কেষ্টপদ ততক্ষণে ভয় পেয়ে ওপাশে একবারে গাইগরুর পেটের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে।

শিবু চেঁচিয়ে উঠল—আলেকজাণ্ডার! আলেকজাণ্ডার!

আলেকজাণ্ডার গ্রাহ্য করল না। মাঝে মাঝে মাটিতে শিঙের কোপ বসাচ্ছে, আর দৌড়ুচ্ছে। দেখতে দেখতে সে হাইওয়েতে গিয়ে পড়ল। তারপর প্রচণ্ড লাফালাফি জুড়ে দিল।

ফেরিওয়ালা তখন রাস্তার পাশে দেবদারু গাছের ডগায় উঠে গেছে। বাজার থেকে দৌড়ে আসা হুজুগে ছেলেছোকরারা উল্টোদিকে পালাচ্ছে। ছাতুবাবুর ইটখোলার লরী আসছিল এসময়। তার হর্ন শুনে আলেকজাণ্ডার দৌড়ে গেল সেদিকে। জামাটা ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই। কিন্তু চোখের বাধা পুরো সরে নি। কংক্রিটে শিঙ মারতে গিয়ে রক্ত ঝরছে কপালে।

লরী থামিয়ে ড্রাইভার এবং মজুররা পালিয়ে গেল মাঠের দিকে। ধানক্ষেতে লুকিয়ে রইল। আলেকজাণ্ডার লরীর সামনে বারকতক গুঁতোগুঁতি করার পর দেখা গেল চোখের বাধা সরেছে। শিঙে বেঁধা একটুকরো কাপড় মুখের পাশ দিয়ে ঝুলছে। তারপর তার কী হল, উল্টো দিকে ঘুরল এবং হনহন করে চলতে থাকল বাজারের দিকে। লোহার শেকলের ডগায় ভাঙা গোঁজটা একটানা বিশ্রী শব্দ তুলল।

শিবু ও তার লোকেরা বেরিয়ে এসেছে। শিবু ডাকাডাকি করছে—আলেকজাণ্ডার! আলেকজাণ্ডার!

আলেকজাণ্ডার উন্মত্ত। সে শোধ তুলতে যাচ্ছে। গ্রাহ্যও করল না।

ব্লক এরিয়া পেরিয়ে বাঁয়ে কাঠগোলা, ডাইনে প্রগতি প্রেস। খট্ খট্ খট্ খট্ ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন আসছে। মার্কেট এরিয়া শুরু। পাটের স্তূপে পা ঝুলিয়ে বসে আছে ট্রাকের প্রতীক্ষায় ব্যাপারীরা। হাটতলা ঘেঁষে মেছুনীরা সার বেঁধে বসেছে জলের শস্যসম্ভার সাজিয়ে। ফেরিওয়ালারা তখনও নিলাম নিলাম সোরগোল তুলছে। দোকানে-দোকানে ভিড়। ওয়ে-সাইড টি স্টল, বিহারী হাজাম এবং মুচিবৃন্দ, আশেপাশের গাঁ থেকে আসা লোকের ভনভনানি, বাস স্ট্যাণ্ডে প্রতীক্ষারত যাত্রীদল, সাইকেল-রিকশার দঙ্গল ধানভানা কলের চত্বরে গরুমোষের গাড়ি এবং ট্রাফিক জ্যাম, গোবিন্দ দত্তর কয়লা ও কেরোসিনের আড়তে লম্বা কিউ, দোমোহানী বাজারের প্রসারমান লম্বাটে ও জটিল শারদীয়

বিকেলচিত্র অথবা দেশী-বিদেশী সুর মেশানো আদি অকৃত্রিম রবিশংকরীয় অর্কেস্ট্রা সুরের এবং শিঙের বেমক্কা ঘায়ে তুমুল ক্র্যাক!

হইহই আওয়াজে ভড়কে গিয়ে আলেকজাণ্ডার চার ঠ্যাঙ তুলে দুবার গর্জন করল—গাঁ-আঁক্! গাঁ-আঁক্!

তার পশ্চাদ্ধাবনকারী যুবকেরা বড় আমোদগেঁড়ে। দ্রুত টিন যোগাড় করে ক্যানেস্তারা বাদ্য জুড়ে দিয়েছে। এইতে আলেকজাণ্ডার আরও ক্ষেপল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ুল। একখানে রোডস ডিপার্টের তারকাঁটার বেড়ায় ঘেরা ওপেন্‌-এয়ার গোডাউন। বেড়ার একপাশে রাস্তার ধারে অজস্র খালি হয়ে যাওয়া পীচের ড্রাম থরেবিথরে সাজানো ছিল। সেই কালো কুৎসিত স্তূপের দিকে তাকিয়ে আলেকজাণ্ডারের মতিভ্রম হল। সে বুলডোজারের মত ঢুঁ দিল স্তূপে। মেঘের লম্বাটে ডাক ডেকে ড্রামগুলো গড়িয়ে পড়তে থাকল। সেই গুমগুম গগনভেদী আওয়াজে এতক্ষণে বেজায় ভয় পেয়ে হাঙ্গেরী ও হরিয়ানার মিশ্রিত রক্তের প্রতীক এবং যথার্থ মডার্ণ ইণ্ডিয়ান কালচারের এই সরস নমুনাটি লেজ তুলে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল।

গলির মুখে বালক সংঘের ঘর। বিসর্জনের মিছিলের জন্য প্রতি বিকেলে সেখানে বালকবৃন্দ জয়ঢাক, ভেঁপু, বাঁশের বাঁশি ইত্যাদির চর্চা করে। শিক্ষক পাড়ারই বয়স্ক যুবক ননীদা। মুখে কালো কুচকুচে গোঁফদাড়ি আছে। ফর্সা রঙ। একদা স্কাউট ছিল বা ছিলেন। বিসর্জনের মিছিলের মধ্যে ওই শান্ত গম্ভীর ও কলের পুতুল মূর্তির এগিয়ে পিছিয়ে প্রেরণা-দান-মহিলাদের অতি দর্শনীয় বস্তু। যাই হোক, ননীদা বারান্দায় ভেঁপু বা বিউগল হাতে বসেছিলেন গম্ভীর মুখে। ছন্দে বাজছিল জয়ঢাক ও সর্বসাকল্যে এক ডজন বাঁশের বাঁশি। ননীদা সবে কী খেয়ালে ভেঁপুখানি শারদীয় সজে-নীল আকাশের উদ্দেশে নিবেদন করার মত প্যাঁক, কু প্যাক করে বাজিয়ে দিয়েছেন, গলিতে আলেকজাণ্ডারেরও আবির্ভাব ঘটেছে।

তারপর কী সব ঘটল, বর্ণনা কঠিন। কারণ আমাদের দৃষ্টি আলেকজাণ্ডারের দিকে। পাঠক অনুমান করুন ননীদার কী কী করণীয়। আমরা ছুটেছি ক্ষিপ্ত মত্ত উচ্চকিত ও ভীত এই বিমিশ্র প্রতিক্রিয়াপূর্ণ এক জান্তব অস্তিত্বের পিছনে।

এই এলাকা হল গিয়ে আদি দোমোহানী। ইট ও মাটির ঘর, পভার্টি এ্যাণ্ড প্রাইড পাশাপাশি (রুডিয়ার্ড কিপলিং দ্রষ্টব্য), গলিখুঁজি পথ, কালকাসুন্দে বন হলুদ ফুলে ভরা, ডোবা ও বাঁশবন, সেই অকৃত্রিম পাড়াগাঁ।

বারোয়ারিতলা। গাঁওবুড়োদের আড্ডা। গাছগাছালিতে পাখপাখালির তুলকালাম। পোড়ো বাস্তুভিটের আগাছার মধ্যে গ্রাম্য মহিলারা ট্রাডিশান অনুসারে নাকে কাপড় ঢেকে বসে চাপা গলায় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন। আলেকজাণ্ডার ট্রাডিশান মানে না। গাঁওবুড়ো ও এইসব মহিলাদের ছত্রভঙ্গ করে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে পড়ল। তারপরই সে যেন ভেতরের দিকে আক্রান্ত হল অতর্কিতে।

অপার সবুজ সৌন্দর্যময় ধানক্ষেত ও দূরের কুয়াসা ক্রমশ তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলল। বস্তুত এই নৈসর্গিক নির্জনতাময় বিরাটের কাছে সব আস্ফালনই অহেতুক এবং ক্লান্তিকর।

আর হতভাগ্য আলেকজাণ্ডার অল্পস্বল্প আহত। সে মুখ বাড়িয়ে একগোছা ধানগাছ ছিঁড়ে নিল। একটু দাঁড়াল। তারপর শান্তভাবে চিবুতে চিবুতে আলপথ ধরে সিধে এগোলো দিগন্তের দিকে। প্রকৃতির কাছে কারও 'চ্যারাক্-পোঁ' (নোঃ ভঃ দ্রঃ) চলে না। সে তুমি চাঁদে যাও, কী ব্ল্যাক হোলে গিয়ে ঢুঁ মারো—প্রকৃতির আগ্রাসী স্বভাব তোমাকে কেঁচো করে। তুমি বাপু কীটানুকীট। বালুকণাবৎ তুচ্ছ। কাজেই আলেকজাণ্ডারের তড়পানি মাঠে মারা যেতে বাধ্য। (পুনরপি নোঃ ভঃ দ্রঃ পল্লীবার্তা ৫ম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা।)

যাই হোক, আশ্বিনের সবুজ মাঠে শিবুর লাল ধূসর ষাঁড় হেলতে-দুলতে যখন দূরের কুয়াসায় অপস্রিয়মাণ, তখনও অনুসরণকারী আমোদগেঁড়েরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দল এখন টুকরো টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে। ষাঁড়ের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বেশি থাকায় এই বিভ্রান্তি। কিন্তু ক্ষুদে দলগুলো চ্যাচামেচি করতে ভুলছে না। এর ফলে দোমোহানীর সব পাড়ায় কম সময়ের মধ্যে শিবুর ষাঁড়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। সব বাড়ি সতর্ক। বাচ্চা ও স্ত্রীলোকদের বেরুতে দিচ্ছে না বয়স্কেরা। মধু বড়ালের দুই মেয়েকে ছুটির মাসে বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা দু' ঘণ্টা পড়াতে যায় গার্গী। মাসে পঞ্চাশ টাকা ফি। পাড়াগাঁয়ে এত ফি কেউ দেয় না। মধু বড়াল আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া ব্যবসায়ী। তার ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর আছে। ময়দা-পেষা কল আছে। দৃষ্টিভঙ্গী শহুরে অর্থাৎ আধুনিক। তাই থ্রি-কোরে পড়া কন্যাদ্বয়ের জন্যে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা খরচ করাটা স্বাভাবিক বিবেচনা করে। গার্গীকে সে বিদুষী ও সন্ন্যাসিনীর মতো নিষ্পাপ জ্ঞানে খাতির করে। অন্তত দোমোহানীর শিক্ষিতা

যুবতীদের যেসব চরিত্র-চাঞ্চল্যের গুজব আছে, গার্গীর তেমন কিছু নেই। বেশ সাদাসিদে থাকে। চোখে শান্ত চাউনি আছে। অর্থাৎ ঝিলিক নেই।

গার্গী ও তার ছাত্রীদ্বয়ের কাছে ষাঁড়ের খবর পৌঁছুলে তারা একবার তাকা-তাকি করেছিল শুধু। রীণা ও টিনা যদিবা জানালায় উঁকি মেরে ক্ষ্যাপা ষাঁড় দেখার তালে ছিল, সামনে রাশভারি দিদিমণি। পাঁচটা বাজার পর দিদিমণি উঠলে রীণা-টিনা দোতলার ছাদে গেল ষাঁড় দেখতে। ওদের মা গার্গীকে বেরুতে দিল না। বাইরে ক্ষ্যাপা ষাঁড়। আরও মিনিট পনের অপেক্ষা করে এবং বাইরে শান্তি টের পেয়ে গার্গী বেরুল।

গলিঘুঁজি রাস্তা ঘুরে শর্টকাটে আগাছাভরা একটুকরো ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাবার সময় গার্গী শুনলে হইহই করতে করতে আমোদগেঁড়েরা আসছে। তারা তো হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে ছোটাছুটি করছে। বেচারী গার্গী থমকে দাঁড়াল। শিবুর আলেকজাণ্ডার দেশে বিচিত্র মিথ সৃষ্টি করেছে। গার্গীর কৌতূহল থাকলেও তাকে দেখার সুযোগ হয় নি। সে হতচকিত হয়ে পড়ল। তারপর দলটা এসে তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল—পালান! পালান! এই হুঁশিয়ারী যে নিতান্ত তামাসা, গার্গী কেমন করে বুঝবে? সে স্বাভাবিক আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পাশের বাঁশবনে ঢুকে পড়ল। তাই দেখে তামাসাওলারা আরও চেঁচামেচি শুরু করল।

গার্গী আরও বিভ্রান্ত হয়ে বাঁশবনের ওধারে ইটখোলায় গিয়ে উঠল। ইট-খোলার পূবদিক ঘুরে অনেকটা এগোলে তাদের বাড়ির পেছন দিকটা পড়ে। ইটখোলার খাদ এখন জলে ভরা। জল না থাকলে সে সোজা চলে যেত। পূবদিকটা ঘুরে ঝোপঝাড় ভেঙে সে কিছুটা এগিয়েছে, শাড়ি ইতিমধ্যে ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়েছে এবং গায়ে ও মাথায় শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল, কাঠকুটো লেগেছে, সামনে সরু একফালি রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছে দেখতে পেল।

গার্গী অপ্রস্তুত এবং বিব্রত হল। থমকে দাঁড়াল। তারপর তার হৃদ্‌পিণ্ডে কী একটা ঠাণ্ডা শিহরণ ঝিলিক দিল। কুখ্যাত মস্তান গিরিজা দাঁড়িয়ে আছে। সাপের চোখে তাকে দেখছে।

ফালি রাস্তাটা একটা পায়ে-চলা পথ মাত্র। তার ওধারেও অনেকটা আগাছার জঙ্গল। তারপর ছড়ানো-ছিটানো কয়েকটা একেলে ধাঁচের নতুন একতলা বাড়ি। ব্লক আপিস এলাকার পেছনের অংশ ওটা। ইউক্যালিপ্টাস

আর ঝাউগাছের ওপর শেষ বিকেলের রোদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদিকে কোথাও কোনো লোক নেই। ইটখোলার দিকে উঁচু টানা ঢিবিতে মজুররা ঢোল বাজাচ্ছে। মজুরণীরা উনুনে আঁচ দিয়েছে। বাঁদিকে সামনা-সামনি প্রগতি প্রেসের জানালা দেখা যাচ্ছে—অনেকটা দূরে। নলিনী কম্পোজ করতে করতে এদিকে তাকালে মেয়েকে দেখতে পেতেন। কয়েক মাস আগে তাঁর কাগজে ইদানীং পল্লী অঞ্চলের এই সব লোচ্চা মস্তান গুণ্ডার কীর্তিকলাপ (গিরিজার নাম ছিল না) বেরিয়েছিল। শহর থেকে সিনেমা দেখে রাতের বাসে ফেরা দুটি নির্বোধ যুবতী (তাদেরও নাম ছিল না) কীভাবে ওদের পাল্লায় পড়ে এবং ধর্ষিতা হয়, তার ঝাঁঝালো এবং কটাক্ষপূর্ণ বিবরণ ছিল। দিনে দিনে এদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে এবং পুলিশ আশ্চর্য নীরব : এই মন্তব্য ফলদায়ী হয় নি। যুবতীদ্বয়ের অভিভাবকরা ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে চেপে যান। গত মাসেও দিনদুপুরে বাজারে আসা পাশের গাঁয়ের এক দম্পতি এদের পাল্লায় পড়েছিল। স্বামীটিকে হাত-পা বেঁধে মাঠের ক্যানেলের স্লুইসগেটের কাছে ফেলে রাখা হয় এবং বধূটিকে তিন মস্তান পালাক্রমে ধর্ষণ করে। ওরা পরে থানায় এসে প্রধর্ষকদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। এক্ষেত্রেও কোনো ফল হয় নি। তবে এই ঘটনাটি সদরে প্রশাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পল্লীবার্তার সম্পাদকের কাছে তদন্তে আসেন আই বি অফিসার। সম্পাদক তাদের নামধাম দিতে পারেন নি। তাই অফিসার তাকে থেটনিং দিয়ে ফিরে যান।

গিরিজা দোমোহানীর প্রাক্তন জমিদার বংশের ছোট তরফের নাতি। এখন নিজের জোরে করে খায়। রাজনীতির পাণ্ডাদের কাজে লাগে তাকে। সেই মার্কামারা পেটেন্ট ব্যাপার-স্যাপার ইদানীংকার। গিরিজার একটা দল আছে। তারা বোমা বানায়। ভাড়াটে গুণ্ডার যা যা কাজ, তাই করে। জোতদার-বর্গাদার সংঘর্ষে টাকা কামায়। সুযোগ পেলে দু'চারটে ডাকাতিও করে আসে, তবে তা বাইরে। ভুলেও এখানে নয়। তারা ক্রুড এবং ধুরন্ধর। কদাচিৎ তাদের থানায় ডাকা হয়। ভর্ৎসনা করা হয়। দু'চারদিন আটকও থাকে। তারপর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে আসে।

এই গিরিজার একটি মোটর সাইকেল আছে। চোখে সানগ্লাস পরে সেজেগুজে সে যখন ভটভটিয়ে হাইওয়েতে আওয়াজ তুলে যাতায়াত করে, তাকে চিনতে পারলে সব রকম যানবাহনের চালকরা রাস্তা ছেড়ে দেয়।

এখন গিরিজার ঠোঁটে সিগারেট, পরনে রঙচঙে বাটিকের কাজকরা লুঙ্গি,

গায়ে নীল স্পোর্টিং গেঞ্জি। তার বয়স তিরিশের এদিকে। তার কব্জিতে স্টিলের বালা এবং গলায় সরু সোনার চেন আছে। তার গায়ের রঙ তামাটে। মুখের সৌন্দর্য ছিল ছেলেবেলায়। এখন ক্ষয়াটে এবং হিংস্র। অশালীন চাউনি। চোখের তলায় কালো ছোপ। গ্রাম্য অভ্যাসে সে এই আগাছার জঙ্গলে জৈব তাগিদে এসেছিল। ইটখোলার খাদের জলে প্রক্ষালন করে পায়ে-চলা রাস্তায় গিয়ে সবে সে সিগ্রেট ধরিয়েছে, হঠাৎ ঝোপ ঠেলে নোলে ভটচাযের মেয়েকে আসতে দেখেছে। বাঁ হাতের মুঠোয় লাইটারটা ধরা। উরুর পাশে সেটা ঠুকঠুক করে ঠুকছে।

গার্গী থমকে দাঁড়ালে সে একটু হেসে বলল, কি গাগু, অবেলায় ঝোপঝাড়ে ঢুকেছ কেন?

গার্গী ভয় কাটিয়ে উঠেছে তারপরই। হাসবার চেষ্টা করে বলল—শিবুদার ষাঁড় ক্ষেপেছে শুনে!

গিরিজা চোখ নাচিয়ে বললে—ষাঁড় তো এখানেও। যাবে কী ভাবে?

গার্গী সঙ্গে সঙ্গে রাগে শক্ত হয়ে গেল। সে ঝোপঝাড় পেরিয়ে রাস্তাটায় আসতেই গিরিজা খপ্ করে তার একটা বাহু ধরে ফেলল। চাপা গলায় হিসহিস্ করে বলল—গাগু, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

গার্গী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে উঠল—খবরদার, গায়ে হাত দেবে না গিরিজা!

তার হাতে একটা মোটা বই, রুমাল আর কলম ছিল। সেগুলো ছিটকে পড়ল। কিন্তু গিরিজার হাত ছাড়াতে পারল না। গিরিজা থুঃ করে সিগারেটটা মুখ থেকে ফেলে দিল। কিন্তু দামী লাইটারটা পারল না। সে লাইটারসুদ্ধ বাঁ হাতটা কাজে লাগাল। দু'হাতে গার্গীর দুই বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—একদম শেষ করে ফেলব, বলছি। চুপ করে দাঁড়িয়ে কথা শোন।

গার্গী সাহসী ও ব্যক্তিত্ববতী। সে নিজেকে ছাড়াবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে থাকল। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় সে বোবা হয়ে গেছে। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। মুখ দিয়ে কী একটা গোঙানির মতো শব্দ বেরুচ্ছে। গিরিজা ফের চাপা গর্জে বলল—নোলে ভটচায খুব লিখেছিল আমার নামে। এবার কী লেখে দেখতে চাই। তারপর কুস্তির প্যাঁচ মেরে গার্গীর পায়ে পা জড়িয়ে কী একটা করল, গার্গী পড়ে গেল এবং সে তাকে দু'হাতে শক্ত করে ধরে শূন্যে তুলল। ঝোপের দিকে পা বাড়াল।

এই সময় পিছনে কে চেঁচিয়ে বলল—হাই ম্যান! হোয়াট আর ইউ ডুয়িং? তারপর দৌড়ে কাছাকাছি এসে—আবে শালে উল্লুক। ক্যা কার রাহা বে? জান মার দেগা শালেকো!

গার্গীকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গিরিজা। দেখল, শীতু ঘোষের ছেলে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে নেমেছে। সাইকেলটা ঝোপে পড়েছে এবং চাকা দুটো বনবন করে ঘুরছে। শেষ রোদের ছটা ঝিলিক মারছে। তাকানো যায় না।

গিরিজা হনহন করে চলে গেল ঝোপ ঠেলে বাঁশবনটার দিকে। গার্গী হু-হু করে কাঁদছে।

রতনকুমার গিরিজাকে দেখতে দেখতে দ্রুত বলল—ইজ হি ইউর লাভার?

গার্গী জবাব দিল না। রাস্তায় এসে বই কুড়িয়ে কলম আর রুমালটা খুঁজতে থাকল। তার মুখ-চোখের জলে এবং বিবিধ উত্তাপে ও শৈত্যের দরুণ কুৎসিত দেখাচ্ছে। সে হাঁফাচ্ছে। তার শাড়িতে যথেষ্ট ময়লা লেগেছে।

—ইস হি ইজ ইউর লাভার, দেন আই শুড ওভারলুক ইট।

গার্গী ভাঙা গলায় জোরে মাথা দুলিয়ে বলল—ন্না!

রতনকুমার সাইকেলটা ঝোপ থেকে দু'হাতে শূন্যে তুলে রাস্তায় নামাল এবং কিছু বিগড়েছে কিনা পরীক্ষা করতে করতে বলল—দেন হি ওয়াজ ট্রাইং টু রেপ ইউ! ইজ ইট?

গার্গী গোঁ গোঁ করে কিছু বলল, সে বুঝতে পারল না। তারপর গার্গী দ্রুত নিজের শাড়ি ও চুল ঠিকঠাক করে নিল। জলকাদার ময়লাটা অবশ্য থেকে গেল। সে চোখমুখ ঘষে মুছে অস্ফুট স্বরে থ্যাংকস বলে পা বাড়াল।

রতনকুমার সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে তাকে অনুসরণ করে বলল—কে ও?

—আপনি চিনবেন না। গিরিজা। গুণ্ডা একটা! প্রায়ই······বলে সে সতর্কভাবে থেমে গেল।

রতনকুমার ক্রুদ্ধস্বরে বলল—ঠিক হ্যায়। শালাকো হাম সমঝ্ দেগা!

—পারবেন না। ছেড়ে দিন।······বলে গার্গী ফের হিসহিস করে বলল—ফরগেট ইট।

—নেভার। আপনি ভয় পাবেন না গার্গী দেবী। হিরোর গলায় রতনকুমার আশ্বাস দিল।

গার্গী হনহন করে হাঁটছিল। কিন্তু শরীর নিঃসাড়। স্নায়ু আচ্ছন্ন।

বাবাকে কতবার বলেছে, কারুর পেছনে লাগতে যেও না। ক্ষতি করবে। এই সবে শুরু হয়েছে। আজ বাবার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করবেই।

অথচ বুকের কাঁপুনি থামছে না। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, সত্যি সত্যি কী ঘটল বা ঘটতে যাচ্ছিল। এই রহস্যময় যুবকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন নুয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রকাশ করার মতো কথা এবং সময় হাতে নেই।

রতনকুমার হঠাৎ হেসে উঠল জোরে।—জানেন তো? আফটার অল হেরিডিটি বলে একটা ব্যাপার আছে। আমি যেখানেই থাকি না কেন, জানতুম আমি কোন্ সয়েলে জন্মেছি এবং আমার বাবা-কাকা-আত্মীয়জন কেমন দুর্ধর্ষ মানুষ—জাস্ট প্রিমিটিভ ম্যান! আমার ব্লাডে ওটা আছে। কীভাবে টের পেতুম জানেন? মারামারির সময়। খুব মাস্তান টিট্ করেছি। মাইণ্ড ছাট, বোম্বেওয়ালা মাস্তানস। ড্যাগার এ্যাণ্ড গানস্। একবার কুয়াইতে এক নিগ্রো আর এক হারামী আরব বাচ্চা…

গার্গী ঘুরে বলল—প্লীজ, ব্যাপারটা কাকেও বলবেন না। আর আপনার ভালর জন্মেই বলছি, ওদের ঘাঁটাবেন না। আপনি নতুন এসেছেন। ওরা ডেঞ্জারাস।

—ফুঃ! ফুঃ! আই কেয়ার এ ফিগ ফর দা ভিলেজ রাফিয়ানস।

গার্গী ছলছল চোখে দু'হাত জোড় করে বলল—নমস্কার। আপনি ভাগ্যিস এসে পড়েছিলেন!

—ও নেভার মাইণ্ড! চলুন, আপনাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।…

॥ ছয় ॥

দোমোহানীতে সাহিত্যের হালচাল

পল্লীবার্তার শারদীয় সংখ্যা বের করবেন কি না, নলিনী এবার মনস্থির করতে পারেন নি। প্রথম বছরে ডিমাই ষোলপেজী ফর্মায় ফর্মা পাঁচেক ফুলিয়েছিলেন। তার মধ্যে নিজের কম্পোজ এবং ছাপানো দু'ফর্মা ছিল। তাতেই চোখে সর্ষের ফুল দেখেছিলেন। বাকি তিনফর্মার জন্য দু'বেলা শহরে ছোটাছুটি করেছিল হেমেন সিংহরায়। দোমোহানীর উঠতি কবি ও গল্পকার। সারদা বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করে। তার দেড় ফর্মার একটি উপন্যাস (!) ছাপা হয়েছিল।

তার ফলে শহরের শ্রীদুর্গা প্রেসের সেই তিন ফর্মার সব খরচ তার ঘাড়ে গিয়ে চাপে। তারপর সম্পাদকের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। ঝোঁকের বশে 'গ্রামের কাগজ' নামে চারপাতা আটপেজী ডিমাই সাইজের মাসিক পত্রিকাও সে পরে কয়েক সংখ্যা বের করেছিল। স্বনামে-বেনামে গল্পপত্ত ছাপত। স্রেফ সাহিত্য। শহরের কবি-সাহিত্যিকদের কিছু লেখাও ছাপত। এমন কী কলকাতার প্রখ্যাত এক সাহিত্যিকের কাছেও চিঠি লিখে লিখে একটুকরো গল্প পেয়েছিল। প্রথম পাতায় ফলাও করে ছেপেছিল। দোমোহানীর তো বটেই, আশেপাশের গ্রামের ছোকরা লিখিয়েদের নিয়ে সে একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল। নোলে ভটচায আধুনিকতার বোঝে কি ? এখনও তো সেই শরৎ চাটুয্যের যুগে পড়ে আছে। তারা এই-সব বলাবলি করত। মাঝে মাঝে সেমিনার বসাত বিদ্যাপীঠে ছুটির দিনে। তাবৎ গ্রামবাংলার নানা বয়সী লিখিয়েরা এ-জেলা থেকে এসে জুটত। কলকাতার সেই প্রখ্যাত স্যাহিত্যিকটি প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন একবার। অন্যান্য সময়ে আসতেন সদর শহরের দাদা লিখিয়েরা। সভাপতি বাঁধা ছিলেন হেডমাস্টার আশুবাবু। মাইক বাজত। বাচ্চা মেয়েরা মুনিকন্যা সাজত। প্রতিনিধি ফি থেকে খাওয়া-দাওয়া, মাইকভাড়া এবং প্রধান অতিথির রাহাখরচ। ভাষণ ও স্বরচিত রচনা পাঠের সময় প্যাণ্ডেলের সামনে কাচ্চাবাচ্চাদের চেঁচা-মেচিতে সে এক ঝামেলা। দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমোদগেঁড়েরা এবং অভাজন উদোমগা চাষাভূষো মানুষেরা।...

কিন্তু এ থেকে নোলে ভটচায একেবারে বাদ। একবার অস্থির নলিনী হারু নামে একটি নেওটা ও গবেট ছেলেকে খানকতক পল্লীবার্তা বেচতে পাঠিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন—খবর্দার, আমি পাঠিয়েছি বলবিনে। হারু বলে নি। কিন্তু কাগজ হরির লুট হয়ে গিয়েছিল। তারপর হারুকে হেমেনদের ধমক ও ঘাড়ধাক্কা খেয়ে চোখে জল নিয়ে ভেগে পড়তে হয়েছিল। সেই থেকে হারু নলিনীর সামনে আর আসে না।

বছর ঘুরতে ঘুরতে 'গ্রামের খবর' উঠে যায়। হেমেন চুপচাপ মাস্টারী করতে থাকে। কিন্তু নোলে ভটচাযের পল্লীবার্তা বেরুচ্ছে। নলিনীর ঠোঁটের কোণায় মা সরস্বতীর সেই রহস্যময় হাসি।

ওদিকে হেমেনের সাহিত্যের সাধ ঘুচেছে। দোমোহানী ও এলাকার ছোকরা লিখিয়েদের তত গচ্চা যায় নি। তারা প্রগতি প্রেসের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করত। তারপর সাহস করে সম্পাদকের কাছে গিয়ে সাধত। নলিনী

বলতেন—পয়সা লাগবে বাপু। ছোটখাটো পদ্য ছাপাতে পারি। দশটা করে টাকা লাগবে।

টাকা পেয়ে ছাপতেন। কী পদ্য রে বাবা! একছত্রের মানে বুঝতেন না। কিন্তু পল্লীবার্তার লোকসান পুষিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ব্লকে, কোঅপারেটিভে, শিবুর ডেয়ারীতে এবং বাজারে দোকানে দোকানে বিজ্ঞাপনের জন্যে সেই সব কবিদের লড়িয়ে দিতে পারছিলেন। তারাও জান লড়িয়ে দিচ্ছিল। দু'চারটে বিজ্ঞাপন না পাওয়ার কারণ নেই। শুধু টাকা আদায় করতে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়। তবে নলিনী এ ব্যাপারে পোড়খাওয়া সম্পাদক।

কালক্রমে তারাও গা-ঢাকা দিয়েছে। এখন নলিনী একা লড়ে যাচ্ছেন। ইংরেজী মাসের মাঝামাঝি একবার এবং গোড়ায় একবার পল্লীবার্তা বেরোচ্ছে। ডিমাই আটপেজী সাইজের চারপাতার কাগজ। সরকারী বিজ্ঞাপন একটা-দুটো বাঁধা, তিনটে কোঅপারেটিভের সঙ্গে বছরের কণ্ট্রাক্ট আছে। গড়পড়তা সিকি পৃষ্ঠা হিসেবে প্রতি সংখ্যায় একটা। মাঝে মাঝে বাজারের ব্যবসায়ীদেরও ধবে পাকড়ে কিছু আদায় করেন। এইভাবে চলে যাচ্ছে।

পল্লীবার্তার গ্রাকক সংখ্যা কত? সেটা ট্রেড সিক্রেট। তবে গ্রাহক সুনিশ্চিত আছেন। কলকাতায় নানান বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাগনা পাঠান। পাঠান রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। এ-জেলা সে-জেলাতেও যায়। জেলার সদরে কয়েকজনের কাছে যায়। এসবই কমপ্লিমেণ্টারি। চাঁদার গোপন কথা ফাঁস করা উচিত নয়। দোমোহানীর শিক্ষিত কিছু বয়স্ক ও বিত্তবানের কাছে চাঁদা আদায় করেন নলিনী। সরকারী সোসাল এডুকেশনে সাধাসাধি করে জেলার সাহায্যপ্রাপ্ত রুরাল লাইব্রেরীগুলোকে গ্রাহক করতে পেরেছেন। স্কুল-বোর্ডকে সাধাসাধি করছেন। এখনও সফল হন নি। কবে বোর্ডের মেম্বাররা দোমোহানী পল্লীবার্তা পড়ে বলেছেন—ভেরি ইণ্টারেস্টিং। এইতে নলিনী জোঁকের মতো লেগে আছেন। লেগে আছেন।

পল্লীবার্তা ছাপা হয় কত? নলিনী দিল্লিতে রেজিস্ট্রার অফ নিউজপেপারসকে যে বার্ষিক রিটার্ন পাঠান, তাতে লেখা থাকে, প্রতি সংখ্যা পাঁচশত কপি। আসলে ছাপেন দুশো। নিউজপ্রিণ্ট পান। সরকারী বিজ্ঞাপন পান। অতএব এটুকু তঞ্চকতা না করে উপায় নেই।

সেই একবার হেমেনের প্ররোচনায় গচ্চা খেয়েছিলেন। তারপর থেকে শারদীয় সংখ্যা বের করার ব্যাপারে তিনি সর্তক। মোট আট পৃষ্ঠা, কিংবা বিজ্ঞা-

পনের অবস্থা বুঝলে দশ। নিজেই রবার খোদাই করে প্রতিমার মুখের একটা ব্লক তৈরী করে রেখেছেন। মুকুটপরা, টানা-টানা চোখ, নাকে নথ। ব্যস! সিম্বলিক। আর সম্পাদকীয় তো বাঁধা। নীল আকাশ। কাশফুল। মা আসিতেছেন। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান···ইত্যাদি।

কিন্তু এ বছর বিশেষ বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা সুবিধের নয়। ব্লকের একটা টেণ্ডার কলের বিজ্ঞাপন পেয়েছেন। কুমুদিনী হার্ডওয়্যার ইঞ্চি তিনেক ছাপতে বলো। ইউসুফ টেলার্স বলেছে, দু'লাইন দাদু। আপনার খাতিরে বাকি জায়গায় গিয়ে হন্যে হয়ে ফিরছেন। মনে হচ্ছে নো হোপ বা নো চান্স।

এ বছর নলিনীর শরীরটাও আসলে ভাল যাচ্ছে না। কম্পোজ করতে করতে পিঠে কোমরে ব্যথা টনটন করে। মেসিন চালাতে হাঁফ ধরে যায়। মাইনে দিয়ে কম্পোজিটর রাখা অসম্ভব। মাঝে মাঝে ভাবেন, কাগজ কি তুলে দিতে হবে তাহলে? চোখের নজরও ইদানীং শত্রুতা করছে। অথচ শারদীয় সংখ্যা বেরুবে না, এটা বড় দুঃখের ব্যাপার। হু হু করে সময় এগিয়ে আসছে। পরের সংখ্যা মহালয়ার কাছাকাছি বেরুবার কথা। নলিনী অস্থির। আটপাতা কম্পোজ করা সহজ কথা নয়। বিজ্ঞাপন টেনেটুনে একপাতা। সাতপাতা ঠাসা ম্যাটার। পুরনো খাতা হাতড়ে নিজের লেখা বড় একটা কবিতা দেওয়া যায়। বাকি ছ'পাতা টুকরো খবর, একটা মেইন স্টোরি এবং রম্যরচনা। না, ম্যাটারের অভাব নেই। বৈদেশিক প্রসঙ্গ নামে একটা লেখা কবে থেকে পড়ে আছে। গার্গী বলেছিল, শিক্ষায় অরাজকতা নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। নলিনী হাসতে হাসতে বলেছিলেন—ছাপব এক শর্তে। নিজের লেখা নিজে কম্পোজ করতে হবে। গার্গী অভিমান দেখিয়ে বলেছিল—থাক।

থাক কেন? নলিনী ছাপাবেন। মুশকিল হচ্ছে লেখাটা বেজায় বড়ো। চার সংখ্যাতেও শেষ করা যাবে না। কেটেকুটে ছোট করতে বলার সাহস পান নি। গার্গী বড় একগুঁয়ে মেয়ে। একেবারে ওর মায়ের মতো।

এর মধ্যে হঠাৎ নলিনী লক্ষ্য করেছেন, গার্গী কেমন ঝিম মেরে গেছে যেন। সে নড়াচড়া চাঞ্চল্য আর দেখতে পাচ্ছেন না। শিবু চক্কোত্তি ষাঁড়ের কেলেঙ্কারির দিন টিউশানি করে আসার পথে আছাড় খেয়ে সেই যে ফিরল, আর বাড়ি থেকে বেরুতে চায় না। বড়ালবাড়ি থেকে ডাকতে এসেছিল। বলেছে, দিন চার-পাঁচ পরে যাবে। নলিনী জিজ্ঞেস করেছিলেন। গার্গী শুধু বলেছিল, শরীর ভাল না।

নলিনী বিচক্ষণ মানুষ, সাংবাদিক। চোখ-কান বরাবর খোলা। কিন্তু সবিশেষ হদিস করতে পারেন নি।

মাথায় এখন শারদীয় সংখ্যার চিন্তা। অতএব নলিনী আর ও নিয়ে মাথা ঘামান নি। এক রাতে অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের দিকে সিদ্ধান্ত নিলেন, হেমেনের সঙ্গে পুনর্মিলন হোক। শর্ত ঃ তার একটা পদ্য ছাপবেন। সহকারী সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপবেন। তার বদলে হেমেনকে তার খুড়তুতো দাদা সরোজবাবুর হিমঘরের একটা বিজ্ঞাপন এনে দিতে হবে। ফুল পেজ চাই। হ্যাঁ, এর কমে রফা করা যায় না। তাহলেই পুষিয়ে যাবে। ফুল পেজ মানে একশো টাকা। যথেষ্ট। এনাফ! লাফিয়ে উঠল নলিনী।

নলিনী নিজের উদ্দেশে বললেন—ভাই নোলে, তুই সাংবাদিক মানুষ। তোর বেহায়া না হয়ে কি পার আছে?

বটে রে! কিন্তু সরোজ কি হেমেনের কথায় তোর কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে? তুই তারে নামে বেজায়-বেজায় লিখেছিলি!

ধুস্! সে ওর মনে নেই। ব্যস্ত মানুষ। কবে কণ্ট্রাকটারি করত। তার আগে কবে টেস্ট রিলিফে পে মাস্টার ছিল। সে সব কথা চাপা পড়ে গেছে। এখন সরোজবাবু লক্ষপতি লোক। কোল্ড স্টোরেজ বানিয়েছে। আলু ছাড়া আর মাথায় কিস্যু নেই। হ্বিক হ্বিক হ্বিক। খোঁঃ খোঁঃ খোঁঃ! ঠিকই বলেছিস!

গার্গী ভোরে কুকার ধরিয়ে বাবার জন্যে চা করে। নিজেও চা খেয়ে পড়তে বসে। ভেবেছে, বাবা স্বপ্ন দেখে হাসছেন। তাই ডেকে দিল।

নলিনী ধড়মড় করে উঠে বসলেন। গম্ভীর হয়ে বাইরে গেলেন। সূর্য উঠতে দেরি আছে। নীলচে কুয়াসায় ইটখোলার দিকটা দেখে মনে হচ্ছে ঐতিহাসিক দুর্গ। রাত-জাগা চোখে হ্যালুসিনেশান। নলিনী বিমর্ষ হয়ে ভাবলেন, সারাজীবন কী ব্যর্থ মানুষ তিনি। খালি গচ্চা আর গচ্চা! অথচ কেউ তাঁকে পাত্তা দিল না।

কিছুক্ষণ পরে চা খেয়ে নলিনী কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরুলেন। তখন সকাল হয়ে গেছে দোমোহানীর বাজারে। শিলিগুড়ির বাসটা সবে এসে নীলা কাফের সামনে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীরা নেমে প্রচণ্ড ভাবে খাচ্ছে। ভিখারীরা ছোঁক ছোঁক করছে পাশে। দেখে মন তেতো হয়ে যায় নলিনীর। পভার্টি এ্যাণ্ড প্রাইড সাইড বাই সাইড। সেকালে ম্যালেরিয়া গ্রামগুলো উজাড় করে দিয়েছিল।

একালে সেই অবস্থা যেন। কেন এমন হচ্ছে? বিদেশ থেকে এত কোটি কোটি টাকা আসছে। যাচ্ছে কোথা? সব শহরে। আর্টিফিসিয়াল প্রসপারিটি!

বাইরে বেরুলে ব্যাগে পল্লীবার্তা ডজনখানেক থাকেই। নলিনী বাসটার কাছে গিয়ে একটু ইতস্তত করছিলেন আজ। ওইসব হাত পেতে থাকা ভিখারীদের দেখে কিংবা অন্য কোনো কারণ ছিল—যা নিজেও বোঝেন না। খালি মনে হচ্ছে, তাঁকে ওরা ক্লাউন মনে করবে। এইরকম চেহারা আর কাগজ বিক্রি।

অথচ কাগজ বেরুলে ভোরবেলা এখানে এসে বাসযাত্রীদের কাগজ বিক্রি করা তাঁর কয়েক বছরের নিয়মিত কাজ। কিছু বিক্রি হয় বই কি। ইহা কি সত্য, কিংবা গম কেলেঙ্কারি গোছের জব্বর হেডিং থাকলেই হয়। এবারেরটা 'কে এই আগন্তুক'। বিক্রি হবার কথা।

কিন্তু শেষ অব্দি ভিখারীগুলোকে দেখেই খাপ্পা হয়ে গেলেন। সোজা হনহন করে চলতে থাকলেন। পেছনে কেউ বলে উঠল—কী দাদু? কাগজ বেরোয় নি? এবং খিকখিক হাসি। নলিনী অপমানিত বোধ করলেন আজ।

হেমেন নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসিয়েছে বাইরের বারান্দায়। এই সেদিন বিয়ে করেছে। এরই মধ্যে তিনটের বাবা হয়ে গেছে। বয়স আর কত হবে? তিরিশ নিশ্চয় হয় নি। নলিনীর ছাত্র ছিল। এখনও সেই হেমেনের মূর্তি দেখতে পান।

নলিনীকে আসতে দেখে হেমেন গম্ভীর মুখে আঁক নিয়ে পড়ল। রাস্তার ধারে বকুলতলায় রোদ পড়েছে। অন্ধ হিতেন বাঁড়ুযো বসে আছেন সান-বাঁধানো গোড়ায়। নলিনী তাঁর কাছেই গেলেন প্রথমে।—হিতেনদা! কেমন আছো? আমি নলিনী।

—কে? নোলে নাকি? কাগজ বেরিয়েছে বুঝি?

—বেরিয়েছে বৈকি। তোমাদের বাড়ি তো রাখে। পাও নি? গত শুক্রবার টুলুর হাতে পাঠিয়েছি।

—ও। আগের সংখ্যা? পেয়েছি। পড়েও ফেলেছি।

হিতেনবাবুর এই রকম বলা অভ্যাস। অন্ধ হয়েছেন বছর দশেক আগে। অথচ কিছুতেই বলবেন না কেউ পড়ে শুনিয়েছে। যাত্রা বা থিয়েটার হলেও তাই। বলবেন—দেখলুম। মন্দ না। তবে পোজ-পোশ্চার বড্ড আর্টিফিশিয়েল!

—কেমন লাগল দাদা?

—কোন্ আর্টিকেলটার কথা বলছ, বলো। তারপর ওপিনিয়ন দেব।

নলিনী মুখ টিপে হেসে বললেন—'কে এই আগন্তুক ?'

হিতেনবাবু হাসেন খুব কম। বললেন—ও। পড়েছি।

—ওপিনিয়ন দাও।

—হ্যাঁ হে নোলে, সেদিন শিবু কেষ্ট গয়লাকে খুব মেরেছে শুনলুম! শিবুর বড় বাড় হয়েছে, বুঝেছ ? পাগল-ছাগল মানুষ। তাকে নাকি বেজায় মেরেছে। শেষে শীতুর ছেলে—মানে সেই যে বোম্বে-ফেরত ছোকরা হে! সে গিয়ে শুনলুম শিবুকে খুব শাসিয়েছে। ইংরাজিতে।

বলে হিতেনবাবু তাঁর দুর্লভ হাসিটি হাসলেন। কিন্তু এ হাসি ক্ষণস্থায়ী। আবার মুখ সোজা করে আকাশে রেখে হাসিবিহীন নির্বিকার মুখে বললেন—শিবু বলেছে, সোজা বোম্বাই ফেরত পাঠিয়ে দেবে। চুল গোঁফ কেটে। শিবুর খুব বাড় হয়েছে।

নলিনী বললেন—'কে এই আগন্তুক'······

হিতেনবাবু হাত বাড়িয়ে নলিনীর হাত খুঁজে নিয়ে ধরে ফেললেন। তারপর চাপা গলায় বললেন—শিবের নামে দুই ছত্র লিখে দিও না ? ছোট্ট একটা আর্টিকেল। তোমাকে মেটিরিয়েল দেব। সময় করে এসো।

হিতেনবাবু অন্ধ হলেও বিস্তর হাঁড়ির খবর রাখেন, নলিনী জানেন। এক সময় তাঁর কাছেই নানা খবরের সূত্র পেয়েছেন। বললেন—একটুখানি ইসারা দাও হিতেনদা, বুঝব।

—বুঝবে না। শিবু দুলেপাড়ায়···বলে চুপ করে গেলেন হিতেনবাবু। কারা আসছে।

নলিনী খিকখিক করে হেসে বললেন—সে তো সবাই জানে!

লোকগুলো চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন হিতেনবাবু। তারপর ফিসফিস করে বললেন—মালতী দুলেনীর মধ্যম পুত্রটিকে দেখেছ ?

—না তো!

—আমি দেখেছি। ওটা শিবুর ঔরসজাত। শিবু তার নামে দশ বিঘে মাঠান জমি বেনামী করে রেখেছে। সিলিঙের বাইরে পড়েছিল। মালতীর হাজব্যাণ্ডের নামও শিবু। বোঝো ঠ্যালা!

কথা বলছেন হিতেনবাবুর সঙ্গে, কিন্তু নলিনীর চোখ হেমেনের দিকে।

হেমেনও তাঁকে দেখছে লুকিয়ে। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে আঁক কষছে। নলিনী বললেন—খোঁজ নিতে হয়।

—আমি বলছি। তুমি আর্টিকেল লেখো। লিখে দেখিও। কারেকশান করে দেব'খন।

—উঠি দাদা।

হিতেনবাবু তাঁর হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন—বসো না। যাচ্ছ কোথা? আরও আছে।

নলিনী বিরক্ত হয়ে বললেন—একটু তাড়া আছে।

—নেলো, তোমার এবারকার আর্টিকেলটা কিস্যু হয় নি!

—'কে এই আগন্তুক'?

—হ্যাঁ!…বলে হাত ছেড়ে দিয়ে অন্ধ বৃদ্ধ চোখের ঢ্যালা বের করে অন্য পাশ থেকে লাঠিটি তুলে নিলেন। দুই ঠ্যাঙের ফাঁকে ঢুকিয়ে ঠ্যাঙ দুটো দোলাতে থাকলেন।

নলিনী দমে গেছেন। হিতেনবাবুর মতামতে তাঁর আস্থা আছে। বললেন—কিচ্ছু হয় নি বলছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন? সাসপেন্স টের পান নি?

—নাঃ! কিসের সাসপেন্স হে? গুরুলিয়ার মোতিয়ুর হাজি দুবচ্ছর অন্তর হজে যেত। আর ফিরে আসত। লোকে বলত বোম্বাই হাজি। সে স্মাগলিং করত। ধরা পড়েছিল। মিসা হয়েছিল। এখনও ছাড়ে নি। ওই হ'ল স্মাগলার। তারপর ওই যে লালগোলা এরিয়া থেকে কাপড় বেচতে আসে, ওরা স্মাগলার।

ধুরন্ধর নলিনী মুখ টিপে হেসে বললেন—শীতু ঘোষের ছেলে আমাকে একটা বিলিতি কলম দিয়েছে, জানো দাদা? ন্যুটোদাকেও দিয়েছে।

হিতেনবাবু বললেন—ছেলেটা ভাল। যে সাধু ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সে কিছুদিন নিজের আশ্রমে রেখে গীতা মুখস্থ করিয়েছিল। ওতেই ওর বেস্ তৈরী হয়ে যায়। পরে আশ্রম থেকে অন্য সাধুদের অত্যাচারে পালিয়ে যায়। পথে এক মারোয়াড়ী ফ্যামিলির সঙ্গে আলাপ হয়। তারা ওকে বোম্বে নিয়ে যায়। তাদের ছেলেপুলে ছিল না। স্কুলে ভর্তি করে দেয়। তারপর এক বেঙ্গলী বিজনেসম্যান……

নলিনী উঠে দাঁড়ালেন।—চলি দাদা। পরে আসব'খন।

হিতেনবাবু বিকৃতমুখে ডাকতে থাকলেন—ইলু। মিলু। কে আছিস রে? রোদ লাগছে।

নলিনী হনহন করে এগিয়ে হেমেনের সামনে দিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ার মতো থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ঘুরে মরীয়া হয়ে হেমেনের উঁচু বারান্দা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন—হেমেন! তোমাকে একটা কাগজ দিই। তোমার সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। আমার বড্ড খারাপ লাগে। আফটার অল, তুমি আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলে। আই কাণ্ট ফরগেট ইট।

ঠিক পার্ট বলার ভঙ্গীতে কথাগুলো আওড়ে গেলেন নলিনী। যৌবনে থিয়েটারে চমৎকার পার্ট বলতেন। তাঁর সিরাজদ্দৌলা কে ভুলতে পারে? নির্মলেন্দু লাহিড়ীর দোমোহানী সংস্করণ।

হেমেন মুহূর্তে গলে জল এবং কাগজটা মাথায় ঠেকিয়ে শতরঞ্চিতে রেখেই সে লাফ দিল। পায়ের ধুলো নিল। কবি-সাহিত্যিক বোধসম্পন্ন মানুষেরা স্বভাবত আবেগপ্রবণ। দ্রুত ভাবাকুল হয়ে পড়ে। আর এ তো গুরুশিষ্যের পুনর্মিলন। হেমেন কায়েত না হলে গার্গীর সঙ্গে বিয়ে দিতেন না কি?

হেমেনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন নলিনী। চোখে জল আসতে বাধ্য। ছাড়া পেয়ে হেমেন তার ছেলেমেয়েদের উদ্দেশে ধরা গলায় বলল—রণ্টু, পিণ্টু, ঝুনু। তোমরা মাস্টারমশাইকে প্রণাম করো!

নলিনী চোখ নাচিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—ভায়ারা! কী দেখছ? তোমাদের বাবা আমার ছাত্তর।

ওরা চড়ুই পাখির মতো টুপটাপ উড়ে এসে পায়ের ধুলো নিল। হেমেন বলল—তোমরা পড়ো। আমরা ভেতরে বসি। আসুন স্যার!

নলিনী বারান্দায় উঠলেন। হেমেন বসার ঘরে ঢুকে রাতের বন্ধ জানলা খুলছে। রীতিমতো পুনর্মিলন।……

॥ সাত ॥

নোলে ভটচাযের কবলে

শৈলবালার কাছে ফটিক একটি কিংবদন্তীর নাম মাত্র। তার কাছে বাস্তব এই রতনকুমার। তাই বলে একটু-আধটু সংশয় কি ছিল না গোড়ায়? নিশ্চয় ছিল। কারণ, সত্যি বলতে কী, সে এখনও সোমত্ত মেয়ে। সেজেগুজে থাকলে বাবুবাড়ির মেয়েরা তার পাশে পেঁচী বনে যাবে। ঈষৎ পোড়খাওয়া রুগ্ন শরীর হলেও তার মুখখানিতে লাবণ্য আছে। একেবারে অচেনা এক যুবক পুরুষমানুষবিহীন এই বাড়িতে এসে উদয় হ'ল কোত্থেকে এবং পাড়াজুড়ে সাড়া পড়ে গেল, বুড়োরা এসে তার দাবি মেনে নিতে একটুও দেরি করল না—কারণ নাকি, ওই মুখে তরু গয়লানীর সুস্পষ্ট আদল এবং তাছাড়াও এই মুখ তাদের চিনতে ভুল হচ্ছে না—তখন এবং সঙ্গের জিনিসপত্র দেখেও বটে, শৈলবালা ভাসুরপোকে বরণ করতে পায়ে জল ঢেলে দিয়েছিল। পায়ে প্রণাম করলে হু-হু করে কেঁদেও ফেলেছিল। কিন্তু প্রতিটি রাত্রি এসেছে, আর শৈল ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিতে অস্থির হয়েছে।

মেজটা মেয়ে, নাম রেখেছে শিউলি। শিউলি রতনকুমারের খুব ন্যাওটা হয়ে উঠেছে। বারান্দায় দাদার সুগন্ধ নরম বিছানায় দাদার পাশে সে শুয়ে থাকে এখন। শৈল বাকি তিনটেকে নিয়ে ঘরের মধ্যে শোয়। প্রথম কয়েকটা রাত দরজা আটকে শুত। জানলাবিহীন ঘরে দম আটকে যেত। তার ওপর মশা। হাতপাখা নেড়ে নেড়ে ব্যথা করত। পরে এক রাতে সাহস করে দরজা খুলে রাখে। সে রাতটা একেবারে ঘুমোতে পারে নি। পাশে ধারালো হেঁসো রেখেছিল। একটু শব্দেই চমকে উঠছিল। কীভাবে যে রাতটা কেটে গিয়েছিল! পরের রাতে রতনকুমার ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। সে অতি বুদ্ধিমান ছেলে। সুশিক্ষিত। এবং স্পষ্টভাষীও বটে। বলেছিল—কাকিমা! এই গরমে কীভাবে ঘরে থাকো বলো তো? বারান্দায় তো যথেষ্ট স্পেস। মশারি খাটিয়ে শুলেই পারো।

শৈল মাটির দিকে তাকিয়ে বলেছিল —বরাবর অভ্যাস, বাবা। পাড়াগাঁ! কার কী মনে থাকে!

—আহা! আমি তো আছি।

—তা আছো!

—তবে ?

—ও ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা। শৈল একটু হেসে বলেছিল। পাকা বাড়ি বানাবে বলছ, বানাও। বড় বড় জানলা রেখো। আরাম করে তোমার কাকিমা ঘুমোবে।

—সে তো পরের কথা। সময় লাগবে। তুমি বাইরেই শোবে। বাচ্চা-গুলোকেও কষ্ট দেবে কেন ?

শৈল চুপ করে ছিল। পায়ের আঙুলে মাটিতে আঁচড় কাটছিল। মাথায় ভাসুরপোর সামনে সব সময় ঘোমটা টেনে রাখে।

হঠাৎ রতনকুমার ঠোঁট কামড়ে বলেছিল—আই সী ! কাকিমা, তুমি আমার মা। আমি তোমার ছেলে, কেমন ?

—হুঁ। তা, কী বাবা ?

—কেমন তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।···শৈল একটু অবাক হয়েছিল ওর গলার স্বর শুনে।

রতনকুমার হঠাৎ চাপা গর্জে বলেছিল—তোমাদের এই গেঁয়ো ব্যাপার আমি রিয়্যালি বুঝি নে কাকিমা ! একদম সমঝমে নেই আতা—আই কাণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট ! মা হয়ে ছেলের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারো না ? তুমি জানো কাকিমা, আমাকে পর জেনেও মোহনলালজী ওঁর ফ্যামিলির মধ্যে······ও ! ভ্যাটস এ লং স্টোরি। ঠিক আছে কাকিমা। আজ থেকে আমি বাইরে কোথাও শোওয়ার ব্যবস্থা করব।

শৈলর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল আর্তনাদের মতো—অতন ! ফটিক !

রতনকুমার চোখে জল নিয়ে বলেছিল—মাকে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে তোমাকে পেলুম। তুমি আমার মা। কী স্ট্রেঞ্জ সিমিলারিটি ! অবিকল সেই রকম। অলরাইট, দিস ইজ সেন্টিমেণ্টাল !

রতনকুমার বেরিয়ে গিয়েছিল। শৈল হতবাক। আবার পালিয়ে গেল নাকি ? কিছুক্ষণ পরে শিউলিকে পাঠিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে এসে বলল—দাদা হাজরার টোলে (টি স্টলে) আছে, মা ! বললে, যাচ্ছি।

তারপর থেকে শৈল নিঃসঙ্কোচে বাইরে বারান্দায় শুচ্ছে মশারি খাটিয়ে। বাড়িতে গরু থাকলে মশা খুব বেশি হয়। বিকেলে গরু দুটোকে কচি ঘাস খেতে দেয়। ঘাসের মধ্যে ঘুঁটের আগুন থাকে। ধোঁয়াটে ঘাস ভারি মুখ-রোচক। মশাও পালায়।

অনেক রাত অব্দি রতনকুমার কাকিমাকে নিজের জীবনকাহিনী শোনায়। ছেলেটা কী সব বলে—বুঝতেই পারে না শৈল। কখনও গটমট করে ইংরিজী, কখনও হিন্দি, কখনও শুদ্ধ বাংলা। ওই কটমটে বাংলাও শৈলর পক্ষে বোঝা কঠিন। শুধু আঁচ করে। সন্ন্যাসীর হাতি তাকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল, যেখানে মোটরগাড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন, সমুদ্র, আকাশছোঁয়া বাড়ি আছে। রাঙা রাঙা মানুষজন আছে। সায়েব মেমসায়েব তারা। কুকুরগুলো কী শিক্ষিত! একটা কুকুরের নাম কী যেন—মনেই থাকে না শৈলর। বলে—কী যেন নামটা বাবা, কুকুরটার? রতনকুমার উপভোগ করে। ঘোষের ডাঙায় রাত গভীরতর হয়। এত অন্ধকার তার অসহ্য লাগে। এত পোকামাকড়ের ডাক! মাথার ভেতরটা কুরে কুরে খায়। কী এই জীবন! কোয়াইট প্রিমিটিভ। অ্যানিম্যাল লাইক এভাবে গাঁয়ের মানুষ কত হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে। অন্ধ, বোবা, কালা মানুষের দল। পোকামাকড়দের মতো নড়াচড়া করে। খায়, চলাফেরা করে, ঘুমোয়। কেন ফিরে এল এখানে সে? কী শাস্তি পেতে চেয়েছিল? বোগাস!

সিগারেটের পর সিগারেট খায় সে। মৃদু আওয়াজে টেপরেকর্ডার বাজায়। মশারির গায়ে জোনাকি জ্বলে। দূরে কোথাও শেয়াল ডেকে ওঠে। ফানি!…

কিন্তু ফিরে যেতেও মন বিষিয়ে ওঠে। সেই আর্টিফিশিয়াল লাইফ। অভ্যাসে মানিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণ ঘটল। সব কুৎসিত লাগল। চলে এল। এসে অবশ্য মহতাবজীকে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু কোন ঠিকানা দেয়নি।

ফিরে এসে প্রথমে খুব উদ্দীপনা জেগেছিল। কিছু ডেভালপমেণ্ট ওয়ার্কস করবে। সোস্যাল ওয়ার্কস যাকে বলে। ঘোষের ডাঙায় অনেক কিছু করার ভাসা-ভাসা প্ল্যান মাথায় ছিল। সঙ্গে বাইশ হাজার ক্যাশ টাকা আছে। কলকাতার ব্যাঙ্কে একাউণ্ট ট্র্যান্সফার করিয়ে নিয়েছে ফেরার পথে। হাজার তিরিশের মতো ডিপজিট। বড্ড খরুচে হাত তার। বড্ড খামখেয়ালী মন। তাই যত দিন যাচ্ছে, আবার অস্থিরতা জাগছে। সব প্ল্যান অর্থহীন মনে হচ্ছে। এইসব গেঁয়ো অশিক্ষিত বোকা হুজুগে এবং স্বার্থপর মানুষ! বোগাস!

অথচ সে বুঝতে পারছে, এই মাটির সঙ্গে পুরনো ও গভীর সংযোগ কোথাও যেন ক্ষীণ হয়েও রয়ে গেছে। সব মনে পড়ে যাচ্ছে। সব স্থূল ও সূক্ষ্ম অনুভূতির স্মৃতি—কত সুখ-দুঃখের দিন এবং রাত্রি! বাবা-মা, কাকা, গরুমোষ, পাঠশালা

ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, নানা ঋতুর মাঠ, আকাশ, মেঘের বর্ণালী, সকাল-সন্ধ্যার গ্রাম, আর একটি পথ—বাঁক নিতে নিতে যাওয়া এবড়ো-খেবড়ো ছত্রখান পীচের পথ, যেখানে ধারাবাহিক ভাবে হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে আর বাজছে······

মাঝে মাঝে কাকিমাকে ভড়কে দিয়ে মজা পায় সে। কখন টেপরেকর্ডার সুইচ চুপি চুপি অন করে দেয় এবং কাকিমার আপনমনে বকবক করা অভ্যাস্ রেকর্ড হয়ে যায়। হঠাৎ কাকিমা যখন শান্ত এবং চুপচাপ, টেপরেকর্ডার জোরে বেজে ওঠে। শৈলর গলা শোনা যায়। সেই বকবকানি! শৈল লজ্জায় পড়ে যায়। ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিকুটি হয়। পাড়ার মেয়েরা চোখ বড়ো করে শোনে। তারপর তারাও আলুথালু হাসে। রতনকুমার প্রচুর এনজয় করে।......

এদিকে পুজোর ছুটিতে নাথু ঘোষের ছেলে জে এল আর ও দিবাকর এসেছে। এসে রতনকুমারের কথা শুনে অবাক হয়েছে। বিশ্বাস করতেই পারে নি। রতনকুমারকে ডেকে পাঠাল সকালে।

রতনকুমার বলল—ওঁকে আসতে বলো। আমি এখন ব্যস্ত।

শুনে দিবাকর চটে গেল। বড্ড ডাঁট দেখা যাচ্ছে! ফটিককে তার আবছা মনে পড়ে। দিবাকর শহরের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। মাঝে মাঝে বাড়ি আসত। ফটিক তার চেয়ে অনেক ছোট। সাত-আট বছরের তো বটেই। দিবাকর বলল—বাবা, ঠিক বটে তো? কীভাবে চিনলে তোমরা?

নাথু বলল—বাঃ, ই কী কথা! আমি চিনব না? সেই মুখ, সেই চোখ, নাক, কান। হুবহু এক।

দিবাকর হাসতে হাসতে বলল—কেষ্টকাকার বউ তো ছাখেনি ওকে। সে মেনে নিল?

নাথু হাই তুলে বলল—হুঁউ। অনেক টাকা এনেছে ছেলেটা।

—বুঝেছি। টাকা দেখেই ভুলে গেছে। তবে কী, জানো বাবা? বোম্বেতে জোচ্চোরের আড্ডা। কী মতলবে এসেছে, কে জানে! কেষ্টকাকার বউকে সাবধান করে দিও। গয়নাটয়না লুকিয়ে রাখে যেন।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে দিবাকর। বাজার ছাড়িয়ে শিবু চক্কোত্তির ডেয়ারিতে গিয়ে আড্ডা দেবে। প্রগতি প্রেসের সামনে চকরাবকরা জামা আর ঢোল পাতলুন পরা একটি যুবককে দেখে দিবাকরের একটু সন্দেহ হল। নোলে ভটচাযের সঙ্গে কথা বলছে। দিবাকর নমস্কার করে বলল—নমস্কার মাস্টার মশাই! কেমন আছেন?

নলিনী পা বাড়িয়ে বললেন—দিবু নাকি? কবে এলে হে?

—গতকাল সন্ধ্যায়।

যুবকটি এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বলল—দিবুদা, আমাকে চিনতে পারছেন?

দিবাকর ঘাড় নাড়ল বেশ জোরে।—না তো ভাই।

নলিনী হাসতে হাসতে বললেন—আরে কী কাণ্ড! এ সেই ফটিক! কেন, পাড়ার ছেলে—পাড়ায় আছে। দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, এ কেমন কথা? তার ওপর মিরাকিউলাস এপিসোড!

দিবাকর বলল—ও! তা কেমন করে চিনব? মনেই নেই। আচ্ছা, চলি মাস্টার মশাই।

নলিনী বললেন—ওদিকে কোথায় চললে দিবু? এস, প্রেসে এস। তোমার ডিপার্টের হালচালের কথা শুনি।

দিবাকর হাসলো—সর্বনাশ! তারপর আপনার কাগজে লিখে দিন। আমার চাকরি যাক্!

রতনকুমার আস্তে বলল—দিবুদা! সকালে আমাকে ডেকেছিলেন। সত্যি একটু ব্যস্ত ছিলুম। আমার অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।

—বেশ তো! সন্ধ্যের পর বাড়িতে যেও। ইউ আর অলয়েজ ওয়েলকাম! বলে দিবাকর চলে গেল।

নলিনী চোখ নাচিয়ে বললেন—শিবুর ফ্রেণ্ড! বুজুম ফ্রেণ্ড। বুঝলে তো? এখন গিয়ে তোমার-আমার রামার-শ্যামার নিন্দেমন্দ পরচর্চা করবে। মহা পাজী! যাক্ গে, ভেতরে এস। এভাবে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। তোমার লাইফ-স্কেচটা মোটামুটি দাঁড় করিয়েছি। পড়ে শোনাব, কোথাও ডিফেক্ট থাকলে কারেকশান করে দেবে। এস।

অনিচ্ছার ভঙ্গীতে রতনকুমার ভেতরে গেল। আজ নলিনী তাকে একেবারে পাশের ঘরে নিয়ে ঢোকালেন। গার্গী পাঁচদিন পর আজ টিউশনীতে গেছে এই ঘরটাই বাবা-মেয়ের বসবাসের ঘর। তবে বড় বড় জানলা আছে। দুপাশে দুটো ছোট তক্তপোষে বিছানা। মধ্যিখানে একটা টেবিল। বই কাগজে ভর্তি। ট্যাবলেটের শিশি, ছোটবড় কিছু কৌটো, কলম ও কালির দোয়াত, এইসব টুকিটাকি জিনিসও আছে। একটা বাল্ব ঝুলছে ওপাশের বিছানার মাথার দিকে। টেবিলে একটা টেবিল ল্যাম্প। দেয়ালের তাকে অজস্র বই, খাতা। দরজার পাশে আলনায় শাড়ি, ব্লাউজ এবং আরও জামা-কাপড়

পরিপাটি সাজানো আছে। অন্যপাশে বাক্সের স্তূপ। রঙীন কাপড়ে ঢাকা। দেয়ালে ফোটো ও ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। তক্তাপোষের তলায় এবং দেয়ালের নীচে ইতস্তত প্রচুর বইপত্র।

রতনকুমার খুঁটিয়ে দেখছিল। দোমোহানীর ঘরকন্না দেখে তার হাসি পায়। কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড নেই। রুচির ছাপ নেই। টাকা থাকা-না-থাকাটা কথা নয়। অশোকদেরও তো টাকা আছে।

একটা মোড়া টেনে নলিনী বললেন—বসি! বৈঠ্ যাও, হুঁস্নাপর! তারপর খিক খিক হাসি। আজ আমার রিল্যাক্সিং মুড। সিংরায়দের কোল্ড স্টোরেজ ফুলপেজ। মার দিয়া কেল্লা! বোসো, চা করি।

টাকা কী ভাবে যে মানুষকে বদলে দেয়! নলিনী ভুলে গেছেন, শীতু গয়লার ছেলেকে অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে খাতির করছেন। হেমেনের মাথায় বরাবর আইডিয়া খেলে। সে-ই বলেছিল, রতনকুমারকে ধরুন। নলিনী ধরে ফেলেছেন। ম্যাগাজিন শব্দটা অদ্ভুত উচ্চারণ করে রতনকুমার। কতকটা ম্যাগ্‌জিন! সে একটা সিনেমা-পেজ চেয়েছে। নিজে লিখবে। ভাল বাংলা লিখতে পারবে না। যা লিখবে, স্যার কারেকশান করে নেবেন। ফোটো থাকবে। ব্লক খরচ তার।

আসলে রতনকুমার একটা আঁকড়ে ধরার মতো জিনিস পেয়েছে। ফিল্ম লাইনের পত্র-পত্রিকার হালচাল তার জানা। এমন কি তারও ছোটখাটো ইণ্টারভিউ ছাপা হয়েছে। সেগুলো কিছু কিছু সঙ্গে আছে তার। অশোকদের দেখিয়েছে। এবার স্যারকেও দেখাবে।

নলিনী মেঝেয় বসে কুকার ধরালেন। সেই আগুনে বিড়ি ধরিয়ে তক্তাপোষে বসে বললেন—সময় বড্ড কম। তোমায় দশপাতার একটা এস্টিমেট করে দিই। ছ'পাতা টাউনে শ্রীদুর্গা প্রেসে ছাপাতে হবে। চার পাতা আমি কম্পোজ করে ছাপব। নৈলে আমার ক্রেডিট থাকে না।

রতনকুমার বলল—জাস্ট এ কোয়েশ্চান! কিছু মনে না করলে বলি স্যার!

নলিনী তাঁর বিছানার ওপাশ থেকে একটা প্যাড টেনে নিলেন এবং পকেট থেকে ডটপেন। বললেন—কিস্সু মনে করব না। কিস্সু মনে করব না। তুমি হচ্ছ গে জুয়েল! দেশের কৃতী সন্তান। মোস্ট সাকসেসফুল ম্যান!

আপনি কতদিন থেকে দাড়ি রাখছেন স্যার?

দাড়িতে হাত বুলিয়ে নলিনী ফিকফিক করে হেসে বললেন—তা প্রায় দশ-

বারো বছর হয়ে গেল বাবা। এই দাড়ি রাখার একটি হিস্‌ট্রি আছে। ভেরি ভেরি ইণ্টারেস্টিং!

রতনকুমার আগ্রহ দেখিয়ে বলল—বলুন স্যার, শুনি।

নলিনী ফুল বাগিচা এবং রাস্তার দিকের জানলায় চোখ রেখে বললেন—সরোজ সিংহরায়ের কোল্ড স্টোরেজের ফুলপেজ বিজ্ঞাপন পেয়ে আমারও ঠিক এই কথাটা মনে হচ্ছিল। এই দাড়ির সঙ্গে সরোজের সম্পর্ক আছে। বলি শোন। সরোজের বাবা জমিদারী আমলে গোমস্তাগিরি করত। কিছু জমিজমা, পুকুর, বাগান হাতিয়ে নিয়েছিল। সরোজ ম্যাট্রিক পাশ করে বেকার হয়ে আছে তখন। তারপর ব্লক আপিস হল। সরোজ ব্লকের নানান ব্যাপারে দালালী করে। মানে, লোকের দরখাস্ত লিখে দেয়। তা নিয়ে নিজেও তদ্বির করে। বিডিও'র পেছন পেছন ঘোরে। আশপাশের গাঁয়ের লোকেরাও ড্রাইডোল, টেস্ট রিলিফ হেন-তেন সব ব্যাপারে সরোজকে সাধে। সরোজ বাবার নামে ড্রাইডোলের ডিলারশিপ নিল। নিজে হল টেস্ট রিলিফে পে-মাস্টার। দেশে তখন অঢেল মারকিন গম আসছে। হিউজ গমের স্টক সরোজদের ঘরে ঢোকে। ডিলার যে!

নলিনী একটু দম নিয়ে ফের শুরু করলেন—ব্লকের ওভারশিয়ার টেস্ট রিলিফের মাটি কতটা রোজ কাটা হল, তার জরীপ করে সার্টিফিকেট দেবে। সেই পরিমাণে গম স্যাংশন হবে। ওভারশিয়ার ওই মাঠ ঘুরে গিয়ে সরোজদের বাড়ি ঢোকে। যেন মাটি কাটার জায়গায় গিয়ে বাবু জরীপ করে এলেন। আসলে কচু খান বুঝেছ?

রতনকুমার না বুঝেও মাথা দোলাল।

নলিনী গলা চেপে বললেন—ওই ঘরে বসেই জরীপ করেন ভদ্রলোক। ধরো, পঞ্চাশ হাজার ঘন ফুট মাটি কাটা হয়েছে—বাঁধ হচ্ছে নদীর ধারে। উনি সার্টিফিকেট দিলেন এক লক্ষ ঘন ফুটের। মানেটা বুঝলে?

—হয়!

নলিনী খ্যাঁক করে হেসে বললে—পাওনা, সবটা সরোজ মেরে দিল, সেই গম পাওনা, যতটা সরোজ মেরে দিল, সেই গম রাতদুপুরে ট্রাকে বোঝাই হয়। চালান যায় বাইরে। সরোজ দিনে দিনে লাল হয়। তো একদিন অনেকটা রাতে টাউন থেকে লাস্ট বাসে ফিরছি, বাজারের স্টপে নেমে দেখি পুলিশ ট্রাক আটকেছে। সরোজও আছে। এস আই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম, কী

ব্যাপার ? ওরে বাবা ! গোখরো সাপের মতো ফনা তুলে ছোবল মারতে এল ! —কেন মশাই ! পুলিশ ট্রাক আটকেছে। সরোজও আছে। আমি এখানে ? চলে যান। আমি ভীষণ ইনসাল্টেড ফিল করলুম। দেশে আমার মানসম্মান আছে। আড়ালে গিয়ে ওঁত পেতে রইলুম। দেখি—তুমি কত অনেস্ট সাধু মহাত্মা। একটু পরে ব্যস ! ট্রাক বোঁও বেরিয়ে গেল।

—আই সী !

নলিনী হাতে মৃদু তালি বাজিয়ে বললেন—এ সিঙ্গল ইন্সট্যান্স ! এরকম ঘটনা দিনের পর দিন ঘটতে থাকল, কল্পনা করা যায় না। ড্রাইভোলের মাস্টার-রোলে শয়ে শয়ে ভুয়ো নাম। ছুলেপাড়ার কানাই বলত—সব টিপছাপ নাকি সেই ছায়। হাতপায়ের বিশটে আঙুলে কালির ছোপ। সরোজ সাবান কিনে দেয়। দীঘির ঘাটে কালি পরিষ্কার করে কানাই। বাবা রতনকুমার ! যেদিন থেকে জাহাজবোঝাই হয়ে মারকিন গম ভারতে এসেছে এবং পাড়াগাঁয়ে পাঠানো হয়েছে, সেদিন থেকে গাঁয়ের লোকের রক্তে কোরাপশানের ভাইরাস ঢুকেছে। আগে যে এ রোগ অল্পস্বল্প ছিল না তা নয়। কিন্তু এমন সংক্রামক ছিল না তা। লোকের মনে ধর্মভয় বলো ধর্মভয়, বোকামি বলো বোকামি, অনভিজ্ঞতা বলো তো তাই—ছিল। কিন্তু মারকিন গম গাঁয়ের লোকের হাড়ের মধ্যে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিল। চক্ষুলজ্জা রইল না। বিবেকবোধ পচে গেল, চতুর কূটবুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেরা আগে মামলা-মোকদ্দমার দালালী করত। দু-চার পয়সা লুঠত। এবার তারা অন্য লাইন পেল। নতুন দালালে পাড়াগাঁ গিজগিজ করতে লাগল। দেশের সত্যিকার ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয়, মারকিন গম চ্যাপ্টার হওয়া উচিত তার একটা ইমপরট্যাণ্ট পার্ট। চোখের সামনে সব দেখেছি। রাগে ছট্‌ফট করেছি। টাউনের কাগজওয়ালাদের ধরাধরি করেছি। লিখুন মশাই। ফাঁস করে দিন, মেটিরিয়াল আমি দিচ্ছি। কিন্তু পরে টের পাই, সেখানেও দলীয় স্বার্থ।

রতনকুমার নড়ে বসে বলল—এ লং স্টোরি ইনডিড।

—এ লং স্টোরি ! নলিনী প্রতিধ্বনি করলেন।—যাই হোক, একটা কাগজে অনেক চেষ্টার পর বেনামে একটা চিঠি ছাপল ; দোমোহানী ব্লকে দুর্নীতি। তার কদিন পরে বাজারে গেছি, আমার ওপর হামলা হল। গিরিজা নামে এক গুণ্ডা আছে, শুনেছ কি ?

রতনকুমার ভুরু কুঁচকে বলল—হুঁয়া !

—আমার মাথা ফাটিয়ে দিল। এই দেখ, দাগ আছে। নলিনী কাঁচাপাকা চুল সরিয়ে ক্ষতচিহ্ন দেখালেন। আর এই দেখ, চোয়ালে ইট মেরেছিল। বলে দাড়ির ফাঁকে আঙুল গুঁজে দিলেন। মাসটাক চোয়াল নাড়াতে পারি নি। লিকুইড খেতুম। ঘা হয়েছিল। দাড়ি কাটা যায় না। ফলে দাড়ি গজিয়ে গেল। এবং ছাটস দা বিগিনিং। সেই দাড়ি।

রতনকুমার জিভে চুকচুক করে একটু হাসল।—ফানি!

নলিনী তীব্রস্বরে বললেন—দাড়ি কাটতে গিয়ে কাটলুম না। প্রতিজ্ঞা করলুম, নিজে কাগজ করব। দুর্নীতি ফাঁস করব। গ্রামবাংলার প্রকৃত প্রব্লেম দেশের চিন্তাশীল মানুষের সামনে তুলে ধরব।

রতনকুমার হাসতে হাসতে যোগ করল—তারপর দাড়ি কাটব।

—নো। সার্টেনলি নট। নলিনী আঙুল তুলে বললেন। যদ্দিন না একটা রেভেলিউশন আনতে পারছি, তদ্দিন এ দাড়ি রইল—ছাট ওয়াজ দা প্রমিজ।

—টেরিফিক।

নলিনী আরও সিরিয়াস হয়ে একটু ঝুঁকে চোখের তারা ওপরদিকে সেকেলে ভিলেন চরিত্রের মতো ঠেলে তুলে বললেন—রেভেলিউশন, নট এ জোক ইয়ংম্যান।

—ইয়া!

নলিনীর চোখ ঘুরে কুকারের ওপর দৃষ্টি পড়তেই উঠে পড়লেন। জল ফুটছে কেটলিতে। হাঁটু ভাঁজ করে বসে চায়ের কৌটো খুলতে খুলতে বললেন—আমার রেভেলিউশন থিওরি আলাদা। ক্রমশ তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

গার্গী গেটের কাছে আসতেই যেন ষষ্ঠেন্দ্রিয় মারফৎ কী এক বোধে আক্রান্ত হল। এ দিনাবসানকাল বড় গম্ভীর, বায়ু-প্রবাহবিহীন। মিষ্টি কী একটা গন্ধ। অতি সূক্ষ্ম তার সন্তর্পণ বিস্তৃতি। সে ফুলগুলোর দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টে তাকাল। দোপাটি গাঁদা জবা সন্ধ্যামণি এর উৎস নয়। কয়েক গুচ্ছ রজনীগন্ধা আছে। কিন্তু এখনও তাদের সময় হয়নি এবং এ গন্ধ তাদের নয়। গেট বন্ধ করে যত পা বাড়ায় তত বাড়ে সেই রোমাঞ্চস্রাবী আফ্রিকান যাদুবিদ্যা ভুডুর কুহক। মধু বড়ালের বউ মাঝে মাঝে একটা সেণ্ট ছড়ায়। জিগ্যেস করলে বলেছিল ভুডু। (মধু বড়ালের আধুনিকতার কথা আগেই বলিয়াছি।) বউটি শহরের মেয়ে। স্কুল ফাইনাল পাশ। মধু বড়াল বি-এ প্লাকড এবং তার কাছে শুনে তার এই বউটি অনায়াসে নিষ্পাপ মুখে বলেছিল—সেক্সি গন্ধ! গার্গী ভেবেছিল, এ যেন অন্ধকারে সাপ ছোঁয়ার মতো।

বারান্দায় উঠে ভেতরে বাবার গলা শোনে সে এবং ক্রমশ মনে হয়, গন্ধটা তার খুব চেনা। চৌকাঠের ওপারে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় এ গন্ধ কার এবং বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

ভেতরের দরজায় গিয়ে সে শান্ত হাসল। কতক্ষণ? রতনকুমারও হাসল।

নলিনী দ্রুত বললেন—চুপ! আমাদের ভেরি ভেরি প্রাইভেট এ্যাণ্ড কনফিডেন্সিয়াল ডিসকাসন হচ্ছে। রুদ্ধদ্বার কক্ষের বৈঠকে এসেছ, পিনড্রপ সাইলেন্স মেইনটেইন করো। চা খাও। তারপর রতনকুমারের দিকে ঘুরে চোখ নাচিয়ে বললেন—আমি কত হিসেবী দেখছ? ঠিক তিন কাপ কাঁটায় কাঁটায়। মাই সাবকনশাস টোল্ড, সি শী ইজ কামিং।

রতনকুমারের সংস্পর্শে নলিনীর ইংরেজিটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। রতনকুমার সব সময় বড্ড ফর্মাল আদব-কায়দাদুরস্ত। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমরা বাইরে গিয়ে বসি স্যার। উনি ড্রেস চেঞ্জ করবেন।

গার্গী বলল—না, না। বসুন। আমার অসুবিধে হবে না।

সে আলনা থেকে সাড়ি নিয়ে বাড়ির উঠোনের দিকের বারান্দায় গেল। রতনকুমার বসল। নলিনী মেয়ের চা প্লেট ঢাকা দিয়ে রেখে বললেন—ব্লকের খরচ ভীষণ বেড়ে গেছে। মিনিমাম পঁচিশ পার ব্লক। তবে ছাপানো ছবি থেকে কেমন আসবে কে জানে!

রতনকুমার বলল—আমার কাছে স্যুটিংয়ের সময়কার তোলা স্টিলও আছে। আনব।

নলিনী চায়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ আওয়াজ তুলে কাপের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে বললেন—এ্যাকটিং ছাড়লে কেন? ফাইন আর্ট। আমিও একসময় এ্যাকটিং করতুম।

রতনকুমার সলজ্জ হেসে বলল—একটু একটু মনে আছে স্যার। বারোয়ারিতলায় না? কী যেন ড্রামা ছিল!

নলিনী আন্দাজে বললেন—পথের শেষে। সোস্যাল ড্রামা। যোগেশ করেছিলুম। ভিলেন রোল।

রতনকুমার বলল—হাউ ফানি! আমিও ফিল্মে যে দু' চারটে রোল করেছি, ভিলেন বলতে পারেন।

—দেন উই আর টু ভিলেনস। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

গার্গী ঘরে ঢুকে শান্ত ও ঈষৎ আড়ষ্ট ভাবে তার বিছানায় বসল। ঘরে কড়া

সুগন্ধ ! নলিনী তার চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন। গার্গী নিঃশব্দে চুমুক দিল। রতনকুমার একবার তাকে দেখে নিয়ে বলল—টিউশনীতে গিয়েছিলেন ?

—হঁ্যা।

—আপনাকে···আই মিন, আর ইউ ফিলিং আনইজি ?

—না তো ! কেন ?

নলিনী বললেন—তুমি ফিল্ম ছাড়লে কেন ? মজার ব্যাপার শোন। মাঝে মাঝে এই এলাকা থেকে চাষীভূষো গেরস্থবাড়ির ছেলেরা টাকাকড়ি চুরি করে বোম্বে পালায়—ডজনস অফ কেসেস। আমাদের দোমোহানীর তারকের ছেলে সুশান্ত পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছিল। বোম্বাই মেলের জন্যে হাওড়া স্টেশনে বসে আছে, তারক হাজির। ধরে নিয়ে এল।

রতনকুমার বাঁকা মুখে বলল—ক্রুড আর ফোরটোয়েন্টি কারবার ফিল্ম লাইনে। ঘেন্না ধরে গেছে।

এইভাবে কথাবার্তা হতে থাকল। নলিনী আড়চোখে প্যাড আর কলম দেখছেন। মোদ্দা কথাটা তুলতে হয়। গার্গী চুপচাপ চা খাচ্ছে। চোখ রাস্তার দিকে।

একটু পরে সে উঠল। উঠোনের দিকে বেরিয়ে গেল। নলিনী সুযোগ পেয়ে বললেন—এস্টিমেটটা।

রতনকুমার বলল—অ্যাপ্রক্সিমেট এ্যামাউণ্ট বললেই হবে। আই মিন, হাউ মাচ টু পে !

নলিনী হুম করে বলে ফেললেন—তা ধরো পাঁচশোর কমে নয়। পেপারের দাম বেড়েছে। প্রিন্টিং কস্ট বেড়েছে। তার উপর লোকের খরচ আছে। ফিল্ম পেজে তোমার নাম তো থাকছেই। পরিচালক : রতনকুমার। ব্র্যাকেটে বোম্বে ফিল্ম লেখা থাকবে। তবে কি জানো বাবা ? এই ব্যাপারটা আমি এ্যাদ্দিন ওভারলুক করতুম। সব কাগজে ফিল্ম পেজ আজকাল থাকে। যখন যা লোকে চায়, দেওয়া তো উচিতই। তবে···অবশ্য...

রতনকুমার এক কথায় বলল—ফাইভ হাণ্ড্রেড তো ?

—হ্যাঁ ! ওর কমে হবে না। স্পেশাল ইস্যু।

—আমি এক্ষুনি আপনাকে টাকা এনে দিচ্ছি।

—ম্যাগাজিনগুলো আনতে ভুলো না যেন !

—ইয়া ! বলে রতনকুমার বেরিয়ে গেল।

নলিনী উত্তেজনা চেপে বললেন—গাগু! কাপড়গুলো নে। ও গাগু!

গার্গী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। দরজায় এসে বলল—রতনবাবুর কাছে টাকা নিচ্ছ?

নলিনী ফিক করে হেসে বললেন—লোন নাকি? ডোনেশান। ছোকরা বিস্তর টাকা এনেছে। সৎ কাজে খরচ করুক কিছু! কী বলিস?

—কেন ওঁর কাছে টাকা নিচ্ছ?

নলিনী খচে গেলেন—বাজে বকিসনে, বাজে বকবিনে গাগু। মরাল কজে টাকা নিচ্ছি। গাড়ি-বাড়ি করব বলে নিচ্ছিনে। আমি না নিলে অন্যেরা নেবে। যতই বিদ্বান হোক আর বোম্বে ঘুরুক—রক্ত যাবে কোথায়? ষাট বছরেও নাবালক কি এমনি বলে? দেখবি, সব টাকা নেপোয় লুটে নেবে। আবার ওকে দোমোহানী থেকে সুড়্‌সুড়্‌ করে কেটে পড়তেই হবে। আমাকে শেখাতে আসিস নে। আমি মাল চিনি নে? কোন বিগ বিজনেসম্যানকে ভরকি দিয়ে মালকড়ি বাগিয়ে পালিয়ে এসেছে। আবার···

নলিনীর এই কনট্রাডিকটরি বক্তৃতাকে থামিয়ে দিয়ে গার্গী বলল—কিছুতেই টাকা নিতে পারবে না তুমি।

—গাগু! নলিনী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন।

গার্গী ফুঁসে বলল—না। ওঁর টাকা নেবে, আর আমাকে এসে ওই ছোটলোক মেয়েটা অপমান করে যাবে। বাঃ!

নলিনী হাঁক ছেড়ে বললেন—তাই বল্। তবে শৈলকে ও বলবে না নিশ্চয়।

—বলবে না! কিন্তু দোমোহানীতে কোন্ কথাটা রটাতে দেরি হয়? তোমার কাগজে রতনবাবুর নাম ছাপা হবে বললে। ছবি ছাপা হবে, আর ভাবছ, কিচ্ছু টের পাবে না কেউ?

নলিনী একটু দমে গেলেন। তারপর বললেন—ছোকরাকে বলে দিলেই হবে, ওর কাকী যেন ঝগড়া করতে না আসে।

গার্গী কাপগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল উঠোনে। আপন মনে বলল—বরাবর সেধে লোকের সঙ্গে ঝামেলা করতে যাবে। কোনো লাভ নেই, কিচ্ছু হবে না—তবু খালি পেছনে লাগা। আর যত ঠ্যালা সামলাতে হবে আমাকে। কবে দেখবে, আমি ওই ছাইপাশ প্রেসে না আগুন ধরিয়ে দিই।

গার্গীর চোখ ফেটে জল এসেছে। কাপগুলো কুয়োতলায় ধুতে ধুতে

হাঁটুতে চোখ ঘষে জল মুছল। নলিনী তখন প্রেসঘরে। তারপর চঞ্চল পায়ে বাইরে গেছেন। নীচের লন মতো একফালি জায়গায় গেট অব্দি যাতায়াত করছেন। মুখে বিড়ি।

ঘোষের ডাঙা রাস্তার ওপারে। বড় বড় তেঁতুলগাছ আছে। তালগাছ আছে। ইতিমধ্যে সবটা ঝাপসা হয়েছে। ধোঁয়া আর কুয়াশা আর পাখ-পাখালির ডাক আর সন্ধ্যার রঙ হিজিবিজি হয়ে আছে ওদিকটায়। ডাইনে-বাঁয়ে প্রলম্বিত হাই-ওয়েতে বৈদ্যুতিক ঝিলিক খেলছে। বাজারে আলো ঝলমল করছে। চাপা ভনভন আওয়াজ। কী হবে কী হবে এমন এক সন্ধিকাল। নলিনীর দাড়িতে নিঃসঙ্গ জোনাকি এসে আটকে গেল।

মিনিট পাঁচেক লাগে হাঁটতে। রতনকুমার লম্বা পায়ে হাঁটতে পারে। শৈলবালার বাড়িতে নতুন কেনা ঝকঝকে হেরিকেনের আলো ছড়াচ্ছে। রান্না-ঘরের উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছে সে। রতনকুমার বাড়ি ঢুকছে দেখে একটু হেসে বলল—তোমার ক্ষ্যাপা কাকা ছোটমামার বাড়িতে আছে। রিদে দফরপুর গিয়েছিল। দেখে এসেছে। বললে, ওখানে ভালই আছে। শ্বশুরের হুঁকোয় জামাই তামুক টানছে।

রতনকুমার বারান্দায় তার বিছানার পাশ থেকে টর্চ নিয়ে বলল—কাকিমা! চাবিটা দাও।

ঘরে রতনকুমারের জিনিসপত্র আছে। তাই তালা দিতে ভোলে না শৈল। শিউলিকে আঁচল থেকে খুলে চাবি দিয়ে পাঠাল। রতনকুমার ঘরে ঢুকল। শৈল মেয়েকে ইশারায় ধমকাল—ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? ঘুঁটে দে খানকতক। শিউলি চলে গেল মায়ের কাছে।

রতনকুমার বিরাট স্যুটকেসটা খুলে কাপড়-চোপড়ের তলা থেকে গুনে পাঁচটা একশো টাকার নোট নিল। বেরিয়ে এসে বলল—আমি আসছি কাকিমা।

—তোমার ক্ষ্যাপা কাকার কথা শুনলে না?

—শুনলাম তো। পরে কথা বলব।···বলে রতনকুমার টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল।······

॥ আট ॥

রতনকুমারের অন্তর্দ্বন্দ্ব

রতনকুমারের প্রতি দোমোহানী ঘোষের ডাঙার অসংখ্য লোক যে সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকায়, সেটা সে বোঝে। তাই জীবনে যেটুকু সাফল্য সে ছুঁয়ে এসেছে, তার প্রমাণ যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করছে। তার চেহারা, পোষাক-আশাক, সঙ্গের জিনিসপত্র, আর্থিক সামর্থ্য, কিছু হিন্দি ও ইংরেজি পত্রিকা এবং কোটো এসব তার সাক্ষ্য-প্রমাণ। এসবের জোরে সে বুক ফুলিয়ে হাঁটতে চায় এখানে। এও বুঝতে পারে, বেশ খানিকটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কেনই বা নিজের ছোঁয়া সাফল্য এবং কৃতিত্বকে এই গেঁয়ো আধাশহুরে আধা-শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের কাছে জাহির করতে চাইছে? মনে সে-প্রশ্ন বার-বার ওঠে। সে ভাবে, তার চেয়ে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে থাকলেই বরং ভাল হত। নজর কাড়ত না কারুর।

কিন্তু এখানেই তার একটা জটিল সমস্যা আছে। তার জীবনের স্বাভা-বিকতাটাই যে সে এখানে খুইয়ে বসেছে কবে থেকে। সতের বছর আগে সে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল, আর বাড়ি ফেরে নি এবং সতের বছর পরে সে ফিরে এল—এ-দুটো ঘটনায় মোটেও কোন স্বাভাবিকতা নেই। তাই এই মিলিত ও বিরাট অস্বাভাবিকতাকে সামলাতে তার এত আয়োজন।

তবু এত কিছু করেও সে টের পায়, খুব কম লোকই তার স্বাভাবিকতা মেনে দেবে। নোলে ভটচাযকে টাকা দিয়েছে পাঁচশো। পল্লীবার্তার শারদীয় সংখ্যা ঘটা করে বেরুচ্ছে তার ফিল্মের ছবি সমেত। এও একটা মরীয়া চেষ্টা। গোদের ওপর বিষফোঁড়া গজাতেও পারে। গার্গীর প্রতি তার অলীক লোচ্চামির গুজব ছড়াতে পারে। সে পাঁচশো টাকা এভাবে জেনেশুনে জলে ফেলছে দেখে লোকের চোখ কেনই বা ছানাবড়া হবে না? এভাবে টাকা ওড়ায় কে? মাথার ঘাম পয়ে ফেলে যাকে রোজগার করতে হয় না, যার বেলাইনে টাকা আসে—সে। রতনকুমার টাকার পাহাড় দেখে এসেছে। কিন্তু দোমো-হানী ঘোষের ডাঙায় মাত্র একটা টাকার বড় বেশি দাম! লোকের দোষ নেই।

এসব রতনকুমারের আত্মসমালোচনা। এখানে পয়সাওয়ালারাও একবেলা বাজার করে তিনদিন চালিয়ে নেয়। এটাই রেওয়াজ। রতনকুমার রোজ বাজার করে। সেরা মাছটি সে-ই কেনে। প্রচুর ফলপাকড়ও কেনে। যে-যা

দর হাঁকে তাই দেয়। তার অবস্থা সায়েব টুরিস্টের মতো। রিকশোয় চাপলে ডবল ভাড়া হাঁকে রিকশোওয়ালা। মুরগীর দাম তিনগুণ চায় মুরগীওলা। অবহেলায় কেনে সে। শৈলবালার অস্বস্তির কথা সে আঁচ করেছিল বলে মুরগী বাইরে কাটিয়ে নিয়ে যায়। ক্রমশঃ শৈলর সয়ে গেছে। তবে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চায়। ঘোষের ডাঙায় মুরগী খাওয়ার প্রচলন এখনও তেমন হয়নি। কদাচিৎ দু-একটা বাড়ি। দিবাকর এলে তো তার বাঁধা। এখানে মুরগী নাকি বেজায় সস্তা।

এভাবে কেনাকাটা বা পয়সা খরচের ফলেও রতনকুমারের বিরুদ্ধে চাপা ঈর্ষার আক্রোশ ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠেছে। হঠাৎ তার আবির্ভাবে যে সাড়া এবং অভিনন্দন কুলুকুলু বয়ে গিয়েছিল, এখন শুকিয়ে গেছে দিনে দিনে। লোকেরা বলাবলি করে, আর কয়েকটা দিন মাত্র। তারপর বাছাধন লক্কা পায়রা মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে যথারীতি বিলে মোষ চরাতে যাবে।

রতনকুমারের সাঙ্গোপাঙ্গরাও অবাক হয় তার খরচের বহর দেখে। গোবিন্দ দত্তের ছেলে অশোকও খরুচে। কিন্তু তার বাবার অঢেল টাকা। ভাল ব্যবসা আছে। রতনকুমারের কী আছে? এসব ছেলেছোকরা প্রথমে তার স্টাইল দেখে মজে গিয়েছিল। পরে ফিল্ম সেন্ট মজে যাওয়ায় তুফান তুলেছিল। মাথায় প্রশ্ন কুবকুব করেছে ডোবার ব্যাঙের মতো। সব ফেলে চলে এল কেন রতনকুমার? ফিরে যাবার কথা তুললে সে জোরে মাথা দোলায়। ঘেন্না ধরে গেছে ইয়ার! উ বাত ছোড়ো। সব শালা ফোরটোয়েন্টির আড্ডা। আমার তো সুন্দরী বউ ছিল না। থাকলে হারামী ডাইরেক্টার আমাকে হিরো বানিয়ে ছাড়ত। ইভ্‌ন নো গার্লফ্রেণ্ড টু অফার। তুমলোগ পুছেগা কাঁইয়ে কিঁউ রতনকুমার? তুম ইতনা সুন্দর হো। ইতনা বড়িয়া ঔর আচ্ছা লড়কা হো, লেকিন কাহে তুমহারা একোভি গার্লফ্রেণ্ড নেই মিলা? আরে ইয়ার! সবহি লড়কী বিলকল প্রস বন গেয়ী না? জাস্ট আঁখোকা পর নজর রাখো (নিজের চোখের দিকে তর্জনী তুলে), ব্যস! ইউ উইল আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। ঝুটা মোতি জল রহী বরাবর—বরাবর! ......

রতনকুমারের এই ইয়ার-লোভন এবং ফিল্মের গন্ধমাখা ডায়লগ ওরা হাঁ করে গেলে। কিছু মর্ম বোঝে, বেশিটাই বোঝে না। এই অনবদ্য ডায়ালগ ওরা জনান্তিকে মুখস্থ করতে ছাড়ে না।

কিন্তু ক্রমশঃ এতদিনে রতনকুমার বুঝতে পারছে, সে আসলে একটা উৎকট

হীনমন্যতায় ভুগছে। সে ঘোষের ডাঙার শীতু ঘোষের ছেলে। এটা এখানে ফিরে আসা মাত্র প্রচণ্ড হয়ে তাকে ধাক্কা মেরেছিল। তাই কাকার ওই ঘর-সংসার, জীবনযাত্রা এবং আদিম পরিবেশ তার চোখে কুচোর মত আটকে গিয়েছিল। আর রাজ্যের লোক বলে উঠেছিল—এ সেই ফটিক! এ সেই ফটিক!···হ্যাগো, তুমি সেই ফটিক না?···উরে ব্বাস! সেই ফটিকচরণ কী হয়েছে গো!

এখন মনে হচ্ছে, কেন ওকে তারা মেনে নিল ফটিক বলে? কেন সে নিজের কীর্তিকলাপ বলে বেড়াল যাকে-তাকে? বড্ড ভুল হয়ে গেছে, ভীষণ ভুল করে ফেলেছে। তার চেয়ে এই মাটির শান্তির মায়ায় সে যখন ছুটে এসেছে এতকাল পরে, নতুন লোক হয়েই উঠতে পারত একটা ঘরভাড়া নিয়ে। বাইরের লোকেরাও তো এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে জুটেছে! রাস্তার ধারে কোথাও এতটুকু জমি পোড়ো থাকছে না। কোথাও নতুন বাড়িঘর তৈরী হচ্ছে, কোথাও হয়ে গেছে, কোথাও বা শীগ্‌গির হয়ে যাবে—তার আয়োজন চলেছে। সেও অচেনা আগন্তুক হিসেবে একটুকরো জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়ি করে নিতে পারত। কেউ কি তাকে চিনতে পারত? মনে হয় না।

তাও যদি বা হিসেবের ভুল করে হোক, কিংবা প্রাণের টানে হোক সে ঘোষের ডাঙায় দৌড়ে এল—এসেই পড়ল হা-হা-করা শূন্যতার মধ্যিখানে। ভেবেছিল গেঁয়ো দুঃখিনী মা এবং আপনভোলা দুঃখী বাবাকে তাক লাগিয়ে দেবে—চিৎকার করে ডাকবে—মা! বাবা! আমি ফিরে এসেছি। আই হ্যাভ কাম ব্যাক এ্যাটলাস্ট! হাম আ গেয়া! মাগার ঠাহার কারকে দেখো তো, হাম কৌন হো? পছানতী হো মা?··· কত সব ডায়লগ তৈরী করেছিল মনে মনে।

কিন্তু সব বিলকুল বরবাদ। রিয়েল লাইফ ড্রামা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছতে পারল না। কিছু জমল না। হামবাগ! ফুল! বুদ্ধু কাঁহেকা! আব কিস লিয়ে ঘুমরাহা হৈঁয়াপর? ক্যা ঢঁড় রাহা তুম?···

বড় স্যুটকেসের তলায় টাকাগুলোর পাশেই দুটো খাঁটি এবং স্মাগলড্ স্কচ হুইস্কির বোতল লুকোনো আছে। এখানে ফেরা অব্দি ওদিকে মন ছিল না। আসলে কী এক শুদ্ধতা বা পবিত্রতা তাকে ঘিরে রেখেছিল। মাঝে মাঝে ভেবেছে, আর ওসব ছোঁবে না। সে তো এখন এক বদলে-যাওয়া মানুষ। আভি তেরা জমানা ভি বদল গেয়া দোস্ত! ইউ আর কোয়াইট এ

নিউ ম্যান। ডোণ্ট টাচ দা থিং! অফার সামবডি এলস—হি মে বি ইওর ফ্রেণ্ড অর এনিমি। শিবু চক্কোত্তিকে দেবে? নাকি থানার অফিসার ইনচার্জ নীলমণি সমাদ্দারকে? রিয়েলি হি ইজ এ জেণ্টলম্যান। হি জাস্ট কেম এ্যাণ্ড এনকোয়ার্ড এ্যাণ্ড লাফড এ্যাণ্ড ওয়েণ্ট এ্যাওয়ে।···

তারপর এক সন্ধ্যায় রতনকুমার একটা হুইস্কি কাগজের মোড়ক নিয়ে বেরুল। হাজরার চায়ের দোকান থেকে অশোক, মন্থু, তাপস ও বিদ্যুৎ এই চার ইয়ারকে ডেকে নিয়ে গেল। হাইওয়ে দিয়ে চলতে থাকল। এক মাইল দূরে নদীর ব্রীজে পৌঁছে ব্যাপারটা ফাঁস করল। একদিন ওরা বলছিল—আপনি নিশ্চয় ড্রিঙ্ক করেন রতনদা? সে বলেছিল—করতুম। এখন করি না। আজ সবাইকে চমকে দিয়ে বলল—খাঁটি স্কচ। স্মাগলড। লেট আস এনজয়।

কৃষ্ণপক্ষ চলেছে। একটুকরো চাঁদ শেষরাতে ওঠার কথা। এখন ঘন অন্ধকার। শিশিরে ভিজে যাচ্ছে একটা ছটফটে উত্তাল রাত। দুদিন বাদে মহালয়া। একটু-আধটুতেই চনমনিয়ে উঠেছে অশোকরা। বকবক করছে। রতনকুমার গুম হয়ে থাচ্ছে। দৃষ্টি অন্ধকার নদীতে। নদীতে ছলছলাৎ চাপা শব্দ। আকাশভরা নক্ষত্র। তাপসের ইলেকট্রিক গিটার আছে। ফাংশন হলে বাজায়। অশোক গাইতে পারে। বিদ্যুৎ বাজায় বাঁশের বাঁশি। মন্থু তবলা ড্রাম তাসায় এক্সপার্ট। ও রতনদা! আমরা একটা অর্কেস্ট্রা দল খুলি আসুন।

রতনকুমার বলল—জরুর।

অশোক গুনগুন করে বলল—রতনদা! সেই গানটা হোক না প্লীজ! একবার মুঝে···

রতন হাঁটু মুড়ে বসেছে। আঙুলে চুটকি বাজিয়ে তক্ষুনি শুরু করল। খাসা গায় সে। নাচতেও পটু। কী না পারে? ফিল্মে নামার জন্যে কত কিছু শিখতে হয়েছিল। ঘোড়ায় চড়া, সোর্ড ফাইট, সাঁতার। ডায়েট কণ্ট্রোল করত। যোগব্যায়াম করত। হিন্দী ফিল্মে হিরো হওয়া সহজ নয়।

গান শেষ হলে হাততালি। মন্থু বলল—এ্যাই! দারোগায় ধরব। ফাড়িস ক্যান? সে পূর্ববঙ্গের ছেলে। তার বাবা পান বেচে বেড়ায়। সে ইলেকট্রিক সাবস্টেশনে চাকরি পেয়ে ধোপদুরস্ত ঘোরে। আবার কাপে কাপে চুমুক। হাজরার কাছ থেকে কেটলি ভরা জল আর পাঁচটা কাপ এনেছে। এও ছেলেছোকরাদের ট্রাডিশন। পুজোয় তাসাবাদ্য আর নাঃ, নাচবে কে, যদি না মাল খায়? এ তো লুকোছাপা ব্যাপার নয়। যুগের হাওয়া। গিরিজার

দল তো দু-কান কাটা। মাল খাওয়াটা বিসর্জনের মিছিলের মধ্যেই চলতে থাকে তাদের ক্ষেত্রে। গিরিজা অবশ্য মোটর সাইকেলেই যায় মাঝখান দিয়ে। দুধারে বাচ্চা মেয়েরা পোষাক পরে বাঁশের বাঁশিতে পিঁপিঁ করে। গিরিজার ঠ্যাঙ মাটি ছোঁওয়া হলে হাতের মুঠোয় বোতল আকাশ থেকে মাল ঝরায়। গিরিজা হাঁ করে থাকে। তারপর ফোঁস করে গোঁফ মোছে। কী ভয়ঙ্কর লাগে ওর চেহারা!

এইসব স্থানীয় মাল খাওয়ার অকেশান বা মওকা নিয়ে কথা চলতে চলতে নেশার ঘোরে বিদ্যুৎ উঠে নাচ জুড়ে দিল! মন্টু মুখে তবলার বোল তুলল। তারপর রতনকুমার গ্যাভিটি এবং স্ট্যাটাস বিস্মৃত হয়ে ভিলেনের অট্টহাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। ওরা চেঁচাল—গব্বর সিং, গব্বর সিং!

রতনকুমার বলল—আরে! আমজাদ খান তো মেরা দোস্ত থা!

তারপর কোমর দুলিয়ে নাচ। দা ফানি ডান্স! মালুম ইয়ার? ডু ইউ রিমেমবার শোলে?

শোলে! শোলে! মহবুবা মহবুবা……

অবিকল নকল রাহুল দেববর্মণের। অশোক জমিয়ে দিল। আর মাঝে মাঝে হুস হুস করে চলে যাচ্ছে রাতের ট্রাক। আলোর ঝাঁটায় অন্ধকার ঝেটিয়ে দুপাশে ফেলে দিচ্ছে। নদীর ধারে ব্রীজের কাঁধে ব্যারেজের ওপর চলেছে পপ কালচারের ছড়মাতুনি। বাট ইমিটেশান! রতনকুমার জেনেশুনেই নকলে মুখ গোঁজে।

টলতে টলতে ফিরে আসছিল ওরা দোমোহানীর দিকে। দূরে নীচে জুগ-জুগ করছে বাজারের আলো। ইলেকট্রিক সাবস্টেশনের স্কাইলাইট আরও দূরে নক্ষত্রের সঙ্গে ছত্রখান হয়েছে। রতনকুমার ক্লান্ত। চুপচাপ। কী অকিঞ্চিৎকর এইসব মাতলামি! স্রেফ ইমিটেশন। আরব সমূদ্রের ইমিটেশন সামনে ও চারপাশে। এইসব অপোগণ্ড ইঁচড়েপাকা ছোঁয়া ছেলের মধ্যে একফোঁটা থিল নেই। এডভেঞ্চার নেই, সাসপেন্স নেই। এণ্ড এক লড়কী ভি নেই। এমন রাতে এমন সময়ে লড়কির দরকার হয়। বোম্বে লড়কি সাপ্লাই করে। কিস কিস কিল কিল।

লাথি মারো! শালা এই দোমোহানী ঘোষের ডাঙায়। গো ব্যাক টু ইওর ওন প্লেস।

—ও রতনদা! আপনমনে কী বলছেন মাইরি?

—এ্যাই অশোক ! মাতলামি করবিনে। রতনদা, মশহুরের হিরোর মতো লাথি ঝাড়ুন শালাকে।

রতনকুমার গুনগুন করে উঠল—দা সান-শাইনস ফর এভার···

॥ নয় ॥

অহেতুক প্রেম-ভালবাসা

গুরু পাঞ্জাবি আর পাতলুন পরে রতনকুমার পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলা খুঁজছিল। সেই তেঁতুলগাছগুলো এখনও আছে। দেখতে দেখতে তার চোখে ধরা পড়ে, গাছগুলো যত উঁচু আর বিশাল ভাবত, তত কিছু নয়। মারকুটে চেহারা। থুড়ে বুড়োবুড়ি। ভিখিরীদের মতো তাকিয়ে আছে তার দিকে। পাড়গুলোও কী এমন উঁচু ! ঘুটিং কাঁকরভরা এঁটেল মাটির পুকুরপাড় তার স্মৃতিতে ছিল একেকটি টিলা। এখন দেখছে, সামান্য ঢিবি মাত্র। ফণিমনসার জঙ্গল ছিল এখানে-ওখানে। ভেঙ্গেচুরে ছত্রছান। ওখানেই ছিল গাঁয়ের আঁতুড়ের আবর্জনা ফেলার জায়গা। কয়েক রকম পাখির ছিল আড্ডা, তার নীচে ধাপে ধাপে নেমে গেছে মাঠ নদীর অববাহিকায়। এখানে দাঁড়িয়ে সে তার বাবাকে মোষের পিঠে চেপে ওই দূরের কুয়াশায় হারিয়ে যেতে দেখত। তার প্রিমিটিভ আধন্যাংটো বাবা !

পুকুরের জলটা এখন ঘষা কাচের মতো। শীত আসতে আসতে স্বচ্ছ কাজল হয়ে যাবে। এই পুকুরের মালিক কে, ভুলে গেছে, রতনকুমার। আবছা মনে পড়ে, কঞ্চির ডগায় পাটের সরু দড়ি ঝুলিয়ে এবং ঝিকিড়ি বেঁধে নকল বঁড়সীতে সে মাছ ধরার খেলা খেলত। একদিন কে যেন তাকে তাড়া করেছিল মাছ ধরছে ভেবে। থাপ্পড়ও মেরেছিল। লোকটা একটা বাচ্চা ছেলের খেলাকে খেলা বলে মানতেই চায় নি। কে সে ? রতনকুমারের আবছাভাবে মনে পড়ে যায় এবং শরীর শক্ত হয়ে ওঠে।

একটু পরে ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হল। তখন সিগারেট ধরিয়ে উদাস চোখে টানতে থাকল। ঘড়িতে এখন সকাল দশটা পনের। ঘোষের ডাঙার শেষ প্রান্তে নির্জন পুকুরপাড়ে তেঁতুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে ছেলেবেলার সব অপমান ও অবহেলাকে সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে থাকল। ক্ষমা করে দিল সব প্রাচীন অপমানকারীকে। তার ঠোঁটের কোণায় সূক্ষ্ম একটা হাসি

ফুটে রইল এবং সে গুন্‌গুন্‌ করে নীল ডায়ামণ্ডের গানটা গাইতে থাকল : দা সন শাইনস ফরেভার···

পুকুরের ঘাটে একটি মেয়ে পেতলের ঘড়ায় জল ভরছে। বুক অব্দি জলে দাঁড়িয়ে ঘড়াটা তুলিয়ে ঢেউ তুলছে। জলের ওপরকার সূক্ষ্ম স্তরটা সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার জল ভরার এটাই পদ্ধতি। জল ভরা হয়ে গেলে সে ঘাটের ওপর ঘড়া রাখল। তারপর জলে শব্দ করে নামল। সাঁতার কাটতে থাকল। এই শব্দে রতনকুমার মুখ ঘোরাল। মেয়েটিকে দেখতে পেল। গান বন্ধ করল।

এতক্ষণ পুকুরে কেউ ছিল না। কখন মেয়েটি এসে নিঃশব্দে জলে নেমেছে এবং জল ভরেছে রতনকুমার টের পায় নি। এখন জলে শব্দ তুলে উজ্জ্বল রোদে এক যুবতীকে সাঁতার কাটতে দেখে তার ভাল লাগল। ক্যামেরাটা সঙ্গে থাকলে গোপনে একটা ছবি তুলে নিত।

আর কী অদ্ভুত কথা, অবিকল এমনি ব্যাপারস্যাপারই তো কতো ফিল্মে ঘটে থাকে। রিয়েল লাইফ ড্রামা! তার মাথায় মাঝে মাঝে ডাইরেক্টার হওয়ার কল্পনা খেলত। এখন সেই কল্পনার গুটানো রঙীন গুলিসুতো ঠিকরে পড়ে গড়াতে গড়াতে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ছবিটার নাম দিতে পারত "এক গাঁও কী লড়কী!"

রতনকুমার শিস দিয়ে নীল ডায়মণ্ড গাইতে থাকল আবার। কত চমৎকার সব মেটিরিয়্যাল ছড়ানো আছে রিয়্যাল লাইফের দুপাশে। হাতে থাকা চাই একটি ম্যুভি ক্যামেরা।

যুবতী উবুড় হয়ে সাঁতার কাটছিল। ঘুরে চিত হয়ে সূর্যের দিকে কুলকুচি ছুঁড়ল। তারপর এগিয়ে এসে একবুক জলে দাঁড়াল। অমনি তাকে চিনতে পারল রতনকুমার।

সে আসার পর থেকে লক্ষ্য করেছে এই যুবতীর চোখে চোখ পড়লে কেন যেন ফিক করে হেসে ওঠে। মিষ্টি, কিন্তু জোরালো চেহারা। কথায় ছুরির ধার। কাকিমা শৈলবালার কাছে এসে প্রায়ই বসে থাকে সে। রতনকুমার জেনেছে, ওর নাম চপলা। দিবাকরের খুড়তুতো বোন। বিয়ে হয়েছিল দূরের এক গাঁয়ে। স্বামী নাকি লাথি মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে। বছর গড়িয়ে গেল। আর কেউ নিতে আসেনি। আসবে কেন? চরিত্তির ভাল নয় যে! এখানে বিস্তর চ্যাংড়া ছোকরাকে মাতিয়ে রেখেছিল। পাড়ার লোকেরা নাগরী বউয়ের ভক্তে সেই

জামাই ছোকরাকে শাসাত। আগুন বন্ধ করার ভয় দেখাত। অগত্যা ছোকরা ক্ষেপে পাছায় লাথি মেরে এক কাপড়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

চপলার বাবা হাঁফকাশের রুগী। মা পাড়াকুঁদুলী। একটা গাইমোষ আছে ঘরে। নিজেই চরায় কোমরে আঁচল জড়িয়ে। হাতে লাঠিও নেয়। জামাই মাঠের পথে এলে দেখা হয়ে যেত শাশুড়ীর সঙ্গে। মহাতেজী মেয়ে নেত্যবালা গয়লানী। বাবুপাড়ায় দুধ দিতে গেলে মুহূর্তে সবাই টের পায় নেত্য আসছে। রাস্তায় আপন মনে চেঁচামেচি করতে করতে হাঁটে, মাথায় দুধের পাত্র।

চপলার তিন-তিনটে দুর্ধর্ষ দাদা আছে। এক দাদা দাগী আসামী। জেল খাটছে ডাকাতির মামলায়। বাকি দুজন গরুমোষ নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত। সবাই পৃথগন্ন। নিজের ভাতে কচুপোড়া, বাবা-মাকে দেখবে কী! বুড়ো রত্নাকর ঘোষ দাওয়ায় বসে কেশে মরে। নোংরার বেহদ্দ। চপলা মায়ের এককাঠি সরেস। উঠতে বসতে বাপকে চোখ রাঙায়।

এইসব বিস্তারিত বর্ণনার পর শৈল বলেছিল—খুব খারাপ মেয়ে বাবা। ওর কথা বলো না। ওর দিকে ভুলেও তাকিও না। খামোকা এমন অপমান করবে, লজ্জায় মনে হবে মাটির ফাটল পেলে ঢুকে যাও। এমনি মেয়ে।

কিন্তু এইতেই রতনকুমারের দৃষ্টি একটু বেশি পড়ে চপলার দিকে। চপলা ফিক করে হাসে। কিছু বলে অস্পষ্টভাবে, রতনকুমার বুঝতে পারে না। পাশ দিয়ে যাবার সময়ই এমন দুর্বোধ্য সংলাপ আওড়ে যায় সে। রতনকুমার একলা অবস্থায় থাকলে দাঁড়িয়ে গেছে এবং ঘুরে বলেছে—কিছু বলছ? চপলা তখন হন-হন করে চলে যাচ্ছে। ওর চলায় চমৎকার ছন্দ আছে। সেক্স আছে। তবু রতনকুমার আকৃষ্ট হয়নি। কারণ বস্তুত সে সেক্সের জন্যে এখানে আসেনি। আর যা কিছুই খুঁজুক, এই জংলী পাড়াগাঁয়ে সে সেক্স খুঁজবে না। কত বেহতরীন শিরীন লড়কী তার দেখা আছে। এনজয় করা আছে। সেক্স ইজ নরম্যাল এ্যাফেয়ার। স্বাভাবিকতা দিয়ে এনজয় করা উচিত। আরে ইয়ার, কিতনি খবসুরত অজুকেটেড গার্লস ইউ ক্যান এনজয়। অফকোর্স, দেয়ার ইজ ওয়ান থিং: মানি। রুপেয়া। ইফ ইউ হ্যাভ এনাফ ম্যানি, তো পহেলী কুছ খা লো—এ্যাণ্ড দেন পিক আপ এ গার্ল। উনকী ভি কুছ খিলা দো এ্যাণ্ড গো টু দা মুভি এ্যাণ্ড ব্রিং হার টু ইওর বেড। মৌজমে রহো দোস্ত। ইয়ে জিন্দেগী দো দিনকে লিয়ে হ্যায়। লাইফ ইজ শর্ট। জওয়ানী উসসে ভি জেয়াদা শর্ট।

—বোম্বাইকা বাবু যে?

চপলা মুখের জল রতনকুমারের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে বলল। হ্যাঁ, সে রতন-কুমারকে এই নামে ডাকে। এতদিন এই সম্বোধনে কান করেনি রতনকুমার। এখন এই নির্জন পুকুরঘাট, উজ্জ্বল রোদে ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে গেছে চপলার। সে ব্লাউজ বিশেষ পরে না—সায়াও কী পরে? বোঝা যাচ্ছে না এবং এতদিন লক্ষ্যও করেনি। ঘোষের ভাঙার মেয়েরা সচরাচর বাড়িতে থাকার এবং কাজ করার সময় সায়া-ব্লাউজ পরে না। বাইরে গেলেটেলে পরে। কাকিমাকে একগুচ্ছের সায়া-ব্লাউজ শাড়ি কিনে দিয়েছে। প্রথম ক'দিন অনভ্যস্ত ভঙ্গীতে পরেছিল। আবার যা ছিল, তাই। বেশি বললে মুখ ভারি করে ছলছল চোখে তাকিয়ে বলে—কোন প্রাণে বেশ করে থাকি বাবা অতনকুমার? তুমি ছিক্ষিত ছেলে। জ্ঞানী লোক বাবা তুমি। তুমিই বলো! তোমার কাকাটা…

তারপর কাকিমা ভ্যাঁ করার তালে আছে দেখে আর রতনকুমার সেকথা মুখে আনে না।

—এই বোম্বাইকা বাবু! প্যাট-প্যাট করে তাকাতে লজ্জা করে না?

—কিছু বলছ আমাকে?

—ওই তেঁতুল গাছটাকে।

—কী বলছ?…রতনকুমার হাসল।

—বলছি, অত টক ক্যানে?

রতনকুমার গাছটার দিকে মুখ তুলে কিছু দেখার ভান করে বলল—ঠিক বলেছ।

—এই বোম্বাইকা বাবু! ঘাটে কী মতলবে? এ্যাঁ? মেয়েদের চান করা দেখতে? কেটে পড়ো শীগ্‌গির!

রতনকুমার আমোদ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।—তাই বটে। আমি ঘুরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি নাহাও!

মুখ ফসকে তার হিন্দী বুলি বেরিয়ে পড়ে কদাচিৎ। চপলা হাসতে লাগল। ভেংচি কেটে বলল—তুমি নাহাও! তোমার মাথা করো! বোম্বাইকা বাবুর কা সাধ! নাহান করা দেখবে। যাও, যাও! ভাগো!

রতনকুমারের ভ্যানিটি আহত হ'ল। এই গাঁয়ের মেয়ের রূপ দেখার জন্যে তার এমন কিছু ইমোশন চাগিয়ে ওঠেনি। সে এসেছে ছেলেবেলাটা পরখ করতে। মনে অন্য মুড এখন। সে তাচ্ছিল্য করে হাসল।—আর যাকেই দেখতে আসি, তোমাকে নয় চপলা!

—হুঁ, খুব দেখা আছে। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। বকিও না মেলা।

রতনকুমার একটু রেগে গিয়ে বলল—বাজে কথা বোলো না! বেশি বললে আমি এখান থেকে নড়ব না।

চপলা হেসে খুন।—ও মা! বোম্বাইকা বাবুর রাগ হয়েছে! তাও বটে বাবা! আমি তো আর নোলে ভটচাযের মেয়ে নই। নেকাপড়াও শিখিনি!

—কী বললে?

—বেশ বলেছি। নাও, গলা কাটো! বলে চপলা বাঁকা হেসে মাথা নুইয়ে একবুক জলে অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

রতনকুমার গরম চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। তারপর ফোঁস করে বলল—অসভ্য জংলী কোথাকার! এটিকেট শেখেনি।

চপলা মুখ তুলে ওর ভঙ্গী দেখে একটু অবাক হবার ভান করল। তারপর ফিক করে হেসে কণ্ঠস্বর একটু চেপে হঠাৎ বলে উঠল—এই! আমাকে বানারসীবাবু দেখাবে?

রতনকুমারের রাগ পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর সে দেখল, চপলা হুড়মুড় করে জল ভেঙ্গে এগিয়ে ঘাটের ধারে একটুকরো লাইম-কংক্রিটের ওপর বসল। এই টুকরোটা ঘোষের ডাঙার কোন হিতব্রতী লোক কবে দোমোহানী থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। চপলা হাঁটু অব্দি কাপড় তুলে জলে নিজের পা দেখতে থাকল। এই সময় রতনকুমারের চোখে পড়ল ঘাটের ধারে শুকনো মাটির ওপর একটা ছোট্ট সাবানও রয়েছে। মোড়কসমেত। ওই তুচ্ছ কমদামী সাবানটার যত্ন দেখে তার হাসি পাচ্ছিল। চপলার একটা পাশ সে দেখতে পাচ্ছে। বেশরম লড়কী! রতনকুমার বলল—বানারসী বাবু কোথায় হচ্ছে?

—টাউনে। আবার কোথা হবে? বলে চপলা সাবানটা সাবধানে নিল। তারপর গায়ে ঘষতে ঘষতে ফের—তুমি তো ছবির মানুষ! ছবিঘর করে দাও না দোমোহানীর বাজারে। দেখে সুখ করি!

ছবির মানুষ শুনে রতনকুমার মুহূর্তে খুশিতে গলে গেল। বলল—তুমি বুঝি খুব ছবি দেখ?

—হুঁ! ফাঁক পেলেই দেখে আসি।

—বলো কী!

গালে সাবানের মাখা। চোখ পিটপিট করে ঘুরে চপলা বলল—বোম্বাইকা বাবু! তুমি হেমামালিনীকে সামনাসামনি দেখেছ গো?

রতনকুমার দু'কাঁধ সাহেবী কায়দায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—হ্যাঁ!

—আর কাকে কাকে দেখেছ?

—সব্বাইকে।

—হ্যাঁ গো বোম্বাইকা বাবু, হেমামালিনী আমার চেয়ে বয়েসে বড়ো, না ছোট?

—কেন? তোমার চেয়ে অনেক বেশি বয়স ওর।

চপলা দুই বাহু ছড়িয়ে সাবান মাখতে থাকল। একটু পরে বলল—দেখাবে বানারসীবাবু?

রতনকুমার একটু হেসে বলল—কী মুশকিল! দেখাব। ফার্স্ট ক্লাস কত?

চপলা ঘুরে চোখে রাগের ঝিলিক তুলে বলল—তোমাকে পয়সা চেয়েছি নাকি? মরণ আমার! ভিক্ষে চাইছি ভাবছে গো!

—তবে কী?

—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে দেখাতে।

—আর গাঁয়ে কেলেঙ্কারী রটবে! রতনকুমার হো হো করে হেসে উঠল। তোমার সাহস দেখে অবাক লাগছে, চপলা!

চপলা বলল—যাক্। এত হাসতে হবে না। মাণিক কুড়ুবার জায়গা নেই। কাপড় ভেজা দেখছ না!

রতনকুমার বিবেচনা করল, ডায়ালগটা বেশ শার্প এবং চমৎকার। চপলার প্রতি তার আগ্রহ বাড়ল। সে বললে—তাহলে বানারসীবাবু দেখতে যাবে কীভাবে বলো?

চপলা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চল চোখে চারপাশটা দেখে নিয়ে ফের বসল। তারপর বলল—যদি যাও, বলো। আমি যাব। তুমি যাবে বাসে নিজের টিকিট কেটে—যেন নিজের কাছে যাচ্ছ। আমি যাব নিজের টিকিট কেটে—যেন একা-একা যাচ্ছি।

—তোমার একা যেতে কেউ আপত্তি করবে না?

—কার ধার ধারি! আপত্তি করবে! ভাত দেবার ভাতার নেই, কিল মারবার গোঁসাই!

রতনকুমার জিভ কেটে বলল—এই! বড্ড অশ্লীল কথা বলছ কিন্তু!

—কী কথা ?

—অশ্লীল। মানে খারাপ কথা !

চপলা নাগরী মেয়ের চাতুর্যে বাঁকা হেসে বলল—হুঁউ ! বোম্বাইকা বাবুর বড় শুচিবাই। তাও তো মাথার ঘিলুতে আঁচড় কাটিনি এখনও। হুঁঃ ! খারাপ কথা গো, খারাপ কথা ! গলা টিপলে দুধ বেরুচ্ছে। এখন কেটে পড় তো দেখি ! আমি গায়ে সাবান মাখব।

রতনকুমারের শরীর জুড়ে কী এক ঝড় শুরু হয়েছে এতক্ষণে। কোয়াইট এ্যান এক্সপিরিয়েন্স ! সে টের পেল, তার-চোখের ওপর একটা অন্যরকম পর্দা পড়ে গিয়েছিল এখানে এসে এবং তার পর থেকে সবকিছু একরকম দেখেছে। এখানে এই জনহীন পুকুরঘাটে সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে সেই পর্দাটা সরে গেল। তার মধ্যে সেই প্রকৃত বোম্বাইকা বাবুর পায়চারি শুরু হল।

চপলার কি পেছনে চোখ আছে ? সে সাঁৎ করে ঘুরে বলল—এই বেহায়া বোম্বাইকা বাবু ! কী অত দেখছ, শুনি ? ভাগো !

রতনকুমার মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল—মাই গুডনেস ! তুমি সত্যি কতকটা হেমামালিনীর মতো ! এতক্ষণ তাই শোচ করছিলুম—আপ্‌অন গড ! তোমাকে হেমা নাম দিলুম। হাই হেমা !

চপলা জলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে খানিকটা বালি তুলে নিয়ে ছুঁড়ল আচমকা। রতনকুমারের জামায় একটু লাগল। সে হাসতে হাসতে সরে গেল। পাড়ের ওপাশে নীচের দিকে নামল। মাঠের আকাশে বিশাল সব ফ্রেম সোজা চলে গেছে মাথায় কয়েক সার মোটা তার নিয়ে দিগন্তের দিকে। সামনের ফ্রেমের গায়ে ঝুলছে লাল বোর্ড। তাতে সাদা একটা মড়ার খুলি, তলায় আড়াআড়ি দুটো হাড়। সাবধান, এগারো হাজার ভোল্ট। ছুঁইলেই মৃত্যু।

একটু অস্বস্তি হ'ল তার। তারপর ভারি শরীর টেনে পা বাড়াল। ধান-ক্ষেতের আল দিয়ে সোজা এগুলো হাইওয়ের দিকে। ডাইনে ছোট ঘোষের ডাঙ্গা। কিছুক্ষণ পরে যখন কাঠগোলার পাশ দিয়ে রাস্তায় উঠল, চটি শিশিরে ভিজে ভারি হয়েছে। পাতলুনের নীচে জলকাদা লেগেছে। আর অজস্র চোর-কাঁটা থিকথিক করছে। সে হেঁট হয়ে চোরকাঁটা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।

এই সময় তাকে নোলে ভটচায ডাকলেন।—রতন ! ওহে শ্রীমান রতন-কুমার !

রতনকুমার উঠে সোজা হ'ল। একটু তফাতে প্রগতি প্রেসের গেটের কাছে

নলিনী দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছেন। সে অভ্যাসমতো নমস্কার করে এগিয়ে গেল।

—আরে! তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা ক'দিন থেকে। আজ্ই কাগজ বেরুচ্ছে। খেয়েদেয়ে রওনা হবো টাউনে। তোমাকেও যেতে হবে। হেমেনকে ডেকে এলুম!

রতনকুমার আনমনে বলল—বেশ তো, যাব।

নলিনী অনুযোগ করলেন—তুমি আর যেন তেমন ইণ্টারেস্ট নিচ্ছ না বাবা! এস, তোমাকে ফাইলকপিগুলো দেখাই। কা'ল সন্ধ্যেবেলা সব দপ্তরীখানায় দিয়ে এসেছি। শ্রীদুর্গা ব্রিলিয়াণ্ট ছেপেছে। আমার ফর্মাটাই খালি একটু ধেবড়েছে! নলিনী হাসলেন দুঃখিতভাবে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেসিন। টাইপ ক্ষয়াটে। নতুন টাইপের যা দর আজকাল। এস, চা খাই…।

এর ক'দিন পরে এক দুপুরে শৈলকাকী ছেলেপুলেদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। আসবে পরের দিন। ওখানেই কেষ্টপদ গিয়ে উঠেছে। জামাই-আদর খাচ্ছে নাকি। দেখে আসাও হবে। রতনকুমারকে সতর্ক করে দিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে যেন বেরোয় না। আজকাল চোর-ডাকাতের মুলুক হয়ে গেছে।

রতনকুমার বারান্দায় তার বিছানায় শুয়ে হেডলি চেজ পড়ছিল। টেপ-রেকর্ডারে চলা ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক। একটু পরে আকাশ কালো করে বৃষ্টি এল। প্রথমে মোটা মোটা ফোঁটা, তারপর সরু সরলরেখায় ঝমঝমানি। নিকোনো উঠোনে জল গড়াচ্ছে। রতনকুমার বুকে বালিশ রেখে উবুড় হয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে সেই তুমুল বৃষ্টির মধ্যে আবছা হয়ে কেউ বাড়িতে ঢুকল এবং কুঁজো হয়ে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় এসে উঠল। রতনকুমার ভেবেছিল, তাহলে কাকিমা ফিরল! এরই মধ্যে কীভাবে ফিরতে পারে, মাথায় আসেনি। কিন্তু তারপরই ঠাহর করে দেখে চমকে উঠল। এ যে চপলা! শুকনো বারান্দায় নদী বইয়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে সর্বনাশী মেয়েটা।

রতনকুমার হিরোর ভঙ্গীতে বলল—আ যাও হেমা!

চপলা ভিজে কাপড়ের পাড় কামড়ে ধরে আকাশ দেখার জন্যে একটু ঝুঁকে বলল—বোম্বাইকা বাবুর জন্যে এ হেমা আসেনি!

রতন পা ঝুলিয়ে বসল। চপলার এই ভিজে শরীর সে সেদিনও দেখেছে। এখন দেখতে গিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল, ওই শরীরে কোথাও কী এক গোপন দুঃখ আছে। কেন এই উদ্ভট ধারণা এল, সে বুঝল না।

সে বলল—ও কে! তাহলে কার জন্যে এসেছ, শুনি?

—কারুর জন্যে না। চপলা ভিজে খোঁপা খুলে চুল থেকে জল ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গী করল।

রতনকুমার একটু হাসল।—তোমার কথাটা বুঝতে পারলাম না হেমা!

চপলা সে কথার জবাব না দিয়ে বারান্দায় মেঝের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।—ও মা! আমি করছি কী! শৈলকাকী এসে শাপশাপান্ত করবে যে! সুন্দর করে নিকোনো মাটিটা কী করে ফেললাম দেখছ বোম্বাইকা বাবু?

—করছ কেন?

—আমার স্বভাব গো, বানারসীবাবু।

মুহূর্তে রতনকুমার চটে গেল। ভুরু কুঁচকে বলল—তুমি আমাকে বানারসী-বাবু বলছ যে! আমাকে বুঝি তাই ভাবো?

চপলা হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ধারা তালুতে নিতে নিতে বলল—রাগ করলে?

—করলাম।

—তাহলে আর বলব না।

রতনকুমার সিগারেট ধরাল। সে নিজের লোভকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে। চপলার কথায় এবং ভঙ্গীতে সেন্টিমেণ্ট আহত হয়েছে।

চপলা তাকে চুপ করে থাকতে দেখল মুখ ঘুরিয়ে। তারপর বলল—তুমি আর বোম্বাই ফিরে যাবে না?

রতনকুমার আস্তে বলল—কেন?

—আমি তোমার সঙ্গে বোম্বাই যেতাম!

আবার রতনকুমারের হাসি পেল। সে বলল—তাই বুঝি! বোম্বাই যেতে চাও কেন?

—তোমার মতন সিনেমায় নামব।

রতনকুমার সরল মনেই হাসতে থাকল একথা শুনে।

চপলা বলল—হাসছ কেন? আমার চেহারা ভাল না?

—খুব ভাল। কিন্তু শুধু চেহারা ভাল হলেই তো চলবে না! আরও কিছু থাকা চাই।

—কী থাকা চাই, শুনি?

—ধরো, লেখাপড়া জানা দরকার। স্মার্ট হওয়া দরকার। মানে তুমি তো গ্রামের মেয়ে—শহুরে চালচলন জানা দরকার।

রতনকুমার কথাগুলো সিরিয়াস হয়েই বলল। চপলা মন দিয়ে শোনার ভান করে বলল—লেখাপড়া জানি না। বাকিগুলো তুমি শিখিয়ে দেবে! তাহলেই হ'ল।

—বোম্বের ফিল্ম লাইন খুব খারাপ জায়গা। বুঝেছ তো? ইজ্জত থাকবে না। দুনিয়ার লম্পট সেখানে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। একেকটা লম্পট মিলিওনিয়ার—কোটি কোটি টাকার মালিক।

চপলা বড়-বড় চোখে শুনছিল। তারপর নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—লম্পট তো সবখানেই গো বোম্বাইকা বাবু! বলো, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে নাকি?

রতনকুমার সন্দিগ্ধ মুখে বলল—এ জন্যেই কি এভাবে বৃষ্টির মধ্যে এসে গেলে হেমা?

চপলা সেকথার জবাব না দিয়ে আবার আকাশ দেখবার জন্যে ঝুঁকল। মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি ঝরছে সমানে। ঘোষের ডাঙার আবহমণ্ডল আবছা অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। দমকা হাওয়ায় গাছ-গাছালি দুলছে। উঠোন থেকে বৃষ্টির ধারা বেঁকে এসে দাওয়া ভিজিয়ে দিচ্ছে। রতনকুমার দেখল, তক্তাপোষের ওপাশে বিছানায় ছাঁট লাগছে। তখন সে বিছানাটা মুড়ে একপাশে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে রাখল। তারপর টেপরেকর্ডার বন্ধ করল।

চপলা বলল—বন্ধ করলে কেন? বেশ তো গান বাজছে।

রতনকুমার প্রেমিকের গলায় বলল—তোমার গান শোনা যাক্।

—অত শস্তা নয়। আমি তো নোলে ভটচাযের মেয়ে নই।

—তার মানে?

—মানে আবার কী? নোলে ভটচাযের মেয়ে লেখাপড়া জানে। গান গাইতে পারে হারমোনিয়েম বাজিয়ে। তাই বলছি।

রতনকুমার ওর দিকে এক পা এগিয়ে দাঁড়াল। বলল—না। তুমি তা বলোনি।

—কী বলেছি তবে?

—চালাকি করো না চপলা।

—তাও ভাল, নাম ধরে ডাকলে বোম্বাইকা বাবু।

রতনকুমারের অসহ্য লাগল। সে চপলার দু'কাঁধ ধরে ফেলল। বলল—তোমার খুব সাহস, তাই না?

চপলা মুখ নামিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—ছাড়ো!

—যদি না ছাড়ি?

—বিপদ হবে। আমি অত শস্তা নই বোম্বাইকা বাবু!

—কেন এভাবে এলে তাহলে?

—বা রে! আমি গাঁয়ের মেয়ে। গাঁয়ের লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াই এভাবে। ছাড়ো বোম্বাইকা বাবু। গায়ের জোরে কিছু হয় না।

রতনকুমার এতে অভ্যস্ত নয়। সে ওকে ছেড়ে দিয়ে বলল—কিভাবে হয় চপলা?

—কী স্যাণ্ট্ মাখো বোম্বাইকা বাবু! মাথার ভেতর অব্দি জ্বলে যায়।

—স্যাণ্ট্ না, সেণ্ট্!

চপলা মিষ্টি হাসল।—বেশ। সেণ্ট্! এখন আসি বাবা! ভিজে কাপড়ে থাকলে নিমুনি হবে।

তারপরই সে যেভাবে এসেছিল, বৃষ্টির মধ্যে ঠিক সেভাবেই হেঁটে চলে গেল। রতনকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণ কি তাহলে স্বপ্ন দেখছিল?

বারান্দায় মাটির মেঝেয় ওর পায়ের ছাপ পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে রতনকুমারের মনে ব্যর্থতার ক্ষোভ জাগল। আশ্চর্য তো! সে কেন যেন কিছুক্ষণ নিরুত্তাপ হয়ে গিয়েছিল। আফসোস! এক গাঁও কী লড়কীর সামনে সাহস হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু কেন এমন করে এসেছিল চপলা? ফিল্মে নামার তদ্বিরেই কি? অসম্ভব। ওর মুখে কী একটা অন্য ভাব খেলা করছিল, এতক্ষণে মনে পড়েছে রতনকুমারের। সে টেপরেকর্ডার চালু করে দিল জোরে। বৃষ্টি পড়তে থাকল অঝোরধারায়।

॥ দশ ॥

গার্গী এবং রতনকুমার

শারদীয় সংখ্যা 'পল্লীবার্তা' বেরুনোর দিন সম্পাদক একটা গোপন নৈশভোজ দিয়েছিলেন। গার্গী রতনকুমারকে খুব যত্নে পরিবেশন করেছিল। কৃতজ্ঞতা-বোধই এর কারণ। খাওয়া-দাওয়ার পর জনান্তিকে রতনকুমার গার্গীকে গিরির

কথা জিগ্যেস করেছিল। গার্গী একটু হেসে বলেছিল—আপনি থাকতে আর ভয় কিসের ?

গার্গী হাল্কা চালে বললেও এ তার মনেরই কথা। সত্যি বলতে কী, তারপর থেকে সারাক্ষণ তার মনে হয়েছে, সে একজন দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরছে। আগেকার সেই আত্মনির্ভরতা কোথায় গেল তার! পল্লীবার্তা কোনো কেলেঙ্কারী ফাঁস করলে তার বাবা যদি আক্রান্ত হন, তখনও রতনকুমার পাশে এসে দাঁড়াবে না কি ? এইসব ভেবে গার্গীর সাহস।

গিরিজা মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে পাশ দিয়ে যাবার সময় গার্গীর উদ্দেশে কী অশ্লীল রসিকতা করেছিল সেদিন। মোটর সাইকেল সামনের বাঁকে মিলিয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ গার্গী দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। মনে মনে ফুঁসেছিল। রতন-কুমারের কানে তুলবে ভেবেছিল। কিন্তু তারপর তাকে স্ত্রীলোকের লজ্জা ও বিবিধ সংস্কার এসে কোণঠাসা করেছিল। পরে রতনকুমারের সঙ্গে দেখা হলেও কথাটা বলতে পারেনি।

কিন্তু রতনকুমারেরও যেন কী হয়েছে! পল্লীবার্তা আপিসে তেমন আসে না আর। আগের মতো সে চাঞ্চল্য এবং স্মার্টনেস নেই। তাকে আনমনা ও নিঃসঙ্গ দেখায়। অশোকদের আর সবসময় তার সঙ্গে দেখা যায় না। সে হাজরার চায়ের দোকানেও কম যায়। গার্গী একদিন তাকে দেখল হাইওয়ে দিয়ে তার পাগল কাকা কেষ্টপদের মতো সে উদাসীন হেঁটে চলেছে। তার মুখে পশ্চিমের রোদ পড়েছে। শরীরের চামড়ায় সে মসৃণতা আর নেই যেন। একটু রোদপোড়া দেখাচ্ছে। চুলে যত্ন-আত্তি নেই। খুব সাধারণ হয়ে গেছে রতনকুমার। কী হয়েছে ওর ?

তার ফিরে আসার অপেক্ষায় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল গার্গী। কিন্তু রতনকুমার এ পথে আর ফিরল না। সন্ধ্যা এল। পোকামাকড় ডাকতে থাকল। গাছপালার মাথায় কুয়াশা জমল। আলো জ্বলল দোমোহানীতে। তখন গার্গী নিজের এ রকম প্রতীক্ষা লক্ষ্য করে লজ্জায় পড়ে গেল। হনহন করে ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং চর্যাপদের নোট মুখস্থ করতে বসল।

এই সময় গার্গী টের পায়, এসবে অমৃত নেই। যাতে অমৃত নেই, তা নিয়ে আমি কী করব ? বিজ্ঞ দার্শনিক নোলে ভটচায মেয়ের মাথায় খুব কম বয়স থেকে এই ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। গার্গী নিজেকে বরাবর সন্ন্যাসিনী কল্পনা করতে আনন্দ পেয়েছে। সে ভেবেছে, যদি মেয়ে না হত,

বেরিয়ে পড়ত পথে। পায়ের কাছেই ওই পথ। পথ গেছে তীর্থে, যেখানে অমৃত আছে।

যাই হোক, এসব দার্শনিক ইচ্ছার গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। আসল কথা হচ্ছে সংগ্রাম। বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম। গার্গীর ইদানীংকার সংগ্রাম নিজের সঙ্গে। আজকাল ওই পথের কথা ভাবলেই মনে হয় এক সন্ন্যাসীর হাতির কথা। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছিল। ছেলেমেয়েরা সেই হাতির পেছনে যাচ্ছিল। হাতির-পিঠে ছিলেন সন্ন্যাসী। হ্যামেলিনের বাঁশিওলার মতো সেই সন্ন্যাসী ছেলেমেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন নিরুদ্দেশে। কিন্তু তিনি শেষে একজনকেই পছন্দ করলেন। তাকে নিয়ে গেলেন। বাকিরা সবাই ফিরে এল যে যার বাড়িতে। ওই একজন আর ফেরেনি।...

সপ্তমী পুজোর রাতে গার্গী নিজের তাগিদেই বাবাকে বলে রতনকুমারকে নৈশ-ভোজে আমন্ত্রণ করল। দোমোহানী বাজারে মেলা বসেছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকেরা এসে ভিড় জমিয়েছে। সে ভিড় মধ্যরাত অব্দি জমজমাট। স্কুলের মাঠে কলকাতার যাত্রার আসর বসেছে। রাস্তায় ছেলে-ছোকরারা মাতাল হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। নোলে ভটচায সন্ধ্যা অব্দি ভিড়ে খুঁজে রতনকুমারকে পেলেন না। তখন ঘোষের ডাঙা গেলেন। কেষ্টপদের বাড়ি নির্জন। দরজায় তালা। নলিনী রাগ করে ফিরে আসছিলেন। পথে শৈলবালার সঙ্গে দেখা। ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে-গুজিয়ে সে পুজো দেখতে গিয়েছিল। বলল—ফটিক? ওর কথা আর বলবেন না ভোটজে মশাই। বললাম, ভাইবোনদের সঙ্গে করে পুজো দেখে এস। তা বাবু বললেন, টাউনে যাচ্ছি। বলে সেজেগুজে সেই বেরিয়েছেন। এদিকে ঘরভর্তি জিনিসপত্তর। আমার আর কি নেবে চোরে? নেয় তো ঐ বাবুরই নেবে। তাই ব'লে এমন দিনে দারোয়ানী করব বাড়ি বসে? কী পেয়েছে আমাকে?

নলিনী বুঝলেন, রতনকুমার আর কাশীর মন পাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে দ্বন্দ্ব ধোঁয়াচ্ছে। সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু নেমন্তন্ন ফেলে টাউনে গেল ছোকরা! আমার বাড়ির নেমন্তন্ন!

নলিনী আগুন হয়ে ফিরছিলেন। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে যেতেই দেখলেন, রতনকুমার বাস থেকে নামল। অমনি মনের আগুন নিভে গেল। নলিনী চেঁচিয়ে ডাকলেন—এই যে শ্রীমান! তোমাকে কখন থেকে গরু-খোঁজা করে খুঁজছি। টাউনে যাবার আর দিন পেলে না?

তারপর হা হা করে একচোট হাসলেনও। রতনকুমার অপ্রস্তুত হেসে বলল—একটু কাজ ছিল।

—তোমার কাজ? নলিনী আদর দেখিয়ে বললেন। হুঃ, তোমার আবার কাজ! যাকগে, এস এস।

দুজনে ভিড় ঠেলে প্রগতি প্রেসের দিকে চলতে থাকলেন। নলিনী সমানে বকবক করছিলেন। তাঁর কথায় উল্লাস উপচে পড়ছে। শারদীয় কপি প্রায় সবই বিক্রি হয়ে গেছে। নেক্সট ইস্যুর জন্যে এখন থেকেই ম্যাটার রেডি করা দরকার। একটা মারাত্মক স্টোরি হাতে এসেছে। লিখে ফেলেছেনও খানিকটা। পড়ে শোনাবেন।

এ রাতে আকাশ পরিষ্কার। ঝকঝকে সপ্তমীর চাঁদ জেল্লা দিচ্ছে। নলিনীর বাড়িতে সবগুলো আলো জ্বলছে। গেটের পাশে অস্থির গার্গী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে মিষ্টি হাসে। রতনকুমারকে যেন অভ্যর্থনা করতেই অপেক্ষা করছিল! রতনকুমারের খুব ভালো লাগে ব্যাপারটা।

ভেতরের ঘরে গিয়ে নলিনী প্রথমে তাঁর স্টোরি খুলে বসলেন। হেড লাইন আগেভাগে লিখে ফেলেছেন।

'ভদ্রকন্যার কেলেঙ্কারী!!' তার তলায়: 'সমাজ নীরব কেন?'

গার্গী ফুঁসে উঠল—আবার ওইসব? এবার দেখবে প্রেসে আগুন ধরিয়ে দেবে।

নলিনী দন্ত বিস্তার করে বললেন—সে হিম্মত নেই, সে হিম্মত নেই! কে ধরাবে রে আগুন? সবাই ওদের শত্রু এখন। অল্ কোণঠাসা হয়ে গেছে বোনের জন্যে। তুই ভাবিস নে। গুরু-শিষ্যকে জুত করে চা খাইয়ে দে। কী বলো বাবা রতনকুমার?

রতনকুমার বলল—ব্যাপারটা কী?

নলিনী দাড়ি চুলকে বললেন—পড়ে শোনাচ্ছি। রোসো। গাগু, চা।

গার্গী অগত্যা বারান্দায় গেল। নলিনী স্টোরি পড়তে শুরু করলেন।

'...রাখালের সঙ্গে রাজকন্যার প্রেমকাহিনী রূপকথায় আছে বটে, বাস্তব জীবনে কি তা ঘটে? আমরা বলি, নিশ্চয় ঘটে। সকলই মহাকালের মর্জি। সম্প্রতি এতদঞ্চলের এক পরলোকগত এবং প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোকের কনিষ্ঠা কন্যা বাড়ির রাখালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল। রাখাল ছোকরাটি জাতিতে কুড়ুর বা কুনাই সম্প্রদায়ের। পুরুষ পরম্পরা ওই পরিবারের সেবায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু

কিউপিডের কী বিচিত্র দুষ্টামি! স্কুল ফাইন্যাল পাশ অষ্টাদশবর্ষীয়া ভদ্রকন্যা অশিক্ষিত রাখাল যুবকের প্রেমে উন্মত্ত। গৃহত্যাগ করার পর লজ্জায় উক্ত পরিবার নীরব থাকেন। পুলিশেও সংবাদ দেন নি। হঠাৎ সেদিন দেখা গেল, প্রেমিক ও প্রেমিকা ফিরে এসেছে। কুড়ুর যুবকটির কুটিরে বধূবেশে ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর কাজকর্ম করছে। মজার কথা, যুবকটি বিবাহিত। তার স্ত্রী তদণ্ডে বাপের বাড়ি চলে গেছে। সমগ্র সমাজ হতবাক, বিমূঢ়। আমরা শুনেছি, পরলোকগত ভদ্রলোকের পুত্র অর্থাৎ প্রেমিকার দাদা হামলা করেছিলেন। কিন্তু এতদঞ্চলের এক কুখ্যাত গুণ্ডা যুবকটির মুরুব্বী। তাই ঘটনা আর অধিক দূর গড়ায় নি। গুণ্ডাটির চেলারা পালাক্রমে কুটির পাহারা দিচ্ছে। তাদের সেবায় প্রতিদিন অঢেল সুরার ব্যবস্থা। যাই হোক, আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। এমন অভাবিত ঘটনা…'

রতনকুমার বলল—সত্যি?

নলিনী গম্ভীর মুখে বললেন—বিলকুল সত্যি। এই দোমোহানীরই ঘটনা। তুমি শোন নি?

—না তো!

নলিনী গলা চেপে বললেন—যত দিন যাচ্ছে, আমি তো একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি। এসব কী ঘটছে চারপাশে! গ্রামসমাজ কী বদলান না বদলাচ্ছে, ভাবা যায় না। মাত্র একযুগ আগে কেউ এমন কাণ্ড কল্পনা করতেও পারত না। ছ্যা ছ্যা!

রতনকুমার একটু হাসল।—কিন্তু ক্ষতি কী এতে?

নলিনী অবাক হয়ে বললেন—তুমি নিশ্চয় ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবছ না। জাতিভেদ প্রথা আমি সমর্থন করি নে। কিন্তু কালচার? দু'জনের কালচারাল বৈষম্যকে তো অস্বীকার করতে পারো না বাবা। একদিন না একদিন সংঘর্ষ ঘটতে বাধ্য। তখন? তখন মেয়েটির সামনে প্রস্টিচুড কোয়ার্টারের ডোর ইজ ওপেন! আর কে নেবে ওকে?

রতনকুমার তর্কের সুরে বলল—কেন! স্কুল ফাইন্যাল পাশ—চাকরির চেষ্টা করবে।

—চাকরি! ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠলেন নলিনী। কত এম এ পাশ হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে! তাছাড়া প্রব্লেম তো অন্যত্র। ও নির্ঘাত পড়েছে গিরি গুণ্ডার পাল্লায়।

রতনকুমার জ্বলে উঠল।—আসা অব্দি সবাই গিরির কথা বলে! গিরিকে

এত ভয়! আমি দেখেছি গিরিকে। আমাকে দেখেই ভেগে গিয়েছিল। সেদিন···

'এ পর্যন্ত বলে সে সতর্কভাবে চুপ করল। নলিনী কান পেতে বললেন—সেদিন?

রতনকুমার হাসল।—তেমন কিছু না। আচ্ছা স্যার, গিরির বিরুদ্ধে ডাইরেক্টলি কিছু লেখেন না কেন?

নলিনী বিমর্ষভাবে বললেন—লিখে আজকাল আর কিছু হয় না বাবা! কেউ গ্রাহ্যও করে না। সামান্য গ্রামের কাগজ! তবে হ্যাঁ, কলকাতার দৈনিকে ছাপলে কাজ হত নিশ্চয়।

গার্গী চা আনল। রতনকুমারের দিকে কাপ এগিয়ে বলল—আজ কিন্তু আপনার লাইফস্টোরি না শুনে ছাড়ব না। আগেভাগে বলে রাখছি।

নলিনী বললেন—সে তো আমি ভিভিডলি লিখে রেখেছি। আপত্তি করল বলে ছাপলাম না। বরং ওটাই দেব পড়ে দেখিস। কেন বেচারাকে অহেতুক জ্বালাতন? কী বলো রতনকুমার?

রতনকুমার বলল—আমাকে আপনি ফটিক বলুন স্যার।

নলিনী বললেন—উঁহু! তুমি আমার কাগজের কলামনিস্ট রতনকুমার। এ একটা প্রেসটিজের ব্যাপার। শারদীয় সংখ্যায় তোমার ফিল্মী হালচালের ফিচার হিড়িক ফেলে দিয়েছে। কত সব চিঠি আসছে। নেক্সট ইস্যুতে প্রত্যেকটার জবাব ছাপব। তুমি রেডি হও।

গার্গী বলল—রতনবাবু!

—বলুন!

—যা বললাম।···বলে গার্গী চলে গেল। রান্না চলছে। সে ভারি ব্যস্ত।

নলিনী চায়ে চুমুক দিয়ে অভিমান প্রকাশ করে বললেন—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। গাগু আমার লেখা পড়ে না। না পড়ুক!

এরপর নলিনী অনেকক্ষণ আনমনা হয়ে থাকলেন। রতনকুমারের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে একটা বই টেনে নিয়ে চোখ রাখল। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বেদ মীমাংসা সে বুঝতে পারল না। সে বলল—বেঙ্গলি ফিকশন নেই? আমি বিশেষ পড়িনি। পড়তে ইচ্ছে করে।

নলিনী আচমকা বললেন—অনেকদিন থেকে একটা প্রোপোজাল মাথায় ঘুরছে। বলি-বলি করে বলা হয় না।

—বলুন স্যার। রতনকুমার দর্শন বুজিয়ে রেখে সোজা হয়ে বসল।

—এই প্রেসটা। নলিনী একটু ইতস্তত করার পর বললেন, একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড প্রেস এটা। রদ্দি হয়ে গেছে। এদিকে গভর্মেণ্ট লোন বাকি। সুদ গুনতে সর্বস্বান্ত হচ্ছি। তাই ভেবেছি, লার্জ স্কেলে একটা কিছু করলে কেমন হয়? ধরো, দুজনে পার্টনারশিপ করে যদি নামি?

—কী?

—ফ্ল্যাট মেসিন সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে একটা খোঁজ পেয়েছি। হাজার চল্লিশে ঝেড়ে দেবে পার্টি।

—চল্লিশ হাজার!

—হ্যাঁ। চল্লিশ হাজার। বলে নলিনী ফের বিড়ি ধরালেন।

রতনকুমার ম্লান হাসল।—বম্বেতে থাকলে চল্লিশ কেন, লাখও আপনাকে দিতে পারতাম স্যার! এখানে আমি শর্ট অফ ফাণ্ড। খুব বেশী টাকা তো আনিনি।

নলিনী আশা-নিরাশায় দুলতে দুলতে বললেন,—আপাতত সব টাকা তো দিতে হচ্ছে না। হাফ-হাফ শেয়ারে হচ্ছে টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড। আমার শেয়ার এই ট্রেডল মেসিন এবং কিছু অন্যান্য প্রপার্টি বেচে যোগাড় করতে পারি। তুমি যদি বাকিটা ম্যানেজ করতে পারো, ব্যাস! কেল্লা ফতে। এবার তোমাকে ফিউচার প্রসপেক্টের কথাটা বলি। দিনে-দিনে গ্রামাঞ্চলে প্রেসের কাজের দরকার বাড়ছে। মহকুমা এলাকার দশটা স্কুল, সতের-আঠারোটা কো-অপারেটিভ, তার ওপর বিয়ের পদ্য। ব্লক আপিস তো হাতেই রইল। ফ্লাট মেশিনে অনেক দ্রুত বিশাল বিশাল ম্যাটার ছাপা হবে। সেই সঙ্গে পল্লীবার্তার সাইজ বাড়িয়ে দেব। আরও ইণ্টারেস্টিং স্টোরি ছাপতে শুরু করব। জেলার সব টাউনে হকারদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলব। প্রচণ্ড সেল হবে। আর সেল বাড়লেই অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট বাড়বে। এদিকে তুমি বোম্বে ফিল্ম-ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে রেগুলার যোগাযোগ করে খবরাখবর আর ছবি কালেক্ট করবে। কেমন? হই-চই পড়ে যাবে তাহলে।

বলতে বলতে উৎসাহের চোটে নলিনী বিছানায় ঠ্যাঙ তুলে বসলেন। চোখ দুটো চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বের আলোয় ঝকঝক করতে থাকল। রতনকুমার চিন্তিতমুখে বলল—ভেরি গুড আইডিয়া।

নলিনী বললেন—আরে বাবা! ক্যাপিটাল মানি তো মারাযাচ্ছে না। প্রেস তো থাকছে। তোমার বিশ হাজার আমার বিশ-হাজার।

ফের বিড়ি ধরালেন এবং সমান উদ্দীপনায় শুরু করলেন—কিছু বাড়তি খরচ অবশ্যি আছে। ওই ঘরে ফ্লাট মেসিন বসানো যাবে না। স্পেস নেই। পাশে একটা টালির বড় শেড মতো করব। দরমার বেড়ার দেয়াল হবে। এখানে ডোমেদের বললেই দরমা ডেলিভারি দেবে। দরও সস্তা। চিপ!

রতনকুমার বলল—হ্যাঁ, ভেরি চিপ—এভরিথিং!

—বরং তুমিই হবে ম্যানেজার। ওই ঘরটায় থাকবে। আবার আপিসও হবে। আপাতত দিন-মজুরীতে একজন কম্পোজিটার রাখব। তার সঙ্গে দোমো-হানীর জন্য-দুই ছোকরাকে ট্রেনিং হিসেবে নেব। অসংখ্য অসংখ্য পাওয়া যাবে। নিজের খেয়েপরে কাজ শিখতে চাইবে। ভেবো না।

—না স্যার, ভাবিনি। বাট··

নলিনী বললেন—বাট কিসের? জাস্ট টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড! আরে বাবা, তোমার সঙ্গে অত সব ক্যবেন গুড্‌স! সব অকেজো জিনিস। নয় কি? টাকা যোগাড করাব ইচ্ছে থাকলে তোমার মতো ইয়ং স্মার্ট এ্যাণ্ড ইনটেলিজেন্ট ছেলের পক্ষে সেটা এমন কিছু কঠিন নয়।

রতনকুমার একটু হেসে বলল—খুবই ভালো প্রপোজাল স্যার, দ্যাট আই এগ্রি মাচ। কিন্তু আমার কাছে তত কিছু ক্যাশ মানি নেই। ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

নলিনী চোখ নাচিয়ে বললেন—টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখতে বলেছিলাম, রেখেছ তো?

—হ্যাঁ। লোকাল ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট করেছি।

—মলো ছাই। এখানে কেন করতে গেলে? এরা মহা পাজি! বরং টাউনে করলেই পারতে!

—অশোকের এক জামাইবাবু আছেন এ ব্রাঞ্চে। তাই···

—যাগ গে। করে যখন ফেলেছ, উপায় কী! নলিনী একটু দ্বিধার পর ফের বললেন—কারেন্ট, না ফিক্সড ডিপজিট? .

—কারেন্ট। সব সময়ে টাকার দরকার হচ্ছে।

—হাউ মাচ?

—এইটিন থাউজ্যাণ্ড সেভেন হাণ্ড্রেড।

রতনকুমার সরলতা ও গর্বের সঙ্গে জানাল। অবশ্য কলকাতার একটা ব্যাঙ্কেও আসার সময় কিছু টাকা রেখে এসেছিল।

নলিনী ঠ্যাং নাচাতে থাকলেন। জানলার দিকে তাকিয়ে বললেন—

সপ্তমীর রাতটা ভারি সুন্দর ! কত কথা মনে পড়ে যায়। আমরা ছেলেবেলায় এখনকার মতো ইতরামি করতাম না। বুঝলে ? সিদ্ধিটিদ্ধি খেতাম খানিকটা। একবার হয়েছি কী……

গার্গী এসে বলল—সব রেডি। খাওয়া-দাওয়ার পাট সকাল সকাল সেরে নাও বাবা ! তারপর আমরা বসে গল্প করব।

রতনকুমার ঘড়ি দেখে বলল—মাই গুডনেস ! এখনই কী ? মোটে সাড়ে আটটা।

নলিনী বললেন—বারোটার আগে খাচ্ছি না আমরা, সে তুমি যতই বলো গাগু !

গার্গী হাসল। ঠোঁটে চিবুকে কপালে ঘামের ফোঁটা। আজ বেশ গরম পড়েছে সন্ধ্যা থেকে। ঘরে একটা নড়বড়ে সিলিং ফ্যান আছে। কিন্তু বিগড়ে গেছে কদিন থেকে। সারানোর তাগিদ নেই। কারণ এদিকটা খোলামেলা বলে প্রচুর হাওয়া আছে। রাতদুপুরে শিরশিরে ঠাণ্ডা পড়ে। চাদর ঢাকা দিয়ে শুতে হয়। গার্গী আঁচলে ঘাম স্পঞ্জ করে বলল—ঠিক আছে। তাহলে তাই কিন্তু তুমি ডিসটার্ব করবে না বলে দিচ্ছি।

নলিনী চোখ নাচিয়ে হাসলেন। ইণ্টারভিউ নিবি ? ভাল, ভাল। আমাদের রতনকুমার কিন্তু ফিল্মের হিরোই ছিল—ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট, গাগু। বেশ। তাহলে ইণ্টারভিউ নে ! তারপর বলব, তোর জার্নালিজমে প্রসপেক্ট কতখানি !

রতনকুমার গার্গীর চোখে চোখ রেখে হিরোর ভঙ্গীতে বলল—আই এ্যাম রেডি ম্যাডাম ! তারপর হেসে উঠল।

গার্গী তার সামানাসামনি নিজের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে বলল—হাসলেন যে ?

—ও কিছু না। বলুন, কী জানতে চান ?

নলিনী উঠে দাঁড়ালেন এ-সময়।—কিচেনের দরজা বন্ধ করে এসেছিস তো গাগু ?

—হ্যাঁ, তোমাকে ভাবতে হবে না।

নলিনী বললেন—বাবাজীর জীবনচরিত তো আমার জানা। আর নতুন করে শুনব কী ? বরং ততক্ষণ অঞ্চল আপিসের নোটিশটা কম্পোজ করে ফেলি।

রতনকুমার বলল—আপনার আইসাইট মার্ভেলাস !

—অভ্যাস। কতকটা আন্দাজেই হরফ তুলি। বলে নলিনী পাশের প্রেস-

ঘরে ঢুকলেন। দরজায় একটা পর্দা আছে। কেন কে জানে, আলতো হাতে সেটা টেনে আড়াল সৃষ্টি করলেন। গার্গী লক্ষ্য করল না। রতনকুমারের চোখে পড়ল। সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে।

গার্গী বলল—কী দেখছেন ওদিকে? আপনার লাইফ স্টোরি বলুন।

রতনকুমার দুষ্টু হেসে পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলল—স্যার নিশ্চয় এখন ট্রেসপাস করবেন না, কী বলেন? অনেকক্ষণ স্মোক করিনি।

গার্গী প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বলল—সেই লম্বা সিগারেটগুলো আর খান না দেখছি!

—না। ও ব্র্যাণ্ড পাচ্ছি না। অগত্যা এই।

—কেমন যেন অদ্ভুত একটা গন্ধ ছিল!

—হ্যাঁ ফরেন সিগারেট।

—আপনার সবই ফরেন।

রতনকুমার ফের হাসল।—বিকজ আই এ্যাম এ ফরেনার। ম্যায় পরদেশী হুঁ!

গার্গী বলল—থাক। খুব হয়েছে। আর ফিল্মী বুলি ঝাড়বেন না। বলুন, সন্ন্যাসীর হাতির পিছন-পিছন যাচ্ছিলেন, তারপর কী হল?...এক মিনিট। বালিশগুলো দিই। ঠেস দিয়ে বসুন।

—একদম শাহজাদাকা মাফিক!

গার্গী দু'পাশের বিছানা থেকে কয়েকটা বালিশ কুড়িয়ে রতনকুমারের পিছনে জড়ো করল। রতনকুমার ঠেস দিয়ে সিগারেট ঠোঁটে রাখল এবং চোখ বুজল।

—কই, শুরু করুন!

—সব কিছু মনে নেই। কেন যে অমন করে চলে গিয়েছিলাম, এখন বুঝতে পারি না। হয়তো আমার মধ্যে কী একটা ছিল—জাস্ট এ্যান ইমাজিনেশান! হয়তো আমার কিছু ভাল লাগত না।

গার্গী হাসল।—অর্থাৎ বাবার ভাষায় অমৃতের সন্ধানে যাত্রা!

—অমৃত? ইউ মিন ইমমর্টালিটি?

—আমার নাম গার্গী কেন, জানেন?

—কেন?

—আপনি যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর তর্কের গল্পটা জানেন না? পৌরাণিক স্টোরি।

—আমি অনেক কিছু জানি না গার্গী দেবী! স্কুল-এডুকেশন আমার সামান্য, যা কিছু শিখেছি সবই ঠেকে এবং দেখে শেখা। কিছুদিন এক ইংলিশম্যানের কাছে ছিলাম। তারপর…

—হাতি থেকে শুরু করুন না প্লীজ!

রতনকুমার হাসল।—সন্ন্যাসী প্রথম প্রথম আমাকে গাঁজার ছিলিম সাজতে বলত। পারতাম না। ব্যাটা চিমটির ঘা মেরে শেখাত। আর সেই রোগা বুড়ো হাতি! তার নাদি সাফ করিয়ে নিত। আমি তাঁর চেলা হয়ে গিয়েছিলাম। ডুমকার ওদিকে আশ্রমমতো ছিল। সেখানে গিয়ে আমাকে সে লেংটি পরাল! মাস তিনেক পরে দীক্ষা দিল। সে এক অত্যাচার! হরিব্‌ল্!

—কতদিন ছিলেন সেখানে?

—বছর তিনেক। তার মধ্যে পুরো গীতা মুখস্থ করিয়ে ছেড়েছিল।

—বাড়ির জন্যে মন-খারাপ করত না? বাবা-মায়ের জন্যে?

—সব কথা মনে নেই। হয়তো করত। কিন্তু পালিয়ে আসার উপায় ছিল না। সব সময় সাধুবাবার চেলারা চোখেচোখে রাখত। লোকগুলো ছিল ভীষণ বদমাইশ! একটুতেই মেরে বসত। শেষঅব্দি ওখান থেকে এক রাতে পালিয়ে গেলাম। রাস্তা চিনিনে। অন্ধকার রাত। জঙ্গল ছিল। অনেক কষ্টে রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটা টাউনে পৌঁছলাম। সেখানে ভোর হল। স্টেশন ছিল একটা। নাম মনে নেই। একটা ট্রেন এসে দাঁড়ালে চেপে বসলাম। ট্রেনটা হাওড়া যাচ্ছিল।

রতনকুমার চুপ করলে গার্গী বলল—তারপর?

—ওই ট্রেনেই এক মারোয়াড়ি ফ্যামিলি আমাকে পিকআপ করেন। আমার পরনে তখন বাচ্চা সাধুর ড্রেস। ওঁরা আমার প্রতি ইণ্টারেস্টেড হয়ে পড়েছিলেন।

—তারপর?

আমি বললাম, আমি সাধু হবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসি নি। ওঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। ছেলেপুলে ছিল না। বললেন—তুমি আমাদের কাছে থাকবে? লেখাপড়া শেখাব। বিজনেসে ঢুকিয়ে দেব। আমি তক্ষুনি রাজী। কলকাতায় ওঁরা এক আত্মীয়বাড়ি যাচ্ছিলেন দিল্লি থেকে। কলকাতায় পৌঁছে আমার সাধুর ড্রেস বদলানো হল। প্যাণ্ট-শার্ট পরলাম। চুল কাটলাম।

কদ্দিন পরে ওঁদের সঙ্গে বোম্বে চলে গেলাম। তারপর তো রাজকুমারের আদরে থাকি। দিস ইজ দা ফার্স্ট চ্যাপ্টার।...

—সেকেণ্ড চ্যাপ্টার বলুন !

রতনকুমার সিগারেটের টুকরো জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে বলল—আপনি কখনও বোম্বে গেছেন ?

গার্গী হাসল।—মাথা খারাপ ! আজ অব্দি কলকাতাই যাইনি।

—সে কী !

—কে নিয়ে যাবে বলুন ? আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে !

—বোম্বে ইজ এ ফাইন সিটি ! যদি আবার যাই, আপনাকে বোম্বে দেখাব। ইউ উইল এনজয় !

—যখন যাবেন, তখন যাবেন। এবার সেকেণ্ড চ্যাপ্টার শুনি !

—বললাম সব মনে নেই। দ্যাটস্ এ লং স্টোরি ! আসলে আমার মধ্যে কী একটা আছে, জানেন ? আই ফিল ইট। আই কাণ্ট কনট্রোল ইট ! ইট ইজ সামথিং লাইক এ ব্লাইণ্ড ফোর্স ! আমাকে কোথাও চুপচাপ বসে থাকতে দ্যায় নি। দিল না। সব সময় এ্যাডভেঞ্চারে নামিয়ে ছাড়ে।

গার্গী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল—আপনার লাইফে খুব এ্যাডভেঞ্চার ঘটেছে, বুঝতে পারি।

—পারেন ? রতনকুমার সোজা হয়ে বসল।

—নিশ্চয় পারি।

—কী ভাবে ?

—আপনার মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখে।

—দ্যাটস্ কারেক্ট। এখন আমি ভারি ক্লান্ত। কিছু ভাল লাগে না। সব তেতো হয়ে গেছে ! তাই ভেবেছিলাম, গাঁয়ে ফিরে যাই। কিন্তু এখানে এসে দেখি, কেউ নেই—কিচ্ছু নেই। বিলকুল ফাঁকা !

একটু হেসে গার্গী আস্তে বলল—বিয়ে করেন নি কেন ? লোকে বলে সংসার করলে নাকি শান্তি পাওয়া যায়।

রতনকুমার শুকনো হাসল।—আমার অনেক বন্ধু বিয়ে করেছিল। তারা কেউ সুখী হয়নি। আজকাল তো ডিভোর্স একটা ফ্যাশান হয়ে উঠেছে সিটিলাইফে। হাজব্যাণ্ড এ্যাণ্ড ওয়াইফের মধ্যে বিশ্বাস বলতে কিছু নেই। পাড়াগাঁয়ের কী অবস্থা আমি জানিনে।

—পাড়াগাঁয়ে তত কিছু ঘটেনি এখনও। তবে ঘটতে শুরু করবে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, টাইম ইজ দা ফ্যাক্টর।

গার্গী খিলখিল করে হাসল।—তাই বলে ইউরোপ-আমেরিকায় কি কেউ বিয়ে করছে না?

—বিয়ে ব্যাপারটাই ফার্স! ওটা তুলে দেওয়া উচিত।

—আপনি বড্ড অদ্ভুত কথাবার্তা বলেন!…বলে গার্গী নিজের নখ দেখতে থাকল। রতনকুমার জানলার বাইরে চোখ রেখেছে। গার্গী ফের বলল—অবশ্য আমিও আপনার মতে বিশ্বাসী।

রতনকুমার ঘুরে ওর দিকে তাকাল।—আপনি জানেন, কাকিমা আমার জন্যে মেয়ে ঠিক করেছে?

—ও মা! কোথায়?

—কোন গাঁয়ে। মেয়ে নাকি স্কুল-ফাইনাল পাশ। তাদের ডেয়ারি আছে। খুব বড়লোক।

—মেয়ে দেখে আসুন! দেরি করছেন কেন?

—কাকিমার সঙ্গে আমার সে নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে!

—কেন? ঝগড়ার কি আছে এতে? বিয়ে নাই বা করলেন, কনে দেখে আসুন।

রতনকুমার উত্তেজিতভাবে বলল—কী ভেবেছে আমাকে কাকিমা? কোন্ গাঁয়ের বড়লোক—তার মেয়ে! আমি গাঁয়ের বুদ্ধু বনতে ফিরে আসি নি। শি কাণ্ট ইমাজিন! বড়লোক কিংবা সুন্দরী মেয়ে বলতে ওঁর কনসেপশানই নেই! আবার বলে কী জানেন? তাহলে বোম্বাই থেকে মেমসাহেব বিয়ে করে আনো—আমরা দেখি! ফুলিশ উওম্যান! সে জানে না, ইচ্ছে করলে মিলিওনারের মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারতাম! আমার সে-হিম্মৎ ছিল। আপনি তো জানেন, ফিল্মওয়ার্ল্ডে কী সব হয়!

গার্গী মাথা নেড়ে বলল—জানি না। বলুন না, কী হয়?

—মানি এ্যাণ্ড……

গার্গী গ্রাম্য মেয়ের লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—আপনি অভিনয় ছাড়লেন কেন?

—তেমন স্কোপ পেলাম কই? প্যাট্রনাইজেশনের অভাব। তাছাড়া এত স্ট্রাগল আর বরদাস্ত হল না। ওদিকে আমার এক্সপার্টের কারবারে ক্ষতি

হচ্ছিল। পার্টনার ভদ্রলোক এক পার্শী। খুব দিলদরিয়া মানুষ। জাস্ট লাইক এ ফিলোজফার! সত্যি বলছি। মহতাবজীর নানা ব্যাপারে জ্ঞান দেখলে আপনার তাজ্জব লাগবে। এমন দেশ নেই, যেখানে যান নি! এমন টেকনিক্যাল ব্যাপার নেই, যা উনি জানেন না। আমাকে ছোট ভাইয়ের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন!

—তাঁকে ছেড়ে চলে এলেন যে!

রতনকুমার একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল—সী-বিচে একদিন বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে সেই ভূত জেগে উঠল। মনে হল, কী খামোকা এখানে পড়ে আছি। চারপাশে খালি চোর-জুয়াচোর-স্মাগলার-হিপোক্রিট-দালাল-শয়তানের ভিড়! এ্যাণ্ড দা প্রসটিচ্যুটস। দা ব্লাডি হেল!

গার্গী সহানুভূতির স্বরে বলল—কিন্তু এখানে ফিরেও হয়তো শান্তি পান নি? বাবা-মা নেই। পরিবেশও বিশ্রী। এখানেও নোংরা লোকের ভিড়। সত্যি, পৃথিবীটা কেমন যেন। অথচ আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, অন্য কোথাও নিশ্চয় সুখশান্তি আছে—মানুষজনও ভাল। আসলে এ সেই—'নদীর এপার কহে' কবিতাটার ব্যাপার।

—স্যার, আমাকে একটা প্রোপোজাল দিলেন একটু আগে।···বলে রতনকুমার ফের সিগারেট ধরল।

গার্গী ঘুরে প্রেসঘরের দিকটা দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল—বাবার অদ্ভুত খেয়াল মাথায় চাপে! আপনি বাবাকে একটু এ্যাভয়েড করে চলবেন।

রতনকুমার অবাক হয়ে বলল—আপনি বলছেন!

—বলছি। গার্গীর ঠোঁটের কোণে দৃঢ়তা ফুটে উঠল। বাবা এই প্রেস নিয়ে স্বপ্ন দেখেন। এই পাড়াগাঁয়ে প্রেসের যুগ আসতে অনেক দেরি, কিছুতেই মানতে চান না। আপনি জানেন? ওই প্রেস আর পত্রিকার পেছনে বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন! মায়ের অত সব গয়নাগাঁটি আর একটুও নেই। কখন বেচে ফেলেছেন। ভাবেন, আমি কিছু টের পাইনে। আমাকে বলেন, সেফটির জন্য ব্যাঙ্কের লকারে রেখেছি। কিন্তু সব মিথ্যা।

রতনকুমার ভাবতে ভাবতে বলল—বরং টাউনে গিয়ে প্রেস করলে বোধ হয় সুবিধে হত! বলব?

গার্গী আবার প্রেসের দরজাটা দেখে নিয়ে ঝুঁকে গেল এবং ফিসফিস করে বলল—প্লীজ! আপনি ওঁকে উৎসাহ দেবেন না। এবং পয়সাকড়িও দেবেন না যেন।

—বাট আই এ্যাসিওরড হিম!

গার্গী ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর চোখ নামাল। আস্তে ভারি গলায় বলল—বেশ। যা খুশি করুন আপনারা। কিন্তু দেখবেন, আমি কবে আপনার মতো বেপাত্তা হয়ে গেছি! কেউ খুঁজে পাবে না আমাকে।

রতনকুমার ঝুঁকে গেল।—সে কী! কেন?

গার্গী মুখ ঘুরিয়ে বলল – আমার খুশি।

—গার্গী দেবী!

গার্গী আত্মসম্বরণ করে ঘুরে বসল। একটু হাসল আবার। বলল—থাক ওসব কথা। আপনার লাইফ-স্টোরি শুনতে চেয়েছিলাম। খেই হারিয়ে গেল।

—থাক। আরেকদিন বলব।

রতনকুমার সিগারেট টানতে থাকল। জানলার বাইরে দৃষ্টি। সপ্তমীর চাঁদ অস্ত গেছে। হাল্কা অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে আনাচেকানাচে। বাঁদিকে দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় একজন মাতালকে দাঁড়িয়ে ঢুলতে দেখা যাচ্ছে। প্রগতি প্রেসের দরজার মাথায় আলোটা কখন নলিনী নিভিয়ে দিয়েছেন। ফুল-বাগিচায় অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। শুধু জানলার সামনে কিছু জায়গায় ঘরের আলো গিয়ে পড়েছে। সেখানে জবা ফুলের ঝোপ। রতনকুমার ফুল দেখতে থাকল।

গার্গী চুপ। আড়চোখে রতনকুমারকে দেখছে।

কতক্ষণ পরে নলিনীর সাড়া এল প্রেস ঘর থেকে।—গাগু রে!

—যাই বাবা।

—কটা বাজল ছাখ। বরং এবার খেয়ে নিলে হত!

—দিচ্ছি। তুমি এস্।

গার্গী বেরিয়ে গেল। তারপর হাতে কালি নিয়ে নলিনী ঘরে উঁকি মেরে বললেন—ছুটো ম্যাটার কম্পোজ হয়ে গেল। বসো, হাত ধুয়ে আসি।

রতনকুমার গার্গীর কথা ভাবছিল। গার্গীর মধ্যে কী যেন ভাল লাগার ব্যাপার আছে। প্রথম দিকে যতটা তাচ্ছিল্য করেছিল, এখন ততটাই আগ্রহ জাগছে। গার্গীর গ্ল্যামার নেই। তবু কী টান!

॥ এগারো ॥

শৈলবালার চরম সিদ্ধান্ত

শৈলবালা কোমরে আঁচল জড়িয়ে গোয়ালঘরের পেছনের দেয়ালে গোবর চাপড়ি দিচ্ছে, জে এল আর ও দিবাকর বলল—কী শৈল কাকী! এখনও তোমাকে ঘুঁটে দিতে হচ্ছে কেন?

শৈলের হাতে একতাল গোবর। কোনমতে ঘোমটা টেনে মৃদু স্বরে বলল—দিবু কবে এলে আবার?

—কাল সন্ধ্যাবেলা। বলে দিবাকর চোখ নাচাল। আমি কী বললাম, জবাব দিলে না শৈলকাকী?

শৈল গম্ভীর হয়ে বলল—কপাল বাবা। ঘুঁটে দেওয়া কপাল করে জন্মেছি।

দিবাকর বলল—তোমার ভাসুরপো কপাল বদলাতে পারল না দেখছি!

শৈল এক পা এগিয়ে চাপা গলায় বলল—আজই তোমার বাবার কাছে যাব ভাবছিলাম দিবু। ভালই হল, তুমি এসে গেছ।

—কী ব্যাপার?

শৈল এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলল—এদানীং আমার কেমন যেন মন্দ হচ্ছে বাবা! আমি তো ভাসুরপোকে কখনও দেখিনি। পাড়ার সবাই বলল বলে বাড়ী ঢুকিয়েছিলাম। এদানীং কেমন যেন আমার গা বাজছে!

দিবাকর কৌতূহলী হয়ে বলল—কেন কেন?

শৈল বলল—বললাম যখন, গোড়া থেকেই বলি। শিবু চক্কোত্তি সেদিন বলল, ওরে শৈল! ভুল করে কোন ফেরারী আসামীকে বাড়ীতে ঢোকাসনি তো? ও নিশ্চয়ই বোম্বাইয়ের এক ঠগ। ঠগবাজী করে পালিয়ে এসেছে। কবে না পুলিশ গিয়ে হামলা করে। তখন ছানাপোনাসুদ্ধু তোকেও জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বে।

দিবাকর গুম হয়ে গেল। তারপর বলল—হ্যাঁ, শিবুদা আমাকেও বলেছিল। দারোগাবাবুর কাছে শিবুদা শুনেছেন, ওর ওপর নজর রাখা হয়েছে। তাছাড়া বাইরেও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

শৈল বলল—তাহলে তো বড্ড ভয়ের কথা দিবু!

—তা তো বটেই।

—আমি মেয়েমানুষ। কীই বা বুঝি? এদানীং খালি মনে হচ্ছে, ছেলেটা যদি সত্যি সত্যি সেই ফটিক হয়, তাহলে বংশ আর জাত-কুটুম্বের কিছু না কিছু আচার-আচরণ তো ফুটে বেরুবে। বাবা দিবু, খেতে-শুতে উঠতে-বসতে তেমন কিস্‌সু দেখিনি। তার ওপর, এতকাল পরে ফিরে এলি বাপ-পিতেমোর ভিটেয়? কত বড় বড় কথা বলতো। ঘরদোর করবি। টিউবকল বসাবি। হেন করবি, তেন করবি। কিন্তু আজ একমাসের ওপর হ'ল, সেদিকে আর লক্ষ্য নেই। খালি নোলে ভটচাযের বাড়ী। তার সঙ্গে গুজুর-গাজুর ফুসুর-ফাসুর। তার মেয়ের সঙ্গেই বা কী ভাব। বলি তুই যদি ফটিকই হোস, কোন্ আক্কেলে ওই মেয়ের চোখে চোখ রেখে কথা বলিস? ওই মেয়ে আমাকে জুতো মারতে এসেছিল!

শৈলের এই দীর্ঘ অভিমান ও সংশয়-ক্লিষ্ট সংলাপ শোনার পর দিবাকর একটু হেসে বলল—সবাই জানে নোলে ভটচায ওর টাকাগুলো বাগাতে ব্যস্ত। যাক গে, আমার কথা হ'ল—তুমি সাবধান হও কাকী!

শৈল প্রায় ভেঙে পড়ল। করুণ মুখে বলল—কীভাবে সাবধান হব বাবা, বলে দাও!

—ওকে বলো, ওই একখানা ঘরে থাকার অসুবিধে হচ্ছে। তুমি বাবার ভিটেয় ঘর বানাও। যতদিন তা না হচ্ছে, বাজারে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকো গে! সোজা বলে দাও। ব্যস। বলে দিবাকর হনহন করে চলে গেল দোমোহানী বাজারের দিকে।

শৈলবালা হাতে গোবর নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তারপর ফোঁস করে একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে আবার দ্রুত চাপড়ি দিতে থাকল।

শৈলবালার মাথায় সংশয় শুধু শিবু চক্কোত্তি ঢুকিয়েছিল তা ঠিক নয়। এ সংশয় তার মনে ক্রমশ আপনাআপনি দানা বাঁধছিল। এর প্রকৃত সূত্রপাত, রতনকুমার নোলে ভটচাযের কাগজের জন্যে পাঁচশো টাকা দিয়েছে শুনে! কই, শৈল কতবার ঠারেঠোরে বলেছে—আরও দু'একটা গরুমোষ থাকলে সংসারে সচ্ছলতা আসত, রতনকুমার তার বেলা তো কান করেনি। এমন কী, শৈল মুখ ফুটে বলেছে একদিন—হারু ঘোষ একটা দুধেল মোষ বেচতে চাইছে। মাত্র

পাঁচশো টাকা দাম। তখনও রতনকুমার চুপ করে থেকেছে। ওদিকে কাকা কেষ্টপদর কথা তো ভুলেও আর তোলে না।

তার চাইতে সাংঘাতিক কথা, চপলার সঙ্গে মাখামাখি। দেশমাতানী বেবুশ্যের সঙ্গে ওর কিসের অত মাখামাখি? পাড়ার লোকের ইতিমধ্যে ব্যাপারটা চোখে পড়েছে। সত্যিমিথ্যে শৈল জানে না, ওরা নাকি মাঝে মাঝে টাউনে গিয়ে একসঙ্গে সিনেমা দেখে আসে। কারা স্বচক্ষে দেখে এসেছে নাকি।

শৈল সতীকন্যা। চপলার ছায়া মাড়ায় না পর্যন্ত। সেই চপলা একদিন দুপুরবেলা এসে রতনকুমারের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে কথার বান ডাকাল। শৈল ছিল রান্নাঘরে। রাগে ফুঁসছিল। চপলা বেরিয়ে গেলে সে ফেটে পড়েছিল। তবে চ্যাচামেচিটা চপলার বিরুদ্ধেই হ'ল। রতনকুমারকে সাবধানে তফাতে রেখেই। কিন্তু আশ্চর্য, রতনকুমার একটা কথাও বলল না। জোরে গান বাজিয়ে শুনতে থাকল। হাতে ইংরেজী বই। ঠোঁটে সিগারেট।

এসব ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে শৈলবালার। এ কী উটকো আপদ এসে জুটেছে তার সংসারে! রক্ষে করো বাবা, টাকা-পয়সা চাইনে। জামা-কাপড়ে কোনকালে লোভ ছিল না। মোটা ভাত মোটা কাপড়েই খুশি। মনে সেই সুখ কোথায় শৈলর যে ভোগ-আহ্লাদ নিয়ে মাতবে? পাগল মানুষ স্বামী। শুধু ছেলেপুলের মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে থাকা আর সংসার করা। অথচ সেই সংসারে এখন যেন অনবরত ভূমিকম্প হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে রতনকুমারের জিনিসপত্রে পা ঠেকলে শৈল গজগজ করে।— দেব সব লাথি মেরে ভেঙে। রাখবার জায়গা নেই, এত সব উপদ্রব জুড়ে বসেছে। কী কাজে লাগবে এসব?

রতনকুমার বুদ্ধিমান। সে টের পেয়েছে, শৈলকাকিমার সংসারের তাল কেটে গেছে তার আবির্ভাবে। তাকে এখানে মানাচ্ছে না। আর, তারও এই পরিবেশ আর সহ্য হচ্ছে না। এভাবে কতদিন থাকা যায়—অন্ধকার জানলা-বিহীন ঘরে তার দামী জিনিসপত্র আর বারান্দায় তক্তাপোষে তার বিছানা! ধুলো-কাদা-মাটির মধ্যে এসে পড়ে তার শরীরে যেমন, তেমনি মনেও ক্রমশ একটা খসখসে ময়লার স্তর জমে উঠেছে। আর কী প্রচণ্ড নৈঃশব্দ! সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে বসে আছে যেন। এই নৈঃশব্দ তার গা চাটতে শুরু করলে সে দ্রুত বেরিয়ে যায়। বাজারে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই সতু হাজরার চায়ের দোকান,

নয়তো অশোকদের বাড়ী কিছুক্ষণ আড্ডা। কদাচিৎ শহরে গিয়ে ঘোরাঘুরি। তারপর প্রগতি প্রেসে গিয়ে স্যারের বক্তৃতা শোনা। অসহ্য। একটা কিছু করা দরকার। একটা প্রচণ্ড উত্তেজক কিছু চাই-ই।

কিন্তু শৈলের পক্ষে এসব বোঝা সম্ভব নয়। দিবাকরের কথাটা তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। শিবু চক্কোত্তির ডেয়ারিতে আবার দুধ দেওয়া শুরু করল শৈল। রতনকুমার দেখল সব। কিন্তু কিছু বলল না।

এর পর এক বিকেলে ঘুম থেকে উঠে রতনকুমার বেরুবে বলে তৈরী হচ্ছে। চপলা রঙীন শাড়ী-জামা পরে এবং মুখে স্নো-পাওডার, কপালে লাল টিপ নিয়ে শৈলবালার উঠোনে যৌবনের ঝিলিক তুলল।—কই গো বোম্বাইকা বাবু! বলে সেই লাস্যময়ী যুবতী অপরূপ ছাদে দাঁড়াল।

কার্তিকের হলুদ রোদ এখন হাল্কা গোলাপী হয়ে ঘোষের ডাঙাকে ঘিরে ধরেছে। শৈলের চোখ জ্বলে যাচ্ছিল। সে মুখ ফিরিয়ে একটা পেতলের সরায় মেয়েকে মুড়ি খেতে দিল। চপলা বলল—ও কাকী, বোম্বাইকা বাবুকে বলো না, সব্বাইকে টাউনে বই দেখিয়ে আনবে! খুব ভাল বই হচ্ছে কাকী, ঠাকুর-দেবতার বই।

শৈল জবাব দিল না। রতনকুমার বলল—তুমি যাচ্ছ বুঝি?

চপলা বলল—হুঁ। তোমাদেরও ডাকতে এলাম। চলে এস।

রতনকুমার বলল—আমার কাজ আছে। তোমরা যাও! কাকিমা, যাবে নাকি?

শৈল সোজা হয়ে দাঁড়াল। বিকৃত মুখে বলল—আমার অত রঙ লাগেনি!

চপলা বলল—রঙ কী গো! ঠাকুর-দেবতার বই!

শৈল ঝাঁঝালো স্বরে বলল—খুব ঠাকুর-দেবতা চিনেছিস রে চপলা! এ্যা? তা ভাল করেছিস। ধর্মে মতি হয়েছে দেখছি। খুব ভাল কথা।

আহত যুবতী বলল—কাকীর কথাগুলো কেমন বাঁকা-বাঁকা আজকাল! কে কত সতী, সবাই জানে!

—কী বললি? শৈল রুখে দাঁড়াল।

চপলা ভুরু কুঁচকে ব'লল—বলছি ঘোষের ডাঙার কে কত সতী, সবাই জানে!

অমনি শৈল রান্নাঘরের দাওয়া থেকে একটা কাটারি তুলে নিয়ে চড়া গলায় বলল—বেরো! বেরো বলছি হতচ্ছাড়ী! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

চপলা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—শুনছ, শুনছ তো বোম্বাইকা বাবু, তোমার কাকিমার বুলি ?

রতনকুমার বিব্রত হয়ে বলল—আঃ ! কী হচ্ছে সব !

শৈল কাটারি তুলে চেঁচাল—বেরোলি ? মুণ্ডু ঝুলিয়ে দেব এক কোপে ! শৈলকে চেনো না ?

চপলা ঝটপট বেরিয়ে গেল। তারপর শৈল পড়ল রতনকুমারকে নিয়ে।—এই ভালমানুষের ছেলে ! তুমি ফটিক হও আর যেহ্ হও বাবা, পষ্টাপষ্টি বলছি—ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করি। এ্যাদ্দিন যা সয়েছি সয়েছি। আর সইব না।

রতনকুমার ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—কী সয়েছ কাকিমা ?

শৈল কাটারি চালের বাতায় গুঁজে রেখে চড়া গলায় বলল—এ্যাদ্দিন কিছু বলিনি। এবার বলছি। তোমার টাকা-পয়সার দরকার নেই, জামা-কাপড়ও চাইনে। আমার বাড়ীতে বসে এই কেলেঙ্কারি চলবে না। ইচ্ছে হলে বাজারে গিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকো। যা খুশি করো। আমি দেখতে যাব না।

রতনকুমার চটে গেল।—ঘর ভাড়া করে থাকব মানে ? এ বাড়ীতে আমার অধিকার নেই ?

শৈল নির্বিকার মুখে বলল -মুখে বললেই তো হলো না। পেমাণ ? পেমাণ দাও, দিয়ে বাবার জায়গা দখল করো। গাঁয়ের পাঁচজনকে ডাকো।

রতনকুমার হতবাক। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল—ঠিক আছে।

সে হনহন করে বেরিয়ে গেল। শৈলবালা গেরস্থালীর এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে বেড়াল। অকারণ হুশ-হাশ শব্দ করে কাক তাড়াল। গোয়ালঘরে গেল। তারপর ফিরে এসে উঠোনে দাঁড়াল। কাজটা ঠিক হল, না ভুল হল, ভাবতে থাকল।

একটু পরে মনে হল, ঠিকই করেছে সে। দিনের পর দিন আড়ষ্ট জীবন-যাপন আর সহ্য হয় না। বেশ তো ছিল এতদিন ! নিজের ইচ্ছেমতো থেকেছে। এখন যেন মাথার ওপর উটকো মুরুব্বী। অতএব আপদ যাক।…

॥ বারো ॥

রতনকুমারের নতুন সংসার

দোমোহানীর কপালীচরণ দূর গাঁয়ের বরজ থেকে পান কিনে আনত এবং মাথায় ঝুড়ি নিয়ে বেচে বেড়াতো। হাটবারের কথা আলাদা। রাস্তার ধারে ছিল তার কুঁড়েঘর। দাওয়াটা ছিল যথেষ্ট উঁচু। হাটবারে সেখানে সে পান আর চুনের ভাঁড় নিয়ে বসত। অন্যান্য দিন সেই শূন্য দাওয়ায় অবসরভোগী কুকুর আর দু-একটি ছাগল আড্ডা দিত। পরে দোমোহানীতে বাজার গড়ে উঠল। তখন কপালীর কুঁড়েঘরও বদলে গেল। চিরকুমার কপালী দু'কামরা ইঁটের দালান তুলল একতলা। তার পলেস্তারা হতে আরও কয়েকটা বছর গড়িয়ে যায়। রাস্তার ধারের ঘরটায় তার পাইকারী পানের কারবার হয়েছে। আর সে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে গাঁওয়ালে যায় না। পেছনের ঘরটায় সে শোয় এবং রান্না করে। তার জিনিসপত্র খুব সামান্যই। শোনা যায় পাশের ঘরটা বউ দিয়ে ভরে তোলার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শেষ অব্দি কপালীর কপালে বউ জোটেনি—কিংবা নিজেরই অনিচ্ছা। তাছাড়া সে এখন বুড়ো হয়ে গেছে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। মাথায় লম্বা চুল রেখেছে। বাহুতে ও কপাল জুড়ে রসকলি কাটে গঙ্গা-মৃত্তিকায়। এবং এই পবিত্র জিনিসটি বাসের ড্রাইভাররা তাকে সরবরাহ করে।

অশোকের বাবা মাঝে মাঝে বাড়তি মালপত্র কপালীর পাশের ঘরে রাখে। গুদোম ঘরটা ছোট্ট। তাই এই ব্যবস্থা। অতএব অশোক কপালীকে রাজী করাল। রতনকুমার থাকবে। মাসে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। ফেলনা রেট নয়। কপালীর আবার টাকার লোভ বড্ড বেশী।

রতনকুমার ঘর দেখে খুশি। পেছনের দিকটা বেশ নিরিবিলি। একটা পুকুর আছে। ঝোপজঙ্গল আছে। একটুকরো খোলামেলা উঠোন আছে। উঠোনে গার্ডেনিং করলে কপালীর আপত্তি নেই। রতনকুমার ঘরটা চমৎকার সাজাল। হাল্কা ফার্নিচার আনল শহর থেকে। কিছু ফোটো, ক্যালেণ্ডার, ফুলদানি রাখল। তার রুচি দেখে অশোকদের তাক লেগে যায়। কত অল্পে কত সুন্দর সাজানো যায়।

নোলে ভটচায তাঁর বাগান থেকে একগোছা রজনীগন্ধা দিয়ে গেলেন। ব্যস্ত মানুষ। হাতে সারাক্ষণ কালি মাখা। মাথায় ম্যাটার ঠাসা। ফাঁক পেলেই

আসেন। এ্যাশট্রে বোঝাই করে দেন বিড়ির টুকরোতে। তাই বলে সিগারেট খেতে নারাজ। স্বদেশী বাতিক নয়, অভ্যেস।

অশোক তাপস, বিদ্যুৎ আর মনু—এই চার যুবক শেষ অব্দি যারা রতনকুমারের সঙ্গ ছাড়েনি, এই ঘরে সারাক্ষণ আড্ডা দেয়। গীটার বাজে। তবলা বাজে। ব্যাঞ্জো বাজে। গান গায়। কেউ-কেউ রাতটাও রতনকুমারের বিছানায় কাটিয়ে যায়। ঘরে সুগন্ধ মউমউ করে। রতনকুমারের সেণ্টটার দাম নাকি সত্তর ডলার—পাঁচশো টাকারও বেশি! কিন্তু স্কচের বাকি বোতলটাও শেষ। রতনকুমার চোলাইয়ে রাজী নয়। মাঝে মাঝে শহর থেকে জিন আনে। লাইম দিয়ে খায়। ফিল্মী ডায়লগে মধ্যরাতের ঘর তোলপাড় হয়। শান্ত নিঃঝুম মানুষ কপালীচরণ ওপাশের ঘরে বিরক্ত হয়ে ভাবে—এ যে ভূতের কেত্তন ডেকে আনলাম বাবা! কবে না মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে ছাড়ে!

না ঢুকলেও দোমোহানী জুড়ে গুজব ছড়াতে দেরি হচ্ছে না অবশ্য। নেহাত বাজারজায়গা, গ্রামের ভেতর দিকটায় নয়, তাই বিশেষ গা নেই মাথা-মুরুব্বীদের। তবে এখানে-সেখানে তুমুল আলোচনা চলে। 'এটাই ট্রাডিশান—যা সমানে চলিতেছে। (নোঃ ভঃ দ্রঃ) লোকেরা একটা আলোচনার যোগ্য বিষয় খোঁজে সব সভায়। এখানে আলোচনাযোগ্য বিষয় দুই প্রকার : বহির্বিশ্ব এবং অভ্যন্তরীণ। (পুনশ্চ নোঃ ভঃ দ্রঃ পল্লীবার্তার সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় : 'কেন-অহেতুক জল্পনা?')লোকেরা বলাবলি করে—নোলে ভটচায এখন কলম বন্ধ করেছে কেন? টাকা খেয়ে তো? নাকের ডগায় কেলেঙ্কারি চলেছে। এমন কী, কেউ কেউ নাকি দেখেছেও—স্বয়ং ভটচাযের মেয়েও যাতায়াত করে-টরে। অলুর বোন কুনাই ছোকরার ঘর করছে। ভটচাযের মেয়ে শীতল গয়লার বউমা হোক। এই সব প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম তরলা পানওয়ালী। সে কপালীর কাছে পান কিনতে আসে।

কিছু কথা কানে আসে রতনকুমারের। গ্রাহ্য করে না। নীল ডায়ামণ্ড ভরাট গলায় 'চিরকালের উজ্জ্বল রৌদ্রের' বার্তা ঘোষণা করে তার টেপরেকর্ডারে। সব তুচ্ছ হয়ে যায়। ওয়েস্টার্ন পপ মিউজিক দোমোহানীর বাজার, গ্রাম্য ভিড়, যানবাহন, এচোঁড়েপাকা যুবক-যুবতীদের সঙের পুতুলে পরিণত করে। এতেই আনন্দ রতনকুমারের।

সে নগ্ন লাল সিমেণ্টের মেঝের দিকে তাকিয়ে শিগ্‌গির একটা কার্পেট

আনবে ভাবে। এখন তার ঘরের দিকে মন। শহরে গেলেই দামী পুতুল কিনে আনে। ওই শহরে কার্পেটের দোকান নেই।

আর কার্পেটের কথা ভাবলেই তার মনটা কেমন করে ওঠে। কিছু মনে পড়ে যায়। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে থাকে। সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ায়। কিছুক্ষণের জন্য সব উদ্দেশ্যহীন আর শূন্য লাগে। তারপর চোখের কোণা দিয়ে যেন দেখতে পায়, পশ্চিমে আরব সাগরের ওপর থেকে উড়ন্ত একটুকরো নীল কার্পেট এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে দোমোহানীর দিকে। ঘুরে সোজা তাকালেই সবুজ দেয়ালে বাধা। ওপারে আটকে থাকা লাল কার্পেট ঝড়ে টুকরো হচ্ছে। শীতের বুড়ী পা টিপে টিপে এগিয়ে এসেছে। নখে ছিঁড়ে কুচি-কুচি করছে। ফাইবারের ঝাঁক কুয়াশায় মিশে যাচ্ছে। নীল কুয়াশা সারা রাত ধরে লাল হতে হতে ভোরের আলোয় মিশে গেল।

একটি বিনিদ্র রাতের অবসান হ'ল। রতনকুমার রাতের ডোরাকাটা নাইট-গাউন্ পরে দাঁত ব্রাশ করে উঠোনে। পুকুরঘাটে কপালীচরণ রাধামাধবকে তারস্বরে ডাকাডাকি করছে। মুখ ধুয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ খোল নিয়ে বসবে। নাম-গান করে চা-ফা খাবে।

রতনকুমার গায়ে শীতের পোশাক চড়িয়ে বিকেলে হাইওয়েতে কিছুক্ষণ ঘুরে আসে। প্রগতি প্রেসেও যায়। গার্গীর সঙ্গে কথা বলে। নোলে ভটচায পরের সংখ্যা নিয়ে ব্যস্ত। টুলে বসে কম্পোজ করেন। নাকের ডগায় ষাট পাওয়ারের বাল্ব ঝোলে। গার্গী রতনকুমারকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। নলিনী আড়চোখে দেখেন মাত্র। মাথায় ফ্ল্যাট মেসিনের জব্বর আওয়াজ।

কিন্তু চপলা কোথায় গেল? রতনকুমার মুখ ফুটে কাকেও জিগ্যেস করতে পারে না। চপলা কি ঘোষের ডাঙা ছেড়ে চলে গেছে? তার কোনো পাত্তা নেই। চপলার কথা কেউ তো বলে না। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে পড়ে রতনকুমারের। একটা ব্যার্থতাবোধ কাঁটার মতো ফোটে। কত গ্ল্যামার-গার্ল তার দেখা হয়ে গেছে, এ এক গাঁওকী নাদান লড়কী। তাকে বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ল মেয়েটা।

এক বিকেলে রতনকুমার হাইওয়েতে বেরিয়েছে। সঙ্গে আজ শুধু অশোক আছে। মাঠের দিকটায় উত্তরের হাওয়ার খুব দাপট। অসহ্য লাগছিল বলে তারা ফিরে আসছে। শিবু চক্কোত্তির ফার্মের কাছে এসে হঠাৎ রতনকুমার দেখল, চপলা বাংলোমতো ঘরটার বারান্দায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং শিবু বেতের চেয়ারে বসে আছে। দু'জনে হেসে-হেসে কথা বলছে।

দেখা মাত্র অদ্ভুত ঈর্ষায় জ্বলে উঠল রতনকুমার। থমকে দাঁড়াল। অশোক বলল—কী হ'ল রতনদা? আলেকজাণ্ডারকে দেখছেন নাকি?

আলেকজাণ্ডার অন্য পাশে আটচালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। রতনকুমার বলল—ওই মেয়েটা কে অশোক? দিবুদার খুড়তুতো বোন না?

অশোক দেখে নিয়ে হাসল।—হ্যাঁ, চপলা। শিবুদার সঙ্গে বরাবর ওর ভাব জানেন না?

—না।

সবাই জানে। দিবুদাও জানে।......অশোক চোখ নাচিয়ে অশালীন ভঙ্গীতে ফের বলল—দুধ বেচতে আসে শিবু চক্কোত্তিকে।

রতনকুমার খুব গম্ভীর হয়ে গেল। বাকি পথ কোনো কথা বলল না। প্রগতি প্রেসের কাছে এসে সে দেখল, গার্গী বারান্দায় বসে আছে। হাতে বই।

রতনকুমার বলল—অশোক, তুমি চাবি নিয়ে যাও। ঘর খুলে বসো গে। স্যারের সঙ্গে একটু কথা আছে।

অশোক চাবি নিয়ে চলে গেল। রতনকুমার গেটের কাছে গেলে গার্গী মুখ তুলে হাসল।—আসুন রতনদা!

গার্গী আজকাল রতনদা বলে। রতনকুমার বারান্দায় উঠে বলল—স্যার নেই?

—আপনার স্যার গেছেন শহরে টাইপ আনতে।

রতনকুমার একটু ইতস্তত করে বলল -ঠিক আছে। ফিরে এলে বলবেন, এসেছিলাম। চলি!

গার্গী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—একটু বসুন না। এখনই এসে যাবেন বাবা। সাতটার মধ্যেই।

রতনকুমার ঘড়ি দেখল।

—আপনি এখনও বোম্বেওয়ালা থেকে গেলেন দেখছি! দোমোহানীতে সময় খুব লম্বা জানেন না? ঘড়ির কাঁটা নড়েই না। আসুন। ভেতরে গিয়ে বসি।

অগত্যা রতনকুমার তার পিছন পিছন ভেতরের ঘরে গিয়ে ঢোকে। ওকে বসতে বলে গার্গী প্রেস-ঘরে-গিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করতে বেশ খানিকটা সময় নিল। প্রেস-ঘর খোলা রাখা ঠিক নয়। সব সময় চোর বেড়াচ্ছে

আনাচে-কানাচে। এদিকে বাবা এসে পড়লে বন্ধ ঘরের মধ্যে রতনকুমারকে দেখে কী ভাববেন, সেও সমস্যা। কিন্তু শেষ অব্দি ঠোঁটের কোণায় দৃঢ়তার রেখা ফুটে উঠল গার্গীর। সে দরজা বন্ধ করে হাসিমুখে ভেতরের ঘরে এল। রতনকুমার স্যারের বিছানায় পা ঝুলিয়ে জানলার পাশে বসেছে।

সে বলল—কিছু ফুল নিয়ে যাব। দেবেন তো?

—যত খুশি নিন না। বলে গার্গী কেরোসিন কুকার জ্বালতে ব্যস্ত হ'ল।

রতনকুমার বলল—ও কী হচ্ছে?

—অতিথি সৎকার। অর্থাৎ নিছক চা।

—থাক্। এখন চা খাবো না। স্যার আসুন। একসঙ্গে হবে।

গার্গী নিবৃত্ত হ'ল। আসলে তার শরীরে কাঁপুনি চলছে। সেটা সামলাতে একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত হতে চাইছিল। ঝোঁকের বশে এভাবে ওকে ডেকে এনে বিব্রত বোধ করছিল সে।

রতনকুমার বলল—আপনি আর আমার ওখানে গেলেন না! জাস্ট সেই একদিন।

গার্গী একটু তফাতে নিজের বিছানায় বসে বলল—যাব। আপনার গায়ের পুলওভারটা কি কেনা—না কেউ বুনে দিয়েছে?

রতনকুমার পুলওভারটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—স্রেফ কেনা। কে বুনে দেবে অভাগাকে?

—উল দেবেন। বুনে দেব।

—থ্যাংকস্।

—কবে?

—দেব'খন?

—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আমি চমৎকার বুনতে পারি কিন্তু।

—নিশ্চয় পারেন। আমি অবিশ্বাস করছিনে।

দুজনে চুপচাপ কয়েক মিনিট কাটল। কথা খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ। কিন্তু গার্গীর নিজের ঘর এটা। ফলে সে স্মার্টনেস ফিরে পেল। বলল—আপনার কাকিমার সঙ্গে দেখা হয় না আর?

রতনকুমার বাঁকা ঠোঁটে বলল—নাঃ! ঘোষের ডাঙায় আমি যাচ্ছি নে আর। দ্যাট আই ক্যান অ্যাসিওর।

—পৈতৃক ভিটেতে এক বাড়ি করলেই পারতেন।

—প্রথম তাই ভেবেছিলাম। এখন ওটা এ্যাবসার্ড লাগে।

—কেন ?

রতনকুমার বিষণ্ণ হেসে বলল—জবাব জানা নেই। সরি !

গার্গী একটু চুপ করে থেকে বলল—বুঝতে পারছি। আপনি ওই পরিবেশে থাকতে পারবেন না। মানিয়ে নেওয়া খুব কঠিন হবে। অবশ্য দোমোহানী এরিয়ায় হয়তো খানিকটা এ্যাডজাস্ট করে চলতে পারবেন।

রতনকুমার মাথা দোলাল—পারছিনে, বিলিভ মি গার্গী দেবী !

গার্গী হাসল্।—আপনি এখনও ফিল্মী কায়দা ছাড়তে পারলেন না। দেবী-টেবী কেন ?

—কী বলব ?

—শুধু গার্গী বা গাগুও বলতে পারেন। গার্গীর সঙ্গে দেবী বড্ড আর্টিফিসিয়্যাল লাগে।

রতনকুমার হঠাৎ জোরে হেসে উঠল।—আমার তাহলে তুমি বলতে ইচ্ছে করবে। অশোকের বোনদের আমি প্রথম প্রথম আপনি বলতাম। এখন তুমি, কখনও তুইও বলে ফেলি।

গার্গী উৎসাহ দেখিয়ে বলল—নিশ্চয় বলবেন। আমার তুইতেও আপত্তি নেই।

রতনকুমার মাথা দুলিয়ে বলল—ও নো নো ! নেভার। এতটা নয়। ইউ আর এ্যান এ্যাকমপ্লিশ্‌ড গার্ল ! রিয়্যালি এডুকেটেড ! আমি অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, জানেন তো ? অনেকে ছিল মিলিওনারের মেয়ে। জাস্ট ফান্সি ডলস্ ! স্মার্ট এ্যাণ্ড গ্ল্যামারাস। অলওয়েজ ফ্লার্টিং……

গার্গী থামাল।—থামুন ! আবার মাথাটা গোলমাল করে দেবেন। আমি অত বেশী ইংরেজী বুঝিনে। হাঁফ ধরে যায়।

—আশা করি, আমি কোনো অভদ্রতা করিনি !

গার্গী খিলখিল করে হেসে বলল— ওঃ ! আপনাকে নিয়ে পারা যায় না। কেন ? সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে কথা বলতে পারেন না ? সব সময় মনে হয় যেন অভিনয় করছেন ফিল্মে !

রতনকুমার বলল—আমারও কিন্তু ঠিক তাই মনে হচ্ছে এখানে এসে। এদেশে প্রত্যেকে যেন সব সময় অনেক কথা গোপন রেখে কিছু কথা বলছে।

চেপে যাচ্ছে আসল কথটা, যা বলছে তা এ্যাডিশন্যাল ডায়ালগ। ঠিক বোঝাতে পারছিনে আপনাকে। এখানকার লোকেরা সাফ-বাত করতে জানে না।

গার্গী তর্কের ভঙ্গীতে বলল—মোটেও না। গ্রামের লোকেরা সরল। স্পষ্ট-ভাষী।

রতনকুমার সোজা হয়ে বসল।—ইমপসিবল! দুঃখিত গার্গী, মানতে পারছিনে।

—পারছেন না? কারণ বাবা আপনার মাথাটি খেয়েছেন।

—হাউ ইজ ছাট? ক্যায়সে, বাতাইয়ে!

—বাবার মতে, গ্রামের লোকেরা মোটেও সরল নয়। হাড়ে হাড়ে কুচক্রী, মিসচিভাস্।

—ছাটস্ কারেক্ট।

—এবার একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, জানেন? হয়তো শহরের লোক এবং গ্রামের লোকের প্রকাশভঙ্গী—মানে মোড অফ এক্সপ্রেশান্ একেবারে আলাদা!

—আই এগ্রি। সার্টেনলি।

—ব্যস, তাহলে আর তর্ক নেই। আমি হার মানলাম।

রতনকুমার মিষ্টি হেসে বলল—আপনি খুব সহজে হার মানেন, গার্গী!

গার্গী এ কথায় কেন কে জানে, রাঙা হয়ে মুখ ঘোরাল। বাইরে সূর্যাস্তের পর ধূসর আলো কুয়াসায় নীল হতে হতে কোথাও কোথাও কালচে হয়ে উঠেছে। সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।—এই রে! আপনি ফুল নেবেন বললেন।' অন্ধকার হয়ে গেল যে! আসছি।

রতনকুমার আপত্তি জানাল না। গার্গী বেরুবার সময় সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

প্রেসের ঘরের আলোটাও সে জ্বালিয়ে দিল এবং বারান্দাতেও আলো জ্বলল। তারপর রতনকুমার জানলায় ঝুঁকে দেখল, গার্গী বাগিচায় ঢুকেছে।

রতনকুমার সিগারেট ধরাল। খুব সাবধানে সে ভাবল, গার্গী কি তাকে ভালবাসে কিংবা সে গার্গীকে? বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ রতনকুমারের মনে পড়ল, গিরি নামে এক বদমাস ওই শরীরে দাঁত বসাতে যাচ্ছিল একদিন। গার্গীর শরীরটার কথা ভেবে তার কষ্ট হল। ওই হাল্কা নম্র শান্ত শরীর!

গিরিকে স্ট্যাব করার ইচ্ছায় হাত নিসপিস করে উঠল। থমথমে মুখ, নাসা-

রক্ত স্ফীত, কপালে ভাঁজ, কুঞ্চিত ভুরু নিয়ে রতনকুমার গুম হয়ে বসে রইল।

একটু পরে গার্গী একরাশ রঙবেরঙের ফুল আর পাতা নিয়ে ঢুকল। বলল—এক মিনিট। সাজিয়ে দিচ্ছি। বড় ফুলদানি আছে তো ?

রতনকুমার জবাব দিল না দেখে সে তার মুখের দিকে তাকাল।—রতনদা!

—উঁ ?

—কী ব্যাপার ?

—নাথিং! বলে হাসবার চেষ্টা করল রতনকুমার। ফুলগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল—হাউ লাভলি!

গার্গী বসল এবং ফুলগুলো সাজাতে সাজাতে বলল—মাঝে মাঝে হঠাৎ আপনি কেমন যেন হয়ে পড়েন। কেন ?

—নাথিং মিস্‌ট্রিয়াস! জাস্ট···, ইট ইজ জাস্ট এ মুড!

—মুডি লোকেরা কিন্তু ডেঞ্জারাস্ হয়!

—তাই বুঝি ?

—হুঁউ। সেজন্যে······

গার্গী কাজ করতে করতে কথা বলছে এবং দৃষ্টি ফুলের দিকেই। রতনকুমার আগ্রহ নিয়ে বলল—সেজন্যে ? কী—বলুন ?

গার্গী তোড়াটা বুকের কাছে ধরে তাকের দিকে এগোল। কৌটো থেকে গুলিসুতো বের করে ডগাটা কামড়ে বলল—সেজন্যে আপনাকে আমার ভয় করে।

—ভয়! কিসের ভয় ?

—কে জানে!

রতনকুমার ক্ষুব্ধ হয়ে বলল—এ্যাম আই দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল গিরি ?

চমকে উঠল গার্গী। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বলল—ছিঃ রতনদা!

রতনকুমার উঠে দাঁড়াল।—আমি চলি গার্গী।

—ব্যস! রাগ হয়ে গেছে ? সাধে কি বললাম মুড লোকেরা ডেঞ্জারাস ?

রতনকুমার পা বাড়ালে গার্গী সামনে দাঁড়াল। কিন্তু সে কাঁপছিল। রতনকুমার সংযত হয়ে বলল—না, আমি রাগ করিনি। স্যার এখনও এলেন না। অশোক বেচারী আমার জন্য ওয়েট করছে বাসায়। এখন আসি গার্গী।

গার্গী কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল—ফুলগুলো!

—দাও, নিচ্ছি।

ওর হাত থেকে তোড়াটা নিয়ে রতনকুমার যথার্থ হিরোর ভঙ্গীতে ওর মুখের দিকে তাকাল। একটা হঠকারী আবেগ এসেছিল। ঠোঁট কামড়ে সেটা সামলে নিল। তারপর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

গার্গী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ঘরে। দৃষ্টি নীচমুখ। তার বুক কাঁপছে। উরু দুটো প্রচণ্ড ভারি হয়ে গেছে। কী একটা দুর্ঘটনার মুখ থেকে যেন বেঁচে গেল। একটা জোরালো নিঃশ্বাস পড়ল তার।

বাইরে নোলে ভটচাযের গলা শোনা গেল তক্ষুনি।

গার্গী মুহূর্তে হতচকিত হয়ে পড়ল। দ্রুত সে বইপত্তর টেনে নামাল বিছানায় এবং পড়ার ভঙ্গীত বসে পড়ল। তার মধ্যে এখন এক নিতান্ত গ্রাম্য বালিকা এসে পড়েছে।

গেটের কাছে স্যারের সঙ্গে দেখা। স্যার রতনকুমারের হাতে ফুলের তোড়া দেখে কেমন চোখে তাকিয়েছেন। তারপর দ্রুত দৃষ্টিকে সংযত করেছেন।—এই যে বাবাজী! কতক্ষণ? ফেরো, ফেরো! অনেক কথা আছে। মেসিনটার ফাইন্যাল করে এলাম আজ।

রতনকুমার বলল—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আপনার। তারপর কী করি, ফ্লাওয়ার ভাসের কথা ভেবে····

বাক্য অসমাপ্ত রেখে সে ফুলগুলোর দিকে তাকাল। নলিনীর মনে ইতিমধ্যে নানা সংশয় জেগেছে। ওরে নোলে! তুই অন্যের কেচ্ছা ছাপাস। এখন কি তোর ঘরের কেচ্ছা অন্যেরা ছাপাবে? ছ্যা ছ্যা, জেনে-শুনে বিষ করেছি পান। মুখে বললেন—ভাল করেছ। ভাল করেছ। গাগুকে বললেই আরও তুলে দিত।

—উনিই তুলে দিলেন।

—বাঃ! তা ইয়ে, কথা হচ্ছে—ভেরি ইমপরট্যান্ট টক আছে, বাবা। আজ ফাইন্যাল রফা করে এলাম। টু-থার্ড পেমেণ্ট দিলেই ডেলিভারি। বাকিটা দু কিস্তিতে এক বছরেই শোধ করতে হবে। আটত্রিশ হাজারে রফা হয়েছে। মেসিন একেবারে গ্র্যাণ্ড! আনকোরা। অভাবে পড়ে বেচে দিচ্ছে।

রতনকুমার অন্যমনস্ক। এক কথায় বলল—অলরাইট। কাল মর্নিংয়ে বসব। নমস্কার স্যার!

সে হনহন করে চলে গেল।

এতেই আঁতকে উঠলেন নলিনী। কেমন অস্বাভিক দেখাচ্ছিল যেন শীতু ঘোষের পোকে। কিছু বদমাইসী করে গেল না তো ? ঠিক আছে। তা যদি করে, আগে টাকাটা বাগিয়ে নিয়ে পরে গিরিকে লাগিয়ে দেবেন পেছনে। একেবারে বোম্বেতে ভাগিয়ে দিয়ে আসবে।

খোলা জানলার দিকে তাকাতে তাকাতে নলিনী আড়ষ্ট পায়ে বাড়ী ঢুকলেন।

গার্গীর দিকে তাকিয়ে তেমন কিছু মনে হল না। বিছানাপত্তর নিভাঁজ। ঘরে কোনো গণ্ডগোল নেই। তবু একটু কেসে বললেন—ফটিক এসেছিল ?

—হুঁ। অপেক্ষা করে চলে গেল।

—ফুলগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে দেখলাম।......বলে নলিনী জামা-কাপড় ছাড়তে বারান্দায় গেলেন। রাগে বুকের ভেতরটা গরগর করছে। কী করবেন, বুঝতে পারছেন না।......

॥ তেরো ॥

চপলার চমক

দিনকতক কেরোসিন কুকারে নিজেই রান্না করে খেয়েছে রতনকুমার। অশোকরা সাহায্য করেছে। পরে ব্যাপারটা ঝামেলা বলে ছেড়ে দিয়েছে। বাস-স্ট্যাণ্ডের ওখানে নিধুবাবুর হোটেল আছে। দূরগামী বাসের যাত্রীরা সেখানে খেয়ে যায়। নীলা কাফেতে ভাতের ব্যবস্থা নেই। থাকলে নিধুবাবুর অন্নপূর্ণা হোটেলে কেউ খেত না। যা নোংরা !

রতনকুমার প্রথম দিন গিয়ে কষ্টে খেয়েছিল। তারপর থেকে টিফিন কেরিয়ারে তার ঘরেই খাবার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে। রান্নাও তেমনি যাচ্ছেতাই। রতনকুমার একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিল এবার। নিছক খাওয়াদাওয়া যে এমন বিব্রত করতে পারে মানুষকে, সে ভাবতে পারেনি। সারাজীবন ভাগ্যগুণে সে পরাশ্রিত থেকেছে। কখনও একেবারে পথে নামতে হয়নি তাকে। তাছাড়া বড় শহরে থাকার ফলে নিজের রান্নার প্রশ্নই ওঠে না। হোটেল আছে। কাপড়-চোপড় কাচাবার লণ্ড্রি আছে। শহরজীবনে এসবের কোন ঝামেলা নেই। দোমোহানীতে লণ্ড্রী আছে কিন্তু ভালো হোটেল নেই। তাই ঝামেলা।

অশোক টের পেয়েছিল নিধুবাবুর হোটেলের রান্না তাদের হিরোর সইছে

না। টিফিন কেরিয়ারে তিন ভাগই অভুক্ত থাকে। উঠোনে ঢেলে দিলে রাজ্যের কুকুর এসে কোলাহল করে খায়। এর ফলে হিরোর চেহারার সে-জেল্লাও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। যথার্থ চামচার মতো অশোক হিরোর জন্যে ব্যথিত হয়েছিল।

এরপর একটা বৈঠক বসল এবং পরদিন এক বুড়ীকে নিয়ে এল চামচারা। বুড়ীর গায়ের রঙ টুকটুকে ফর্সা। ফোকলা মুখে অসংখ্য পান চোষে এবং পাতলা ঠোঁট দু'খানি সব সময় রাঙা। কষ গড়িয়ে রাঙা রস পড়ে। তাছাড়া কানে কম শোনে। আপাতদৃষ্টে এই দুটো দোষ।

বুড়ীর নাম লক্ষ্মীরাণী। পাশের গাঁয়ে দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়-বাড়ি ছিল। সে মেয়েজামাইয়ের সঙ্গে শহরে কাটিয়েছে বহুকাল। তারপর মেয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে চলে এসেছে গাঁয়ে। এসেই কষ্টে পড়েছে।

রতনকুমার তাকে দিদিমা বলে ডাকল। রান্নাবান্নার হাত ভালই। তার একটা থাকার জায়গাও চাই। রতনকুমার সরল মনে বলল—দিদিমা এ ঘরেও শুতে পার! এনাফ স্পেস্।

এতে মন্তু আপত্তি করে জনান্তিকে বলল—রতনদা, ডোণ্ট ডু ছ্যাট।

চামচারা ক্রমশ ইংরেজী বলতে শুরু করেছে। কখনও হিন্দীও চালিয়ে দেয়। সংসর্গজাত ব্যাপার। বিদ্যুৎ ফিসফিস করে বলল—আগে কিছুদিন একজামিন করে দেখুন, রিলায়েবল নাকি।

রতনকুমার বলল—তাহলে বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা করা যায়।

লক্ষ্মীবুড়ী দরজার বাইরে ছোট্ট বারান্দায় বসে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছিল আর পান চুষছিল। পরনের সাদা থানে অজস্র লাল ছোপ। অশোক বলল—শীতে মরে যাবে দিদিমা!

তাপস বলল—এক কাজ করা যায়। বারান্দার খানিকটা দরমা দিয়ে ঘিরলেই প্রব্লেম সলভড।

রতনকুমার ভুরু কুঁচকে চিন্তাকুল মুখে বলল—হোয়াটস্ ছ্যাট?

—বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি। ওই যে! বিদ্যুৎ ওপাশে একটা দোকানের পেছনটা দেখিয়ে দিল।

বুদ্ধিমান রতনকুমার একটু হেসে বলল—এগেন এ লট অফ মানি! কিঁউ কী, জাড়কা কাপড়া-উপড়া—আই মিন, কম্বল-উম্বল ভি দেনে পড়েগা!

—না না। অশোক আপত্তি করে বলল। দিদিমার বেডিং-ফেডিং নিশ্চয়

আছে। এ্যাদ্দিন শুত কী ভাবে? বলে সে বুড়ীর দিকে ঝুঁকে গলা চড়িয়ে বলল —দিদিমা তোমার বিছানাপত্তর আনতে হবে।

লক্ষীবুড়ী জোরে মাথা দোলাল।

অশোক চেঁচিয়ে বলল—সে কি! বিছানা নেই?

বুড়ী একগাল হেসে বলল—সব মেয়ে কেড়ে নিয়েছে। খালি একখানা চাদর লুকিয়ে এনেছিলাম। এই দেখ না বাবারা!

যেন পেটের ভেতর থেকে সে একটা রঙীন সুতী চাদর বের করে দেখাল। ওদের হাসির ধুম পড়ে গেল। রতনকুমারও খুব হাসল। এমন মজার ব্যাপার এখানে আসা অব্দি সে দেখেনি—এমন প্রাণখুলে হাসতে পারেনি।

এর ফলে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসল—অলরাইট দিদিমা! শোচো মাৎ।

মন্নু বলল—ও দিদিমা! দফরপুরে শুতে কিসে তাহলে?

লক্ষীবুড়ী বলল—সে কষ্টের কথা বোলো না বাবারা! প্রথম রাত্তিরে তো কাঁথা দিল। তারপর……

অধীর রতনকুমার বলল—অল রাইট, অল রাইট। সব হয়ে যাবে। আগে দেখি, কেমন রান্না করো।

বুড়ী তাকে আকর্ষণ করেছিল। রতনকুমারের বরাবর এই অভ্যাস। যাকে মনে ধরে, তার জন্যে জান লড়িয়ে দেয়।

কিন্তু সত্যি বুড়ী রাঁধে ভাল। সে-বেলা মাংস হ'ল। বুড়ী একগাল হেসে বলল, চার-পাঁচ রকম মাংসরান্না আমি জানি বাবারা। যা ফরমান হবে, করে দেব। তবে মাইনে লাগবে তিরিশ টাকা আর খাওয়া-পরা। তার কমে পারব না বলে দিচ্ছি!

আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। রতনকুমার তাতে নারাজ নয়।

বিকেলের মধ্যেই ডোমেরা এসে দরমা দিয়ে গেল। সন্ধ্যা আসতে না-আসতে বারান্দার একপাশে ছোট্ট একটা ঘর হয়ে গেল রাঁধুনীর। কপালীচরণ এসে কোমরে হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব দেখে গেল। তার আপত্তির কারণ ছিল না।

আর বাজারের ধুনুরীদের কাছে গিয়ে রতনকুমার লেপ-তোষক-বালিশ কিনে আনল। একটা তাঁতের চাদরও কিনল।

বুড়ী কয়লার উনুনের পক্ষপাতী। অতএব সেই উনুন, ঘুঁটে, কয়লা আনা হ'ল। এবারে রতনকুমারের সত্যিকার একটা সংসার হয়ে গেল। চামচাদের

মতে—বাকি রইল একটা বউ। রতনকুমার হেসে বলল—দেখা যাক। এক্সপেরিমেণ্ট তো হোল-লাইফ করে যাচ্ছি।

অনেক রাতে বুড়ী বসেছে পান সাজতে দরজার ওপাশে। তার পুঁটুলিতে একটা পানের বাটাও ছিল। রতনকুমার মাথার কাছে বেতের গোলটেবিলে কেরোসিন বাতির আলোয় অনেকবার পড়া থ্রিলারে চোখ রাখবে এবার। নয়তো ঘুম আসবে না। এ ঘরে বিদ্যুৎ নেই। শিগগির লাইন নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সে।. কিপটে কপালীচরণ তা থেকে একটা বাল্বের ভাগ নেবে বলে তৈরী। রতনকুমার দরজা বন্ধ করবে বলে বুড়ীর উদ্দেশে বলল—দিদিমা, তোমার ল্যাম্প নেভালে কেন?

একটা লম্ফ কিনে দিয়েছে ওকে। সেটা জ্বেলে বুড়ী দিব্যি পান সাজতে পারে। কিন্তু নিবিয়ে রেখেছে। আবছা আলোয় অভ্যেসে পান সাজছে। সে একটু হেসে বলল—একটা কথা শুধোই ভাই!

দিদিমা বলায় সে রতনকুমারকে এখন ভাই বলছে। রতনকুমার বলল—কী কথা?

—তুমি কোন্ দেশের লোক?

রতনকুমার একটু বিরক্ত হয়ে বলল—কেন?

বুড়ী অনায়াস দক্ষতায় জাঁতিতে সুপুরি কুচোতে কুচোতে বলল—তোমার কথাবার্তা এখানকার লোকের মত না। তাই বলছি।

রতনকুমার একটু ভেবে বলল—আমি বোম্বের লোক।

—তাই বলো! নৈলে এমন বড়মানুষী চালচলন এমন বোলচাল হবে কেন? বুড়ী তারিফ করে বলল। তা ভাই দোমোহানীতে ব্যবসা করতে আসা হয়েছে বুঝি? কী ব্যবসা করবে ভাবছ?

—এখনও কিছু ভাবিনি!

—এ্যাঁ?

রতনকুমার জোরে বলল—কিছু ভাবিনি। তুমি শুয়ে পড়ো। দশটা বাজছে!

বুড়ী আপনমনে বলল—টাউনে আমরা এগারোটার আগে শুতাম না। শুয়েও তো ঘুম নেই।

—আমি শোব যে!

—শোবে বলছ?

—হ্যাঁ।

বুড়ী ঘোলাটে চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর একটু হেসে বলল—অনেক কথা জানতে ইচ্ছে করছিল, ভাই। তুমি বোম্বাইয়ের লোক কি না?' তাই।

—কী কথা?

—হ্যাঁ ভাই, বোম্বাই বড় না কলকাতা বড়?

—কলকাতা গেছ তুমি?

—হু উঁ। একবার বুড় মেয়ের কাছে শ্যামবাজারে তিন মাস থেকে এলাম।

—চলে এলে কেন?

—এলাম। ভাল লাগল না।······একটু চুপ করে থাকার পর ফের বুড়ী বলল—বড় জামাই মেকানিক। বড় সংসার। ছোট জামাই বহরমপুরে থাকে। কালেক্টরিতে বেয়ারার কাজ করে। লোক খুব ভাল, ভাই। তবে মেয়ে খুব ঝগড়াটে। পেটের মেয়ে হলে কী হবে! এ বয়সে ভোগান্তি ছিল।

রতনকুমার উঠে দাঁড়াল।—তোমার ভাবনা নেই, দিদিমা। আমার কাছে থাকো।

—তুমি খুব ভাল ছেলে। দেখেই বুঝেছি।

—বেশ। এবার শুয়ে পড়ো, কেমন?

—শুই।······বুড়ী পানের বাটা গোছাতে গোছাতে বলল। যদি বোম্বাই চলে যাও, দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

—জরুর! বলে রতনকুমার বাইরে আসে।

শীতের রাতে কুয়াসা মেশানো জ্যোৎস্না পড়েছে। রতনকুমার উঠোনের কোণায় দাঁড়িয়ে জল ত্যাগ করে। এই এক সমস্যা। বাথরুম নেই। ল্যাট্রিন নেই। ঘোষের ডাঙায় সে প্রথম কিছুদিন খুব মুশকিলে পড়েছিল। ল্যাট্রিনে বসে জাজ শুনতে শুনতে জৈবকর্ম সেরে নেওয়ার অভ্যাস কতকাল। তেঁতুলতলায় ঢিবির আড়ালে ব্যাপারটা ভারি কঠিন। তবে ক্রমশ মানিয়ে নিয়েছে।

হিমে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল রতনকুমার। অবাক লাগল, এই একই চাঁদ আরব সাগরের জলে জ্যোৎস্না ছড়ায়।

—এই বোম্বাইকা বাবু!

কে ফিসফিস করে তাকে ডাকতেই রতনকুমার ঘুরল। উঠোনের শেষ দিকটায় ভাঙাচোরা মাটির পাঁচিলের ওপাশে ঝোপঝাড়ে ঢাকা পুকুরপাড়।

পুকুরটা ঘোষের ডাঙা অব্দি লম্বা হয়ে এগিয়েছে। শেষ দিকটায় ঘোষের ডাঙার ঘাট।

পাঁচিলের ওপর দিয়ে চপলা পরীমূর্তির মতো যেন শূন্য ভেসে এল। তারপর উঠোনে নেমে মুখোমুখি দাঁড়াল।

রতনকুমার ভারি গলায় বলল—কী?

চপলা ফুঁসে উঠল—কী মানে? সেধে এসেছি বলে?

রতনকুমার একটু ঘুরে বারান্দাটা দেখে নিল। লক্ষ্মীবুড়ী কোটরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না রতনকুমার।

চপলা এক পা এগিয়ে তার পেটে আঙুলের খোঁচা মেরে বলল—বোম্বাইকা বাবু মুচ্ছো গেল নাকি? জল দেব মাথায়?

রতনকুমার একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে বলল—ঘরে এস।

—অত শস্তা! বললেই ঘরে যাব?

—তাহলে এলে কেন?

—আমার খুশি।

—ঠিক আছে।......বলে রতনকুমার ঘুরে পা বাড়াল।

চপলা ফের তার পাঁজরে আঙুলের খোঁচা মেরে বলল—একেবারে সাধু-সন্ন্যোসী! মাছ-মাংস খায় না! শোন, একটা কথা বলতে এলাম।

—কী কথা?

—তুমি শিগ্‌গির চলে যাও দোমোহানী ছেড়ে।

—চলে যাব? তার মানে?

—তোমাকে সাবধান করতে এলাম। শোনা না শোনা তোমার ইচ্ছে।

রতনকুমার ফুঁসে উঠল—যাও জী! হাম ভাগনেবালা আদমি নেহী!

—চুপ! চেঁচিও না। কথা শোন আগে। তোমার ভালর জন্তেই বলছি।

—কী বলতে চাও তুমি?

চপলা এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখার পর বলল—তোমার ঘরেই যাই। আমার পোড়া কপাল! ভাবলাম এক, হ'ল আরেক। তবে সাবধান বোম্বাইকা বাবু, খারাপ মতলব কোরো না। চেঁচাব বলে দিচ্ছি।

রতনকুমার ঘরে ঢোকার আগেই সে হাল্কা পায়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বুড়ী লেপের ভেতর থেকে বলল—হ্যাঁ ভাই! শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

রতনকুমার ঘরে ঢুকে দেখল চপলা টেবিল বাতির দম কমিয়ে দিয়েছে। বিছানার কোণায় পা ঝুলিয়ে বসেছে। ঠোঁটের কোণায় কী একটা হাসি। রতনকুমারের বুক কেঁপে উঠল। হঠাৎ মনে হ'ল, এটা ট্র্যাপ নয় তো?

চপলা ফিসফিস করে বলল—দরজা বন্ধ করো না। এক্ষুনি চলে যাব।

রতনকুমার রাগ দেখিয়ে বলল—নেহী জী!

বাইরে থেকে বুড়ী বলল—কে কথা বলছে গো? এত রাতে কে জ্বালাতে এল?

রতনকুমার জবাব দিল অশোক।

বুড়ী গজগজ করে উঠল—ছেলেগুলোর যেন শীত নেই বাবা! রাতবিরেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

রতনকুমার ধমক দিয়ে বলল—চুপসে শুত্ যাও তো দিদিমা! খালি বকবক।

তারপর বুড়ী নীরব হলে সে চাপা গলায় বলল—হঁ্যা, বাতাও।

খোট্টাই বুলি ছাড়ো! চপলা ঘরের ভেতরটা দেখতে দেখতে বলল, বাঃ, খুব সুন্দর করে সাজিয়েছ দেখছি! যেমন পাখি, তেমনি বাসা নাহলে কি মানায়? কিন্তু তোমার কপাল বোম্বাইকা বাবু, এ সুখ তোমার ভাগ্যে হয়তো নেই।

—কেন নেই?

—অমন রাগ করে তাকিও না।

অগত্যা রতনকুমার হাসল। বলল—ঠিক আছে। কী বলতে চাও বলো।

—তুমি নোলে ভটচাযকে টাকা দেবে বলে দাওনি?

রতনকুমার অবাক হয়ে বলল—দিইনি মানে, ভাবতে আরও সময় চেয়েছি। কেন?

—নোলেবাবু তোমার নামে যা-তা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। শিবু চক্কোত্তি, দিবাকরদা, আরও সব লোকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। তোমার চামচারা বলেনি কিছু?

রতনকুমার মাথা দোলাল।

—তোমার নামে পিটিশন করবে। সই করাবে। তুমি আসার পর নাকি চুরি-ডাকাতি বেড়ে গেছে এ তল্লাটে।

রতনকুমার নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না।

গিরির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল তোমার?

—না। কেন?

—তাহলে গিরি চটল কেন তোমার ওপর?

—ছোড়ো জী! কত মস্তান দেখে এলাম।

—শোন, এ তোমার বোম্বাই না। দোমোহানী।

—ঠিক হ্যায়। সো হোয়াট?

—বুলি ছাড়ো! তুমি শিগ্‌গির চলে যাও।

দুঃখে হাসল রতনকুমার। কোথায় যাব?

—বোম্বাই।

—হুঁ, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো?

—নিয়ে যাবে আমাকে, যদি যেতে চাই?

—ফিল্মে নামবে বুঝি?

—ভ্যাট্! এমনি যাব। ঘুরে বেড়াব তোমার সঙ্গে। আমি কি ফেলনা মেয়ে?

রতনকুমার হাসল আবার।—স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু তুমি তো একজনের বউ? তোমাকে নিয়ে গেলে এলোপ করার—আই মিন, অন্যের বউ ভাগিয়ে নেওয়ার চার্জে পড়ব। তুমি ডিভোর্স নাও আগে। তারপর দেখা যাবে।

চপলা কী বুঝল কে জানে, সে হঠাৎ ঝুঁকে বালিশ ও চাদর শুঁকতে থাকল। তারপর চোখে ঝিলিক তুলে বলল—সেণ্ট ছড়িয়ে রেখেছ?

রতনকুমারের শরীর গরগর করে উঠেছে। কিন্তু সংশয় তাকে আড়ষ্ট করেছে। খালি ভাবছে, এ একটা ট্র্যাপ কি না। এমন ট্র্যাপে একবার পড়েছিল সে। ব্ল্যাকমেলারদের পাল্লায় পড়ার ঝামেলা সে টের পেয়েছে। কিন্তু চপলার মুখে তেমন কোন ধূর্ততার আভাস সে লক্ষ্য করছে না।

একটুখানি দোনামনার পর সে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে চপলার একটা হাত নিল। চপলা বাধা দিল না। মুখ তুলে তাকাল শুধু।

রতনকুমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—আমার ভীষণ একা লাগে। তুমি থাকবে কিছুক্ষণ?

—এই তো আছি।

রতনকুমার তাকে আকর্ষণ করে বলল—না, এমন নয়। আরও কাছাকাছি চাই তোমাকে।

চপলা ওকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।—আমি কি এত সস্তা

বোম্বাইকা বাবু? আমাকে অত সহজে পাওয়া যায় না। নেহাৎ স্বজাতির ছেলে বলে সাবধান করতে এসেছিলাম।

রতনকুমার অপমানিত বোধ করল। গুম হয়ে বলল—ঠিক আছে। তুমি যাও।

—যাবোই তো! যেচে কেউ থাকতে আসে না বোম্বাইকা বাবু!

—আসত। যদি আমি শিবু চক্কোত্তি হতাম।

—কী বললে?

—কিছু না। তুমি যাও।

—হিংসে হচ্ছে বুঝি? বাঁকা হাসল চপলা। আমার কপাল!

—গেট আউট! অস্ফুটস্বরে গর্জন করল রতনকুমার।

চপলা শক্তভাবে দাঁড়িয়ে হিসহিস করে বলল—আমি যেতে না চাইলে বের করে দাও না দেখি, কত গায়ের জোর তোমার। এই আমি দাঁড়ালাম।

রতনকুমার তাকাল। এতক্ষণে ভয় পেল মেয়েটাকে।

—কী? দাও বের করে?

রতনকুমার সিগারেট বের করল কাঁপা-কাঁপা হাতে। দেশলাই জেলে ধরিয়ে ধোঁয়ার রিঙ পাকাতে থাকল।

—পারবে না বোম্বাইকা বাবু? এই তোমার মুরোদ?

রতনকুমার চুপ। জীবনে অজস্র স্মার্ট গ্ল্যামার গার্ল সে ট্যাকল করেছে। কিন্তু এ মেয়ে অন্য রকম।

চপলা কোমরে এক হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সোজা। ঠোঁটে বাঁকা হাসি। ভুরু কোঁচকানো। আবছা আলোয় তার মুখটা ধু-ধু জ্বলে যাচ্ছে যেন। ফের হিসহিস করে উঠল—কী গো!

রতনকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ঠিক আছে। তুমি দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যাচ্ছি।

চপলা নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ল।—ব্যস্! থাক বাবা, এই শীতের রাতে নিমুনি ধরাতে যেতে হবে না। তোমার ঘর, তুমিই থাকো। আমি যাই!

বলেই সে হাল্কা পায়ে বেরিয়ে গেল। উঠোনের জ্যোৎস্নায় চঞ্চল একটা আবছায়া মিলিয়ে গেল—ডুবে গেল কুয়াসার মধ্যে। রতনকুমার দ্রুত দরজা বন্ধ করল। দরজায় পিঠ রেখে সে ঘুরল। ঘরটা তাকে গিলে খাবার জন্যে হাঁ করেছে।

॥ চৌদ্দ ॥

নোলে ভটচাযের দুর্বিপাক

নোলে ভটচায গুরুতর গণ্ডগোলে পড়েছেন। শুনলে লোকেরা হাসবে। তাই বলেন না। গার্গী শোনে, কম্পোজ করতে-করতে বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছেন কাকে। কখনও ধমক দিচ্ছেন। গার্গী উঁকি মেরে জিগ্যেস করলে নলিনী হেসে জবাব দেন—ওই চন্দ্রবিন্দু। খালি কেস টপ্‌কে পালাবার তালে আছে! বাবার রসিকতা বিবিধ। গার্গীর শুনে শুনে সয়ে গেছে। আর তার হাসি পায় না। কিন্তু এবার তার মনে হয়, বাবা এতদিনে বুড়ো হয়ে গেলেন।

নলিনীর কিছুদিন থেকে বড্ড ভুল হচ্ছে। প্রুফ দেখতে বসে চক্ষু ছানাবড়া হয়। একেবারে হযবরল লাইনকে লাইন। অসমান স্পেস। বুক কাঁপে। তাহলে কি এতদিনে বার্ধক্য এসে গেল? খোপ থেকে আকার একার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দুরা ঝাঁকে ঝাঁকে শূন্যে ভেসে বেড়ায়। ধমকালে আবার খোপে এসে বসে। কখনও চোখের কোণা দিয়ে দেখতে পান, সাঁৎ সাঁৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে কারা। মানুষের মতো লম্বা হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ এ ঐ ও ঔ। চোখ টনটন করে। মুখ ঘুরিয়ে তাকালে সোজা দরজার বাইরে শীতের গোলাপ। তখন মনটা ভাল হয়। বিড়ি টানেন। হাত আড়ষ্ট। সাদা দাড়ি আর নাকের ডগায় কালি। এ কালি নির্দোষ নয়, তা জানেন। এর মধ্যে মারাত্মক বিষ আছে। বুক কেঁপে ওঠে।

রাতে লিখতে বসে নলিনী ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েকে দেখে নেন। মনে অভিমান গরগর করে ওঠে। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস, গার্গীই কলকাঠি নেড়ে সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছে। ঘোষের পো বলেছিল, সকালে বসবে। তারপর কী একটা ঘটল, ক্রমাগত টালবাহানা করে যাচ্ছে। কলকাতার কোন ব্যাঙ্কে নাকি টাকা রেখে এসেছে—সেই এ্যাকাউন্ট আর ট্রান্সফারই হচ্ছে না! আমি কি হামবাগ? নলিনী চূড়ান্ত খচে গেছেন। পাতার পর পাতা সম্পাদকীয় লিখে রেখেছেন। নিজের কলমের জোর দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এগুলো চরম সময়ে ঝাড়বেন। পুজোর পর পাক্ষিক পল্লীবার্তা বার তিনেক বেরিয়েছে। গত সংখ্যা নেহাৎ দু' পৃষ্ঠা। একটুকরো বিজ্ঞাপন নেই। কিন্তু খবর আছে। ইদানীং চুরি-চামারি বেড়েছে। ছিনতাই হচ্ছে দিনদুপুরে। ধানকাটা নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছে। ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করেছে জনাপাঁচেক। নলিনী সম্পাদকীয়টা

লেখেন সাধুভাষায়। গত সংখ্যায় আর্ধেক ম্যাটার সম্পাদকীয়। তার শিরোনাম : 'বিপুল ধ্বংসের স্রোতে'। সে এক গেল-গেল রব বলা যায়।

কত সব কল্পনা করেছিলেন। শীতু ঘোষের ছেলে সেই কল্পনার পিদীমে যথেষ্ট তেল ঢেলেছিল। তেলটা বেশিই হয়ে গেছে। দপ করে নিভে গেছে। নলিনীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া তো একেই বলে! আসলে এটা রক্তের ব্যাপার। কালচার, দেশপ্রেম, আদর্শবাদ এসবের ব্যাটা বোঝেই বা কী? ইংরিজী বুলি ঝাড়লেই হয় না। এ হ'ল ফ্যামিলিগত ট্রাডিশন। শীতু ঘোষের পো'র সে ট্রাডিশন কোথায়? হুঁঃ, বোম্বে তো সবাই যায়। নসরত হাজিও মাঝে মাঝে বোম্বে গিয়ে থাকে। সেখানে তার নাকি দোস্ত আছে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে স্মাগলিং! এই ফটিকচন্দ্রও তাই। প্রথমে কারুর সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায়, তাই কিন্তু সঠিক। নলিনীর অভিজ্ঞতা তাই বলে।

তাছাড়া ব্যাপারটা হয়েছে বাঁদরের হাতে মুক্তোর ছড়া! অতগুলো টাকা ছোকরা মস্তানী করে ওড়াচ্ছে বা ওড়াবে। এদিকে সৎ কাজের জন্মে মাথা ভেঙে একটা পয়সা পাওয়া যায় না! ওই টাকাগুলো······উঃ, কী বিরাট ব্যাপার ঘটাতে পারতেন নলিনী!'

নলিনী অস্থির হয়ে ওঠেন। ওকে কী ভাবে বোঝাবেন, ভেবে পান না। গেট অব্দি পৌঁছে হঠাৎ মনে হয়, দূর দূর! কোথায় যাচ্ছি? পাথরে মাথা ঠোকা। সেই সায়েবী কায়দায় ঠোঁটের কোণা দিয়ে বলবে—দেখছি কী করা যায়। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটাই বলবে। নলিনী বাতাসে কথাটা কম্পোজ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখতে পান। থুথু ফেলেন। দাড়ি মোছেন।

তারপর হনহন করে চলে যান শিবুর ফার্মে। শিবুই এখন প্রেরণা। অন্তত ফটিকচন্দ্রের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ার মতো প্রচুর আলোচনা শিবুর সঙ্গে হয়। শিবু ওই ছোকরাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। নলিনী বলেন—কাগজে লিখে কিছু হয় না হে আজকাল! অন্য ফিকির থাকলে বলো। শিবু বলেছিল—তাহলে পিটিশন ঠুকে দিন না ব্যাটার নামে। একেবারে ডি. এম-র কাছে। এ থানার বাবুরা কিচ্ছু করবে না। অশোকের এক জামাইবাবু আছে না এস আই? সব ম্যানেজ করে রেখেছে।

সেদিন চপলা ডেয়ারীতে দুধ দিতে গিয়েছিল। দাদাদের গরুমোষের দুধ দিয়ে আসার ভার তার ওপর পড়েছে। তার কানে গিয়েছিল এসব কথা। বোম্বাইকা বাবুকে ব্যাপারটা না জানিয়ে থাকতে পারেনি।

কিন্তু নলিনী সত্যি সত্যি পিটিশন করে বসার পাত্র নন। ওটা নেহাৎ রাগ মেটানো। বাড়ি ফিরে হাসতে হাসতে গার্গীকে বলেছিলেন—শ্রীমান ফটিকচন্দ্রকে মিসায় ঠেলা হচ্ছে, জানিস তো?

—কিসে?

—মিসা, মিসা! বাবা-মা বলতে দেবে না। পচে ভূট হবে সেলে।

—কী করেছেন রতনদা?

মেয়ের কথার ভঙ্গীতে নলিনী ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সেটা ঢাকতে গোমড়া মুখে বলেছিলেন—ছোকরা একজন ফরেন স্পাই। শুনলাম থানায় মেসেজ এসেছিল। টাকা খেয়ে চেপে গেছে।

গার্গী ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলেছিল—তাহলে তুমিও জোর বেঁচে গেলে বলো! ওর সঙ্গে প্রেস-ট্রেস করতে যাচ্ছিলে। তোমাকেও মিসায় আটকাত।

নলিনী যেন মুখের ওপর ঘা খেয়ে চুপচাপ হজম করতে বাধ্য হলেন। দিনে দিনে জীবনের চারপাশটা ঘিরে তেতো, নোংরা, ঘৃণ্য, দুঃখজনক জিনিসগুলো জমতে জমতে আর পা বাড়াবার জায়গা নেই। সে রাতে নলিনীর কাসি বেড়ে গেল। একটু-আধটু কাসি ধূমপায়ীদের হয়েই থাকে। শীতকালে নলিনী প্রতি বছর সর্দি-কাসিতে ভোগেন। এবার একদফা সে দুর্ভোগ গেছে। আবার বুঝি হামলা করল।

কাসি যত বাড়ে, নলিনীর তত বেশি বিড়ি টানতে ইচ্ছে করে। গার্গী বিড়ির কৌটো কেড়ে নেয়। তখন নলিনী পোড়া বিড়ির টুকরো খোঁজেন।

এবার একটু ঘুষঘুষে জ্বরও। আর গলার কাছে জ্বালা করে। নলিনী এলোপ্যাথি ছোঁননি জীবনে। হোমিওপ্যাথি আর নেচারকিওরে বিশ্বাসী। মধুসূদন বোসের হোমিওপ্যাথি ডিস্পেন্সারি থেকে ওষুধ এনে খেলেন। কিন্তু জ্বর আর গলার জ্বালাটা কমল না। সেই অবস্থায় কো-অপারেটিভের ঋণ পরিশোধের নোটিশ কম্পোজ করেন। আর সেই হ্যালুসিনেশন! খুব দুর্বিপাকে পড়ে যান নলিনী। বিড়বিড় করে কী সব বলেন। কাকে ধমক দেন। গার্গী প্রায় সারাদিন বাইরে। দশটার বাসে শহরে কলেজ করতে যায়, ফেরে প্রায় সন্ধ্যা ছ'টায়। খুব কষ্টে দিন কাটে নলিনীর। সবচেয়ে কষ্ট বিড়ি খাওয়ার। না খেলে কষ্ট, খেলেও কষ্ট। গলার ভেতরটা লঙ্কার মতো জ্বালা করে। লালা ঝরতে থাকে। তবু সব গোপনে রাখার চেষ্টা করেন। গার্গীর তত বেশি লক্ষ্য

বরাবর থাকে না। কিন্তু ক্রমশ সে টের পায়, বাবার শরীরে একটা কিছু ঘটছে।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি নলিনী বিছানায় পড়লেন। খবর পেয়ে অনেকে এসে দেখে যায়। নলিনী কিছুতেই এলোপ্যাথি চিকিৎসা করাবেন না। এ তাঁর প্রিন্সিপ্‌ল্‌। স্পষ্ট জানিয়ে দেন। মধুবাবু খুব উৎসাহে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ান। বলনে—এবার থাউজ্যাণ্ড এক্স দিলাম! দেখবে রেভোলিউশন ঘটে যাবে!

নলিনী অতি কষ্টে হেসে বলেন—ঘটাতেই হবে। কাগজ তিনটে ইস্যু বন্ধ।

গার্গী জ্বলে ওঠে।—খুব হয়েছে। আর কাগজ-কাগজ কোরো না।

নলিনী আপনমনে বিড়বিড় করেন—ঠগ! জোচ্চোর! গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নিল। পড়ে গেলাম।······

॥ পনের ॥
ম্যয় মুসাফির হুঁ

চপলার মুখে সে রাতে স্যারের চক্রান্তের কথা শুনে রতনকুমার ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে যখনই কোথাও নোলে ভটচাযকে দেখেছে, দ্রুত সরে এসেছে। চপলাকে অবিশ্বাস করতে পারেনি সে—কারণ স্যার আর তার বাসায় এলেনই না। এলে বুঝত, চপলা তাকে ভয় দেখিয়ে তামাসা করছিল। রতনকুমারের তাই জেদ চড়ে গিয়েছিল। যা পারে করুক এইসব গেঁয়ো বুড়বকগুলো। সে পরোয়া করে না ওদের।

কিন্তু তারপর যখন শুনল, নোলে ভটচাযের গলায় ক্যান্সার হয়েছে, তখন সে একদিন প্রগতি প্রেসের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পকেটে বেশ কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিল সে। মনে কিছুটা অনুতাপও ছিল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে একটু ইতস্তত করছে, এমন সময় তাকে দেখতে পেয়ে গার্গী বেরিয়ে এল।

রতনকুমার বিষণ্ণ মুখে বলল—শুনলাম স্যার অসুস্থ। কেমন আছেন এখন?

গার্গী গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে নির্বিকার বলল—ভাল।

—একবার দেখা করে যাই তাহলে।

—এখন ঘুমুচ্ছেন

রতনকুমার ভাবতে পারছিল না, কোন এক সন্ধ্যায় এই মেয়ে তার বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একগোছা ফুল প্রেজেন্ট করেছিল। কি ঠাণ্ডা ওই কণ্ঠস্বর! সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—আপনারা নিশ্চয় আমার ওপর রাগ করেছেন। ইন্ ফ্যাক্ট, দ মানি অলওয়েজ ক্রিয়েটস দা প্রব্লেম!

গার্গী রূঢ়স্বরে বলল—কে চেয়েছে আপনার টাকা? টাকার কথা শোনাতে এসেছেন!

রতনকুমার তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল।

গার্গী বাঁকা ঠোঁটে ফের বলল—আর কোনো কথা আছে?

—আছে। রতনকুমার শান্তভাবে বলল।

—বলুন, শুনি।

—স্যারকে বলবেন, এতদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি—তার কারণ আর কিছুই না—আই কুড'নট কাম টু এনি কনক্লুসন! তাছাড়া আই হ্যাড মাই ওন প্রব্লেম।

—ঠিক আছে। বলব।

রতনকুমার একটু ইতস্তত করে বলল—স্যারের অসুখটা নাকি ভেরি সিরিয়াস টাইপ অফ—

গার্গী তাকাল।

—ক্যান্সার! ইজ ইট?

গার্গী কোনো জবাব দিল না। ঠোঁট কামড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

—ওঁর তো প্রপার মেডিকেল ট্রিটমেণ্ট দরকার। কী ব্যবস্থা করছেন?

—আমাদের যা সাধ্য করছি। ধন্যবাদ।

—যদি কিছু মনে না করেন, কোনো মেডিকেল এক্সপার্টকে……

বাধা দিয়ে গার্গী বলল—আপনার পাগল কাকার ট্রিটমেণ্ট আগে করান তো! বলে সে হনহন করে চলে গেল। আর পিছু তাকাল না। প্রেস-ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল—তখনও দৃষ্টি নিজের হাতের দিকে।

রতনকুমার কিছুক্ষণ তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। হ্যাঁ, সে ক্রমশঃ স্পষ্ট বুঝতে পারছে—এই গেঁয়ো মানুষগুলোর মন বড্ড সংকীর্ণ। নেলো ভটচাযকে টাকা দিলেই তার শতখুন মাফ হয়ে যেত। সে ওদের বাবা-মায়ের চোখে হিরো হয়ে থাকত! গার্গীর এই ব্যবহার তাকে

জোর আঘাত দিল সেদিন। তাজ্জব! সে নিজে থেকে তো স্যারকে কোনোদিন টাকা দেওয়ার কথা বলেনি। তার নিজেরই অনেক প্রব্লেম আছে। টাকা ছাড়া এক পা চলার হিম্মত এখানে তার নেই। কাজেই যেচে কাকেও টাকা দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং স্যারই তার টাকার অঙ্কটা শোনার পর থেকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করেছেন। এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

তেতো হয়ে গিয়েছিল রতনকুমারের মন। আরে, পাগল কাকার ট্রিটমেণ্ট করান তো আগে! কী ভাবে করাবে, লোকটা সেই যে শিবু চক্কোত্তির মার খেয়ে পালিয়েছে দোমোহানী ছেড়ে, আর তার দেখা নেই। কোথায় গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আত্মীয়-বাড়ি। ওদিকে শৈলকাকী সামনাসামনি পড়লেও কথা বলে না। পাশ কাটিয়ে যায়। তার ছেলেমেয়েরাও ভারি অদ্ভুত। দেখলেই দৌড়ে পালায়।

কেন পালায়? অশোকরা বলেছে, শৈলবালা নাকি ওদের পইপই করে শিখিয়েছে—খবর্দার! ও হচ্ছে ছেলেধরা। ভুলিয়ে-ভালিয়ে বোম্বাই নিয়ে পালাবে। বেচে দেবে কাদের কাছে। তারা নাকি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কলজে খায়।

হাসতে হাসতে রতনকুমারের পেটে খিল ধরে যায়। পরে মনটা ভারি হয়ে ওঠে। কী সব ভেবে ফিরে এসেছিল, কী হয়ে গেল!

এক বিকেলে ঘোষের ডাঙা থেকে দিবাকরের বাবা নাখু ঘোষ আর জনাকয় লোক এল তার ঘরে। রতনকুমার খুব খুশি হয়ে ভদ্রতা করে ওদের বসতে বলল। লোকগুলো তার ঘরের ভেতর সব কিছু খুঁটিয়ে দেখছিল। রতনকুমার চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলল। সে বুঝতে পেরেছিল, ওরা একটা ডেপুটেশন নিয়ে এসেছে।

একটু পরে ওদের মুখপাত্র হিসেবে নাখু ঘোষ বলল—বাবা ফটিকচরণ

—বলুন জ্যাঠামশাই।

—তুমি যে পিকিত ফটিক, আমাদের শীতলের ছেলে, তাতে কোনো গণ্ডগোল আমরা দেখি না। এখন কথাটা হচ্ছে, তুমি কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে ঘোষের ডাঙা ছেড়ে এলে—আমরা তাতে মনে মনে খুব ব্যাজার হয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের ঘরোয়া ঝগড়া, কী আর বলব?

চণ্ডী ঘোষ মাথার লাল ফেট্টিটা খুলে কোমরে জড়াতে জড়াতে বলল—এবারে আমি একটা কথা বলি নাখুদা! কথাটা হল কী, এতকাল দোমোহানীর

বাবুরা আমাদের বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্যি করেছে। আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে। তারপর কি না নাখুদার ছেলেটা নেকাপড়া শিখে বড় 'অপিসের' হ'ল। আমাদের মনে জোর বাড়ল। তারপর কি না শীতুদার ছেলে ফটিক ফিরে এল। এ আমাদের কত অহংকারের কথা। কী বলো নাখুদা?

সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। এবার মুখ খুলল উদয় ঘোষ। সে বয়সে সবার বড়। থুথ্‌ড়ে বুড়ো। কিন্তু এখনও দিব্যি ঘোষ চরাতে বিলে-জঙ্গলে যায়। সে গলা সাফ করে বলল—বেশি কথার দরকার নাই বাবা সকল! আমরা ফটিককে বলি, যা হবার হয়েছে। এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলো। বাবার ভিটেয় ঘর বানাও।

নিবারণ বলল—কিন্তু শৈল ঘোষাল বাধা দেবে। আমি জানি।

নাখু ঘোষ হুঙ্কার দিয়ে বলল—খুব সাধ্যি শৈলবালার! ফটিকের 'বংশ' নাই ভিটেতে? কে আটকায় দেখা যাবে। ফটিক চলুক।

নিবারণ কিক করে বলল—শৈলর পেছনে লোক আছে গো খুড়ো। পাকা লোক আছে।

নাখু অবহেলা করে বলল—যা যা! শিবু চক্কোত্তি তো?

—না খুড়ো! তোমার ছেলে।

নাখু রাঙা চোখে তাকাল!—কে? দিবু?

—আবার কে?

নাখু একটু দমে গেল। কিন্তু দেমাগ দেখাতে ছাড়ল না।—দিবু তেমন ছেলে না রে বাবা, দিবুকে আমি দেখব।

উদয় সংশয়ান্বিত স্বরে বলল—কিন্তু দিবু জমিজমার আইনটা বোঝে। সে ওই লাইনের লোক। 'অপিসের' কি না!

চণ্ডী রাগী মানুষ। সে কোমর থেকে লাল কাপড়টা খুলে আবার মাথায় জড়িয়ে বলল—তাই বলে ফটিক তার বাবার জায়গা পাবে না?

এসব কথা চলার সময় রতনকুমার লক্ষ্মীবুড়ীকে অতিথি সৎকারে ব্যস্ত রেখেছে। বুড়ী ঝটপট গেছে ময়রার দোকানে। রসগোল্লা এনে প্লেটে সাজাচ্ছে। হাজরাকে চা আনতে বলে এসেছে।

রতনকুমার এবার হাসতে হাসতে বলল—আমাকে আপনারা নিতে এসেছেন। খুব খুশি হলাম এতে। কিন্তু আমি আপনাদের কী কাজে লাগব, জানি না।

চণ্ডী বলল—তুমি রা বদলেছ বাবা। পেথম এসে কী বলেছিলে? বলেছিলে গাঁয়ের উন্নতি করব। টিউবেল বসাব। এটা করব, ওটা করব।

নাখু তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল—আমরা তোমাকেই নেতা করেছিলাম মনে-মনে। দিবু তো 'অপিসের'। সে আজ এ জেলায় তো কাল অন্য জেলায়। তার আশা আমরা করিনে। নিজের ছেলে হলে কী হবে? যদ্দিন বেঁচে আছি বুড়ো-বুড়ীতে, তদ্দিন দেখতে আসছে। মলে আর গাঁয়ে ঢুকবে না।

মধু ঘোষ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলল—আমাদের দাবি ফটিক বাবা, মা ঢেলাইচণ্ডীর মন্দিরটা নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দিরটা তুমি পিতিষ্ঠা করো।

হারু ঘোষ বলল—আগে টিউবেল।

উদয় হাসতে হাসতে বলল—নোলে ভটচাযকে তুমি বিস্তর টাকা দিয়েছ। আমরা তোমার স্বজাতি। রক্তের সম্পক্ক আছে। আমাদের দাবি মিটবে না?

রতনকুমার রসগোল্লার প্লেট পরিবেশন করতে ব্যস্ত হ'ল। হুসহাস করে রসসুদ্ধু গিলতে দেরি করল না কেউ, তারপর চা এসে গেল। ফুঁ দিয়ে আওয়াজ করে চা খাচ্ছে লোকগুলো। চা খেতে খেতে ফটিকের বাবা-মা'র তারিফ করছে। ফটিকের ছেলেবেলার নানান গল্প শোনাচ্ছে। রতনকুমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে দেখছিল।

চা শেষ হলে সে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। ঘরে তুমুল কাশি শুরু হয়ে গেল। কেউ গাঁজার ছিলিমের মতো টান দিচ্ছে। ঘর ধোঁয়ায় ধূসর। চণ্ডী বার বার বলছে—এ কি সহজ সিগারেট? বোম্বাইয়ের জিনিস। সায়েব লোকেরা খায়।

হারু মন্তব্য করল।—দোমোহানীতেও বিক্রি হচ্ছে আজকাল।

তারপর নীরবতা। সবাই রতনকুমারের দিকে তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। রতনকুমার বিব্রত। আস্তে বলল—নিশ্চয় আপনাদের ক্লেম করার রাইট আছে জরুর! কিন্তু······

চণ্ডী চেঁচামেচি করে বলল—কোনো কিন্তু শুনব না। তুমি আমাদেরই ঘরের ছেলে। ভগমান তোমাকে বড় করেছে। তুমি ধনবান হয়েছ। তুমি আমাদের মাথার মণি। তুমি থাকতে কোনো বাবুকে আর আমরা পরোয়া করিনে।

হারু বলল—তুমি হুকুম দিয়ে যদি বলো, অমুক লোকের মাথা ফাটিয়ে দাও—দোব।

নাখু বলল—পনের একর গোচারণ মাটি ক্রিমে ক্রিমে লোকে দখল করে ধান পুঁতলে। আমার ছেলে দিবুকে বললাম, খাস জমি বেহাত হচ্ছে বাবা। পিতি-কার করো। দিবু বললে—কিছু করা যাবে না। ক্যানে? না—পার্টির বাবুরা হ্যাঙ্গমা বাধাবে। ইদিকে আমাদের গরুমোষগুলোর আর একমুঠো ঘাস জোটে না। বিলে চরাতে গেলেও লোকে তেড়ে আসে। খোঁয়াড়ে দেয়। বাবা ফটিক, তুমি এখন ভরসা।

উদ্বিগ্ন রতনকুমার বলল—আমি কি করতে পারি?

—তোমাকে কী করতে হবে তখন দেখবে। শুধু একবার মাথা হয়ে দাঁড়াও!

—আচ্ছা, ভেবে দেখি।

সবাই হইচই করে উঠল। তারা শিগ্‌গির ওকে ঘোষের ডাঙায় ফিরে পেতে চায়। কেষ্টপদর বউকে তারা বুঝিয়ে দেখবে। কথা না শুনলে একঘরে করবে।

উদয় একটা প্রস্তাব দিল।—বেশ তো, শৈল ঘোষাল জায়গা না দিলে যদ্দিন ফটিক বাপের ভিটেয় ঘর না তুলছে, আমরা একটা ঘর ছেড়ে দোব।

একসঙ্গে সবাই খুশি হয়ে বলল—তাহলে আর কী! হয়ে গেল ব্যবস্থা।

রতনকুমার হাসবার চেষ্টা করে বলল—ঠিক আছে, আমি মাত্র দুটো দিন সময় চাইছি।

চণ্ডী হিসেব করে বলল—আজ শুক্কুরবার। শনি, রবি দুদিন। সোমবার সক্কালে আমরা এসে তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে যাব।

উদয় রসিকতা করে ঘরের জিনিসপত্র দেখিয়ে বলল—এগুলো?

—সব তোমার মাথায় চাপাব।

বিকট হট্টহাসি হাসতে হাসতে লোকগুলো উঠে দাঁড়াল। ওরা চলে যাবার পর রতনকুমার দেখল, ঘরের অবস্থা একেবারে তছনছ। হুলুস্থূল।

সে ডাকল—দিদিমা!

—যাচ্ছি ভাই! বুড়ী প্লেট ধুচ্ছে উঠোনে।

রতনকুমার বলল—ঘরে ঝাড়ু দাও।

মেঝেয় ধুলোবালি থিকথিক করছে। সে বিছানার চাদরটা বাইরে নিয়ে গিয়ে ঝাড়ল। তারপর ঘরে ঢুকে মোটামুটি সব ঠিকঠাক করে আবার বেরুল। উঠোনের শেষ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকল।

সন্ধ্যায় অশোকরা আড্ডা দিতে এসে দেখল, তাদের হিরো চুপচাপ শুয়ে

আছে। মাথার কাছে দম-কমানো বাতি। বুড়ী বাইরে বসে উনুনে রুটি সেঁকছে। অশোক বলল—জ্বর নাকি রতনদা?

—নাথিং। এস।

—শুয়ে আছেন যে?

—এমনি।

মনু দেয়াল থেকে গীটার নামাতে যাচ্ছিল, বিদ্যুৎ চোখ টিপে বারণ করল। তারপর রতনকুমারের কপাল পরখ করে বলল—গরম মনে হচ্ছে। মাথা টিপে দেব রতনদা?

রতনকুমার সস্নেহে তার হাতটা বুকে নিয়ে বলল—না রে! চুপসে বৈঠ্ যা!

অশোক সন্দেহাকুল হয়ে বলল—নিশ্চয় কিছু হয়েছে? গিরিজা শালার সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

—না রে না! চা-ফা খাবি তো বলে আয়। এই নে সিগ্রেট খা।

পরস্পর তাকাতাকি করে বিছানায় এপাশে-ওপাশে বসে পড়ল চারিটি তরুণ। হিরোর সিগারেট নিতে ভুলল না অবশ্য। তারপর তাপস মিটিমিটি হেসে বলল—আপনার মন ভাল নেই বোঝা যাচ্ছে। বলুন না খুলে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রতনকুমার বালিশে ভর দিয়ে একটুখানি উঠে বসল। তারপর বলল—আচ্ছা অশোক! তোরা বল তো ভাই। যদি আমি এভাবে ফিরে না আসতাম, যদি ধর্ একদম মামুলী আদমি হয়ে ফিরতাম, তোরা আমার সঙ্গে মুহব্বৎ করতিস কি?

প্রশ্নটা গুরুতর। সবাই তাই হেসে উড়িয়ে দিল। বিদ্যুৎ বলল—কেন এসব আবোলতাবোল কথা ভাবেন বলুন তো রতনদা? এর আগেও একদিন ঠিক এমনি কথা বলছিলেন।

মনু বলল—তাহলে পাল্টা একখান ঝাড়ি আমি? কন্ রতনদা!

রতনকুমার একটু হেসে বলল—কী?

—ধরেন, যদি আমি, তাপস, বিদ্যুৎ, কী এই দত্তের পোলা অশোক না হইয়া আমরা খেঁদু, ভুলু, পাঁচু হইতাম, আপনে কি আমল দিতেন নাকি তাই কন্ শুনি?

রতনকুমার মাথা দোলাল।—ঠিক বলেছ মনু। থ্যাটস কারেক্ট। সাচ বাত!

—হেইলে উঠিয়া বয়েন। গলা ছাড়িয়া একখান কিশোরকুমার ধরেন্! আমি তবলাজোড়া বাগাইয়া বই। কী কস তোরা?

হঠাৎ রতনকুমার বলল—জাস্ট ওয়ান মিনিট। আমার সঙ্গে তোমরা অনেকদিন ধরে মিশছ। আমি অনেককে অনেক কিছু প্রেজেণ্ট করেছি। কিন্তু তোমাদের কেন যে কিছু দিইনি কে জানে!

তাপস হেসে বলল—কাছের লোক, তাই।

—আমি আজ তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে প্রেজেণ্ট করব।

ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। রতনকুমার বিছানা থেকে নামল। দেয়ালের গীটারটা নিয়ে সে তাপসকে বলল—তাপস! তোমাকে এই গীটারটা দিলুম।

তাপস বলল—সে কী! বেশ তো আছে। বাজাচ্ছি……

—না, এটা তোমার। ধরো।

তাপস গীটারটা নিয়ে বসে রইল চুপচাপ। রতনকুমার জাপানী ক্যামেরাটা দিল অশোককে। অশোকও ক্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। বিদ্যুৎ পেল ছোট্ট একটা ট্রানজিস্টার। মন্টু পেল রিস্টওয়াচ।

রতনকুমার সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলল —ফ্রেণ্ডস্! ম্যয় সমঝতা কী, ইয়ে মোর জিন্দেগী কা বড়া মেহেরবাণী—তুমসা আচ্ছা-আচ্ছা হামদর্দ দিল-ওয়ালা লড়কাকা সাথ ন-জুলনেকে মওকা মিলা। হাম বহুৎ খুশ হোকে কহরাহা কী, সতারাহ বরাবর হামকে মিল যাতা—এভারহোয়ার অল; ওলয়েজ! ক্যায়সে? কী (নিজের বুকের দিকে আঙুল তুলে) ইসমে কলিজা বহুৎ বড়ী হ্যায়! হাম দোস্তকা পাশ দোস্ত, দুশমনকা পাশ দুশমন। মাই ফ্রেণ্ডস! ফ্র্যাংকলি টু টেল ইউ—মেরা পাঁওমে চাক্কা হ্যায়। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? ইয়েসস্টারডে আই ওয়াজ দেয়ার, টুডে আই অ্যাম হিয়ার এ্যাণ্ড টুমরো আই উইল্ বি ইন্ দা আদার প্লেস। ম্যয় মুসাফির হুঁ। তো ঠিক হ্যায়! ইয়ে জিন্দেগীভি বহুৎ ছোটি ভি হ্যায়। হাম তুমলোগোকো পাশ মাফি মাংতা। কৈ গলতি হুয়ি তো মাফ করনা। থ্যাঙ্ক ইউ!

ওরা ভেবেছিল হাততালি দেবে। চমৎকার ফিল্মোচিত ডায়লগ! একেবারে হিরোর কণ্ঠস্বর। অনবদ্য বাচনভঙ্গী। পর্দা ছাড়া কখনও এই বাস্তবতার আস্বাদ ওরা পায়নি। কিন্তু কথাগুলোর মানে আঁচ করে ওরা হতবাক হয়ে গেছে। ক্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

তারপর দেখা গেল অশোক কেঁদে ফেলেছে।—আপনি চলে যাবেন রতনদা? কেন চলে যাবেন?

রতনকুমার হো হো করে হেসে উঠল।—আরে না, না। এখনই যাচ্ছি না

মন্টু জোরে মাথা দুলিয়ে বলল—কানে গরম সীসা ঢুকাইয়া দিলেন দাদা! কী কইলেন!

রতনকুমার গান গেয়ে উঠল চাপা গলায় হিন্দি ফিল্মের গান। রফি আমেদ গেয়েছিল। এখন এই থমথমে ঘরে সেই ফিল্মী বিষণ্ণতা ভরে উঠল। 'জিন্দেগী ইতনি হাসিন হ্যায়……

অনেক রাত করে অনেক সাধাসাধির পর চার চামচে চলে গেল। তখন রতনকুমার আপন মনে হো হো করে হেসে উঠল। বাইরে থেকে লক্ষ্মীবুড়ী বলল—কী হল ভাই? হাসছ কেন?

—দিদিমা! দুনিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখে তোমার হাসি পায় না?

—পায় বইকি!

—দিদিমা!

—বলো ভাই!

—আমি যদি তোমাকে বোম্বে নিয়ে যাই, যাবে আমার সঙ্গে?

—যাবো। কেন যাবো না?

একটু চুপ করে থাকার পর রতনকুমার বলল—না দিদিমা। বোম্বে অনেক দূর। তুমি গিযে কী করবে? বরং আমি তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাব। কেমন?

ব্যাকুল লক্ষ্মীবুড়ী বলল—সে কি গো? তুমি কি চলে যাবে নাকি?

—কে জানে! ধরো যদি চলেই যাই!

—না বাবা। দেশের ছেলে দেশে থাকো।

—ঘুমোও দিদিমা।……রতনকুমার পায়চারি করতে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ী ডাকল—ঘুমুলে গো?

—না, কেন?

—সত্যি চলে যাবে?

—আঃ! ঘুমোও তো বাবা। খালি বকবক।

তবু বুড়ী গজগজ করতে থাকল।—বেশ তো আছ ভাই। নিজের বাবা-মায়ের দেশ। নিজের লোকজন আছে। বিপদে-আপদে ডাকলে দৌড়ে আসবে। শহর বলে শহর—সে কী না বোম্বাই! বাবা রে বাবা! নাম শুনলেই ভয় করে। কেন যাবে বাপু? আপন দেশে রান্নাপাতি করে খাওয়াচ্ছি। মনটা বসে গেছে তোমার ওপর। খুব কষ্ট হবে গো!……

॥ ষোল ॥

আবার চপলার চাপল্য

তখনও সূর্য ওঠেনি। কুয়াশা ও হিমে নিঃঝুম হয়ে আছে দোমোহানীর বাজার। রতনকুমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে শেষরাতেই। বুড়ী তখনও কাঠ হয়ে শুয়ে আছে। রতনকুমার বেরুল। ঘোষের ডাঙায় শৈলকাকিমার কাছে বিদায় নিতে গেল।

পথের ধুলো আর ঘাস শিশিরে ভিজে গেছে। রতনকুমারের জুতো কাদায় মাখামাখি। সে হাল্কা মনে শিস দিতে দিতে হাঁটছিল। মনে আরব সাগরের ঢেউ উঠেছে। নেশা ধরে যাচ্ছে মগজে।

ঘোষের ডাঙার ঘুম ভেঙে গেছে কখন। শীত ওদের জব্দ করতে পারে না। গাঁয়ে ঢোকার মুখে কেউ পাশের পুকুরঘাট থেকে তাকে ডাকল—বোম্বাইকা বাবু!

রতনকুমার ঘুরে দেখল, চপলা।

ভাপ-ওঠা হিমজল একটা প্রশস্ত আয়নার মতো পড়ে আছে। তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ওর যেন একটুও শীত করে না। রতনকুমার একটু হাসল। সে-রাতে ওর সঙ্গে প্রায় একটা ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। সে-কথা ভুলে গিয়ে তাকে ডাকছে এমন করে! হয়তো মেয়েটার মনে কুটিলতা নেই। বড্ড বেশি অকপট। হয়তো একটু বেহায়াও। রতনকুমার বলল—হাই হেমামালিনী!

চপলা ঘাটের কাঠ ডিঙিয়ে চঞ্চল পা ফেলে তার কাছে এল। ভুরু কুঁচকে তার পা থেকে মাথা অব্দি দেখল একবার। তারপর বলল—তুমি বোম্বাই চলে যাবে বলেছিলে। এখনও ঘোরাঘুরি করছ কী মতলবে বলো তো?

—নিশ্চয় যাব। রতনকুমার সিগারেট ধরিয়ে হাল্কা চালে বলল। কিন্তু একা যাব না। তোমাকে নিতে এলুম।

চপলা হাসল না। গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—আমি পরের বউ। লজ্জা করছে না বলতে?

রতনকুমার হেসে উঠল।—নাও! ফের ঝগড়া শুরু করলে!

—সে-রাতে তুমি আমাকে বড্ড অপমান করেছিলে মনে পড়ছে?

—না।

—তোমার মনটা কিসে গড়া বোম্বাইকা বাবু, কিচ্ছু মনে থাকে না তোমার ?

রতনকুমার তার কণ্ঠস্বরে চাপা আবেগ লক্ষ্য করে অবাক হয়ে বলল—এ কথা কেন হেমামালিনী ?

—থামো ! কে তোমার হেমামালিনী ? চপলা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, এটা ঘোষের ভাঙা। এ বড় কঠিন মাটি, জানো না ?

রতনকুমার আস্তে বলল—ঝগড়া কোরো না। যদি যেতে চাও, নিয়ে যেতে পারি।

—নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে বুঝি ?

—হুঁউ। আমি মেয়ে-বেচা বিজনেস করি।

চপলা এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় ব্যস্তভাবে বলল—শোন। যা থাকে কপালে, আমি যাব। তুমি কবে যাচ্ছ ?

রতনকুমার কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল—সাড়ে ছটার বাসে। জিনিসপত্র রেডি করে রেখেছি। কাকিমার কাছ গিয়ে একবার টা-টা করে এলেই আমার কাজ শেষ !

চপলা চঞ্চল চোখে তাকিয়ে বলল—টাউনের স্টেশনে অপেক্ষা করো। আমি পরের বাসে যাচ্ছি।

—সত্যি বলছ, না জোক করছ চপলা ?

চপলা কোনও জবাব না দিয়ে দ্রুত চলে গেল। রতনকুমার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটু হেসে ফের শিস দিতে দিতে পা বাড়াল।

শৈল গোয়ালঘর থেকে গরু বের করছিল। রতনকুমারকে দেখে ঘোমটা টেনে দিল। রতনকুমার কয়েক পা এগিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল—কাকিমা, আমি চলে যাচ্ছি। আশীর্বাদ করো।

শৈল অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চোখে জল এসে গেল তার। আস্তে বলে উঠল—চলে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ, কাকিমা। এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তা বুঝি, বাবা। বুঝি বইকি।...শৈল আঁচলে চোখ মুছল।

—কাকিমা ! রতনকুমার একটু কেসে দ্বিধার সঙ্গে বলল—তোমাদের পাকা ঘর বানিয়ে দেব বলেছিলাম। কিন্তু থাকা হল না। বরং টাকা দিয়ে যাচ্ছি। নিজেই বানিয়ে নিও। কেমন ?

বলে সে পকেট থেকে একগোছা একশোটাকার নোট বের করল এবং শৈলর হাতে গুঁজে দিল। শৈলর কাঁপুনি দেখা দিল। সে আড়ষ্ট হাতে নোটগুলো ধরে রইল। তার দৃষ্টি মাটির দিকে।

রতনকুমার বলল—ভাইবোনেরা এখনও ওঠেনি দেখছি। ঠিক আছে, ওদের বলে দিও। আমি আসি।

সে পা বাড়ালে শৈল কান্না-জড়ানো গলায় ডাকল—বাবা ফটিক!

রতনকুমার ঘুরে বলল—পিছু ডেকো না কাকিমা!

—ফটিক, আমি মুখ্যুখু মেয়ে বাবা। ক্ষ্যামা দিও।

—ছিঃ! ওকথা বলতে নেই, কাকিমা।

—ফটিক, আমি পাঁচজনের কথার জ্বালায় তোমাকে…

রতনকুমার বাধা দিয়ে বলল—ওকথা থাক্‌। আমি আসি কাকিমা।

শৈল পা বাড়িয়ে বলল—আর তুমি কি কখনও আসবে না ফটিক?

—জানি না।

বলে রতনকুমার দ্রুত বেরিয়ে গেল। শৈল টাকাগুলোর দিকে এতক্ষণে তাকিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছে। এত টাকা! এ কার টাকা? কোনও বিপদে পড়বে না তো? একবার ভাবল, ফিরে দেবে—আবার ভাবল, টাকার ওপর কি কারও নাম লেখা থাকে? টাকা যার হাতে থাকে তারই। সে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হন্তদন্ত উঠোন পেরিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর সেই গভীর সংশয়—রতনকুমার সম্পর্কে প্রচণ্ড অস্বস্তি ঘরের মধ্যে অন্ধকারে তার সামনে এসে দাঁড়াল। তখন শৈল টাকাগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভেবে অস্থির হল।

একটু পরে সে টাকাগুলো ন্যাকড়ায় জড়িয়ে গোয়ালঘরে ফিরে গেল এবং কোণার দিকে একটা প্রকাণ্ড ফাটলের মধ্যে গুঁজে রাখল। তারপর একদলা গোবর তুলে ফাটলটা বন্ধ করতে থাকল সে।

প্রতি মুহূর্তে শৈল আশঙ্কা করছিল, পাশের রাস্তায় এই নিঃঝুম হিম ভোরবেলায় নীলমণি দারোগার বুটজুতোর শব্দ শোনা যাবে।…

ওদিকে রতনকুমার তখন হাইওয়েতে পৌঁছেছে। তারপর একটা চাপা অস্বস্তি জেগে উঠেছে তার মধ্যে। চপলাকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে তাহলে? কী বলে পরিচয় দেবে মহতাবজীর কাছে? একটা অশিক্ষিত গেঁয়ো বোকাবুদ্ধু মেয়ে!

কিন্তু একটু পরেই রতনকুমার এক অভাবিত অবস্থায় পড়ে গেল। চলে যাবার আগে নলিনী স্যারকেও দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেবে ভাবল। আর তাই নলিনী স্যারের বাড়ির দিকে যেতেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল আচম্বিতে।…

॥ সতের ॥

পথিমধ্যে দুর্বিপাক

নীলা কাফে পেরিয়ে যাবার পর পেছন থেকে কেউ শিস দিয়েছিল আচমকা। রতনকুমার একবার ঘুরে দেখেছিল, নীলা কাফের সামনে একটা বেঞ্চে বসে আছে কারা। সম্ভবত তারাই কেউ শিস দিয়েছে। রাস্তা এখন প্রায় নির্জন। সকালের দূরগামী বাসগুলো কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। বাস স্ট্যাণ্ড ফাঁকা। বাঁশবনের ছায়ায় একটা নষ্ট ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বাজারের এই শেষ দিকটায় অবশ্য ভিড় বড় একটা থাকে না। রতনকুমার বুঝতে পারল না, কাকে শিস দিয়ে ওরা ব্যঙ্গ করল। সে আবার পা বাড়াল সামনে। একটু দূরে নলিনীর বাড়ি দেখা যাচ্ছে। শীতের কুয়াসা তখনও বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। নিঃঝুম বিষণ্ণ ওই বাড়ির ফুলের বাগানের দিকে তাকিয়ে রতনকুমারের মন কেমন করে উঠল। যখনই বাড়িটাকে দেখেছে, মনে হয়েছে সব সময় ফুলের শান্ত হাসিতে উজ্জ্বল। এখন মনে হল, বাড়িটাই যেন ক্যান্সার-কোষে রূপান্তরিত। শিউরে উঠল রতনকুমার। ভয়ের চোখে বাড়িটার দিকে তাকাল।

কিন্তু ফের শিসের শব্দ শুনল সে। এবার একটু তীব্র এবং কটু। রতনকুমার ফের ঘুরল। সন্দিগ্ধ হল। ওরা কি তাকে নিয়েই তামাসা করছে?

শীতের অনুজ্জ্বল রোদ পড়েছে নীলা কাফের সামনেটায়। বেঞ্চের যুবকেরা চাপা হাসছে এবং নিজেদের মধ্যে কী বলাবলী করছে। রতনকুমারের মনে হল, ওদের একজনকে সে যেন চেনে। কিন্তু এর বেশি কিছু মনে পড়ল না। সে ফের পা বাড়াল।

এবং ফের জোরালো শিসের শব্দ হল।

রতনকুমারের পা থেকে মাথা অব্দি রি-রি করে জ্বলে উঠল। ফের থমকে দাঁড়াল। কিন্তু ঘুরল না। চলে যাবার সময় এসব আমল দেওয়ার অর্থ হয় না। সে তো ভালই জানে, এতদিন ধরে দোমোহানীর লোকেরা তাকে কী চোখে দেখেছে। যেন সে কী একটা কিম্ভূত বা উদ্ভট জিনিস—তারিয়ে তারিয়ে

উপভোগ করার মতো ব্যাপার। আড়ালে তাকে সবাই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে, সে তো জানেই।

ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি ফুটল তার। ক্ষমা করে দেওয়ার ভঙ্গীতে সে আবার পা বাড়াল। কলকাতা যাওয়ার পরবর্তী বাসটা আসতে আর এক ঘণ্টা দেরি আছে। স্যারের পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছে। এসময় মনে কটু ভাব না থাকাই ভাল।

কিন্তু আবার তীক্ষ্ণ শিস এবং হাসির শব্দ রতনকুমারের পিঠে চাবুকের মতো পড়ল।

একদিন রতনকুমার গার্গীকে বলেছিল, 'জানেন তো? আকটার অল হেরিডিটি বলে একটা ব্যাপার আছে। আমি যেখানেই থাকি না কেন, জানতুম আমি কোন সালে জন্মেছি এবং আমার বাবা-কাকা-আত্মীয়স্বজন কেমন দুর্ধর্ষ মানুষ—জাস্ট প্রিমিটিভ ম্যান! আমার ব্লাডে ওটা আছে।...'

এ মুহূর্তে তার 'ব্লাডে'র সেই ব্যাপারটা আড়ামোড়া দিয়ে জেগে উঠল বাঘের মতো। হনহন করে ফিরে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল সে।

তার আগে ওকে আসতে দেখে ওরাও উঠে দাঁড়িয়েছিল।

রতনকুমার যথারীতি ফিল্মের হিরোর ভঙ্গীতে দাঁতের ফাঁকে বলে উঠল—মুঝকো ঔরত সমঝায়া! তো আঁখ ফাড়কে দেখো, হু অ্যাম আই?

হঠাৎ নীলা কাফের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই গিরিজা। তার হাতে একটা লোহার রড।

রতনকুমার এক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়েছিল।

গিরিজার চেলারা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। তারা তৈরী হয়ে বসে ছিল আজ। বেঞ্চের তলা থেকে সাইকেলের চেন ডাণ্ডা ইত্যাদি টেনে বের করেছিল ইতিমধ্যে। গিরিজার রডের বাড়ি লাগল রতনকুমারের কপালে। সে পড়ে গেল। তখন ওরা চেন আর ডাণ্ডা মারতে শুরু করল। রতনকুমার মূর্ছিত।

বড়জোর দু'তিন মিনিটের ঘটনা। এপাশে-ও পাশে কাছে ও দূরে লোকের' চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। গিরিজাদের সামনে দাঁড়াবার হিম্মত কারুর নেই। তাছাড়া রতনকুমার তাদের কাছে বাইরের লোক। তার প্রতি ঈর্ষাকাতর অনেকেই। গিরিজারা চলে গেলেও কেউ রতনকুমারের কাছে দৌড়ে এল না। নিঃসাড় রক্তাক্ত শরীরে পড়ে রইল 'বোম্বাইকা বাবু'। এ-মুহূর্তে তাকে কেউ শীতল ঘোষের ছেলে ফটিক বলে ভাবছিল না।

নীলা কাফের সামনেই ব্যাপারটা ঘটার দরুণ বাণীব্রত অতি দ্রুত দরজা ও ঝাঁপ এঁটে দিয়েছিল। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। গিরিজা যে সেই ভোর-বেলা থেকে এজন্যেই এসে আড্ডা দিচ্ছিল সদলবলে, অনুমান করতে পারেনি বাণীব্রত।

নলিনীর বাড়ির গেটে সেই সময় গার্গীকে দেখা গেল। সে শিবুর ডেয়ারি থেকে দুধ আনতে যাবে। সে গেট বন্ধ করে নেহাৎ আনমনে একটু দূরে নীলা কাফের দিকে ঘুরেছিল। সেই সময় একটা অস্বাভাবিকতা তার চোখে পড়ল। কাঠপুতুলের মতো এদিকে ওদিকে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। কেমন একটা গুমোট ধরনের ভাব ওদিকটায়। বাস স্ট্যাণ্ডে প্রতিদিন রিকশার ভিড় থাকে। যাত্রীরাও থাকে। কিন্তু রিকশোগুলো দ্রুত চলে যাচ্ছে তফাতে। নিশ্চয় একটা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে।

বার বার পিছু ফিরতে ফিরতে একটা লোক কাছাকাছি এলে গার্গী জিজ্ঞেস করল—কী হয়েছে ওখানে ?

লোকটা ভয়ার্ত মুখে বলল—খুন হয়েছে দিদি। ওখানে যাবেন না।

—খুন! কে খুন হল ?

—জানি না। পড়ে আছে এখনও। বলে লোকটা হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে চলে গেল।

এই সময় একটা খালি রিকশা এল ওদিক থেকে। গার্গী রিকশাওলাকে জিজ্ঞেস করল—খুন হয়েছে বলছে, সত্যি নাকি গো ? কে কাকে খুন করল ?

রিকশাওলা নিরাসক্ত গলায় জবাব দিয়ে গেল—হ্যাঁ দিদিমণি, বোম্বাইকা বাবু খুন হয়েছে।

গার্গী অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিল—কে!

রিকশাটা ততক্ষণে অনেক এগিয়ে গেছে।

গার্গীর মাথা ঘুরে উঠেছিল। শরীর থরথর করে কাঁপছিল। ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। তারপর পা বাড়াল।

নীলা কাফের সামনে আসতেই ওপাশে একটা দোকানের বারান্দা থেকে কেউ তাকে চেঁচিয়ে বলল—গাগুদি, যাবেন না যাবেন না! সরে আসুন ওখান থেকে।

গার্গী রতনকুমারের লাস খুঁজছিল। এতক্ষণে দেখতে পেল। রাস্তার পীচে

মাথা দিয়ে একরাশ পাথরকুচির ওপর পা দুটো ছড়িয়ে রক্তাক্ত শরীরে রতনকুমার শুয়ে আছে। সোয়েটারে রক্তের ছোপ এবং কালো দাগ। মুখে রক্তে জলজল করছে।

স্বপ্নাচ্ছন্ন গার্গী তাকিয়ে রইল। রতনকুমারের শরীরটা অত ছোট দেখাচ্ছে কেন? হাত দশেক তফাতে দাঁড়িয়ে রইল সে। কী করবে ভেবে পেল না।

অন্তত আরও একটা মিনিট কেটে গেল। দোমোহানী জুড়ে এক বিশাল স্তব্ধতা থমথম করছে, অথবা গার্গীর মনেরই ভুল। পাশ দিয়ে একটা ট্রাক চলে গেল, কিন্তু এতটুকু শব্দ হল না যেন। তারপর গার্গী অবাক হয়ে দেখল, রতনকুমারের শরীরটা নড়ছে।

একটুখানি নড়াচড়ার পর হঠাৎ রতনকুমারের রক্তাক্ত শরীরটা ভূতে পাওয়া লাসের মতো উঠে বসল। দু'হাতে দু'পাশের মাটি আঁকড়ে ধরল। তারপর থুথু ফেলল। থুথুতে সম্ভবত কপালের গড়িয়ে আসা রক্ত ছিল।

তারপর দূরে কাছে প্রত্যেকটি লোককে হতভম্ব করে যখন সেই শরীর সোজা হল, তখন চারধারে একটা চাঞ্চল্য জাগল।

রতনকুমারের লাসটাকে এই শীতের সকালে নরম রোদের মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই ভূতে পায়নি দেখে লোকেরা কেউ কেউ এগিয়ে আসতে থাকল সাহসের সঙ্গে।

"বোম্বাইকা বাবু" পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল ও মুখের একপাশের রক্ত মুছল। তারপর রক্তাক্ত রুমালটা মুঠোয় ধরে টলতে টলতে পা বাড়াল।

চারদিক থেকে ভিড় কাছাকাছি হবার আগেই গার্গী কয়েক পা এগিয়ে ভাঙা গলায় বলে উঠল—রতনবাবু! রতনবাবু!

রতনকুমার দাঁড়াল। একটু হেসে বলল—এই যে! আপনাদের বাড়িই যাচ্ছিলুম। স্যার কেমন আছেন এখন?

গার্গী কী বলবে ভেবে পেল না। কয়েক মিনিট আগে রতনকুমারকে কেন্দ্র করে একটা নিষ্ঠুর বিরাট ঘটনা ঘটে গেছে, তার সাক্ষী গার্গী নিজে। কেউ রতনকুমারের কাছে ছুটে আসেনি। দূর থেকে ভয়ে এবং সম্ভবত কৌতুকে ব্যাপারটা দেখেছে। বড় অদ্ভুত লাগে দোমোহানীর এই আচরণ। গার্গী এতকাল পরে যেন বিছানার তলায় সাপের খোলস দেখে আতঙ্কে চমকে গেছে। তার ঠোঁট কাঁপছে। রতনকুমার জানল না, তাকে খুন হওয়া মৃত মানুষ ভেবে এতক্ষণ কী সব কাণ্ড ঘটছিল।

রতনকুমার গার্গীর বিভ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ফের বলল—কী? কথা বলছেন না যে আপনি?

গার্গী অতি কষ্টে বলল—কে আপনাকে মেরেছে, রতনবাবু?

রতনকুমার হাসল।—পরে জানতে পারবেন। বলে সে নীলা কাফের সামনে বাস স্ট্যাণ্ডের টিউবেলটার দিকে এগিয়ে গেল। তখনও সে টলছে। মাঝে মাঝে রুমালটা ক্ষতস্থানে চেপে ধরছে।

ইতিমধ্যে নীলা কাফের দরজা ও ঝাঁপ খুলে গেছে। বাণীব্রত বেরিয়েছে। উদাসীন দৃষ্টিতে তার লোকেদের কাজে মন দিতে বলছে। আর সেই নীরব দর্শকবৃন্দের ভিড় চাপা হেসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। গার্গীর কানে এল, তারা ঘোষের ডাঙার লোকদের রক্তের শক্তি অর্থাৎ ভাইটালিটি নিয়েই কথা বলছে। হ্যাঁ, এতক্ষণে তারা বোম্বাইকা বাবুর মধ্যে ফটিককে পুনরাবিষ্কার করেছে। অনেক পুরনো খুনজখমের ঘটনা স্বভাবত এসে পড়েছে এতে। ঘোষের পো'রা সত্যি বড় দুর্ধর্ষ এবং তাদের এক ডজন প্রাণ আছে। সহজে তাদের মৃত্যু হয় না। হরঘোষকে বিলের ধারে প্রচণ্ড লাঠির বাড়ি মেরে এবং শেষে তেকোঁটা বল্লমে তার শরীর বিঁধিয়ে জলে মাছের মতো টানাটানি করা হয়েছিল। তারপর মরে গেছে ভেবে তাকে একটা জলটুঙিতে ফেলে দিয়ে এসেছিল। সেই হরঘোষ সন্ধ্যাবেলা দিব্যি বাড়ি ফিরে আসে এবং কিছুদিন পরে প্রতিশোধ নেয়। এই ফটিকও সেই বংশের ছেলে। কাজেই গিরিজাদের ভাগ্যে তেমন কিছু ঘটবেই।

তবে খুনটা হলে আজ দিনটা ভারি উল্লেখযোগ্য হত। দোমোহানী বাজারে বহুকাল মানুষ খুন হয় নি। সেই বছর সাতেক আগে এক হিন্দুস্থানী ভুজাওলাকে ডাকাতরা মেরে গিয়েছিল। তারপর মারামারি দাঙ্গায় জখমের ঘটনা ঘটেছে প্রচুর। কিন্তু লোকেরা আর রক্তাক্ত লাস দেখতে পায় নি। আজ রতনকুমারের রক্তাক্ত লাসটা দেখে তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অথচ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। তাই নিরাশ দর্শকবৃন্দ অতি দ্রুত নিজেদের চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রতনকুমার টিউবেলের হাতলে চাপ দিতে গিয়ে হাতে ব্যথা পেয়েছে, গার্গী লক্ষ্য করেছিল। এবার সে নির্দ্বিধায় টিউবেলের কাছে চলে গেল।

রতনকুমার তাকে দেখে একটু হেসে বলল—প্লিজ হেল্‌প মি!

গার্গী নিঃসঙ্কোচে হাতলে চাপ দিতে থাকল। রতনকুমার কপালের ক্ষতস্থান

ধুয়ে নিল এবং একটু জল খেল। তারপর বলল--এনাফ! থ্যাঙ্ক ইউ গার্গী দেবী! জলটা বেজায় ঠাণ্ডা।

গার্গী ফের চাপা গলায় প্রশ্ন করল—কে আপনাকে মেরেছে রতনবাবু?

রতনকুমার আনমনে জবাব দিল—দ্যাট স্কাউণ্ড্রেল গিরি। আবার কে আমার গায়ে হাত তুলবে বলুন? এখানে ও ছাড়া সবাই আমার বন্ধু। যাক্‌ গে, চলুন। স্যারকে দেখে আসি।

ছত্রভঙ্গ ভিড়ের সামনে গার্গীর পাশাপাশি রতনকুমার আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। লোকেদের মুখেচোখে এখন অন্য এক ভাব। নোলে ভটচাযের যুবতী মেয়ের সঙ্গে বোম্বাইকা বাবুর গোপন অবৈধ সম্পর্কের যে গুজব আড়ালে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার মতো ঝাঁকিয়ে উঠত, তা এখন ঝড় হয়ে বইছে।

গার্গী ও রতনকুমার নীলা কাফে ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে চলে গেলে কেউ দুবার শিস্‌ দিল। কেউ চাপা গলায় বলে উঠল—বহুত আচ্ছা! তারপর আবার নিজের চরকার দিকে ঝুঁকল। বাজারে এখন হলুদ রোদ্দুর। লোকসংখ্যা বেড়েছে ক্রমশ। আর একটু পরেই গাঁ-গেরামের লোকেরা এসে পড়লে দোমোহানী বাজার তার নিত্যকার জোয়ারে প্লাবিত হবে।

ওরা দুজনে আস্তে হাঁটছিল। প্রগতি প্রেসের একটু আগে রাস্তার বাঁদিকে ঘন বাঁশবন। তার গাঢ় হিম ছায়া রাস্তার পীচ থেকে গড়িয়ে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। রতনকুমার একবার দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল—বেঞ্চটা পাশে থাকায় ওরা তেমন চান্স পায় নি। নয়তো আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে যেত। অবশ্য আমার এই পুরু পুলওভারটাও দেখলুম ভারি কাজের জিনিস। তাছাড়া······

গার্গী দুঃখিত চোখে তার দিকে তাকালে সে ফের হাসতে হাসতে বলল—তাছাড়া ওরা বড্ড আনাড়ি। সাইকেলের চেন কীভাবে মারতে হয় জানে না। একবার একটা নিগ্রোর সঙ্গে আমার মারামারি হয়েছিল, জানেন? ব্যাটার হাতে সাইকেলের চেন ছিল।

গার্গী বাধা দিয়ে অস্ফুট স্বরে হঠাৎ ডাকল—রতনবাবু!

—হ্যাঁ, বলুন।

—এই নরকে কেন ফিরেছিলেন জানি না। এখানে...গার্গী কথাটা থামিয়ে দিল।

রতনকুমার গম্ভীর হয়ে বলল—এখানে কেন ? সবখানেই কম-বেশি এমন। ও আপনি ভাববেন না। তাছাড়া আমি তো চলেই যাচ্ছি।

গার্গী ফের ওর চোখে চোখ রেখে বলল—চলে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। আজই। তাই স্যারকে দেখা করে ক্ষমা চাইতে আসছিলুম। হঠাৎ গিরিজারা হামলা করল।

গেটের সামনে একবার দাঁড়িয়ে গার্গী বলল—বোম্বে ফিরে যাবেন ?

—আর কোথায় ? রতনকুমার আনমনে বলল—গিয়ে যদি দেখি, মহতাবজী—আই মিন, আমার পার্টনার গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে, আমি হয়ত একটু অসুবিধেয় পড়ব টেমপোরারিলি। তবে আমার বিগ-বিগ মুরুব্বী আছে। আমি স্ট্রাগল করতেও পারি।

গার্গী গেট খুলে বলল—আসুন।

ভেতরে ঢুকে রতনকুমার হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ফুলবাগানটা দেখতে দেখতে বলল—এ কী করেছেন ?

—কী ?

—আপনাদের বাগানটার এ অবস্থা কেন ?

—সময় পাইনে। বলে গার্গী দ্রুত বারান্দায় উঠল। ফের বলল—আসুন।

রতনকুমার দুঃখিত দৃষ্টিতে বিধ্বস্ত বাগানটা দেখছিল। ভয়ঙ্কর ক্যান্সার-কোষ শুধু স্যারকে নয়, তাঁর বাড়িটাতেও ছড়িয়ে এসেছে। সে একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলে পা বাড়ালো। গার্গী তখন ভিতরে চলে গেছে।

সে বারান্দায় ওঠার পর গার্গী ফিরল। তার হাতে খানিকটা তুলো আর এ্যান্টিসেপটিক ওষুধের শিশি। বলল—ভিতরে আসুন।

প্রেস ঘরের অবস্থা বাগানটার মতো। রতনকুমার ভেতরে ঢুকে বলল—আমায় আগে স্যারের কাছে নিয়ে চলুন।

গার্গী বলল—এক মিনিট। এই টুলে বসুন তো। ব্যাণ্ডেজ করে দিই।

—কেন ? ব্যাণ্ডেজের দরকার হবে না।

—না, না। রক্ত পড়ছে। গার্গী ব্যস্তভাবে বলল—সেপটিক হয়ে যেতে পারে।

রতনকুমার বসল। আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বসে রইল। গার্গীর হাতের স্পর্শ তাকে শিহরিত করছিল। সে চোখ বুজে রইল। সাদা একফালি কাপড়ে রতনকুমারের ক্ষত মুড়ে দিতে দিতে গার্গী আস্তে বলল—আমার জন্যে আপনি

মার খেলেন। ভাবতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, রতনবাবু। কিন্তু কী করব, আমি মেয়ে। নয় তো⋯...

বলেই সে হঠাৎ থেমে গেল এবং বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—কে গো ?

বারান্দার নীচে চপলা দাঁড়িয়ে আছে।

রতনকুমার উঁকি মেরে দেখল। তারপর একটু হেসে বলল—হাই হেমা-মালিনী! ইধার আও।

চপলা যেমন এসেছিল, তেমনি দ্রুত ফিরে গেল।

ঘোষের ডাঙায় খবর চলে গেছে ততক্ষণে। ঘোষেরা তৈরী হচ্ছে লাঠি-সোটা নিয়ে। বাবুপাড়ার লোকেরা তাদের স্নেহের ফটিককে খুন করেছে শুনে তারা মাথায় ফেট্টি বাঁধছে। চপলা দৌড়ে এসেই বাজারে সবটা শুনেছে এবং নোলে ভটচাযের বাড়ির দিকে দৌড়ে এসেছে।

কিন্তু ভটচাযের মেয়ে বোম্বাইকা বাবুর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে, এ দৃশ্য তার চোখে হুল ফুটিয়েছে। সে বিকৃত মুখে হনহন করে ফিরে যাচ্ছে।

শৈলও দৌড়ে আসছিল খবর পেয়ে। চপলা তাকে আটকে বলল—মিথ্যে। যেও না। ঢঙ মিনসেদের!

শৈলকে টেনে নিয়ে চপলা ঘোষের ডাঙা ফিরে চলল। গিয়েই ওদের বলবে—সব মিথ্যে।

প্রগতি প্রেসের আবছা অন্ধকারে রতনকুমার উঠে দাঁড়াল এবার। কই, চলুন! স্যারের সঙ্গে দেখা করি।

নলিনী আজকাল কথা বলতেও পারেন না। মাঝে মাঝে রক্ত উঠে। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করেন। তখন মধুবাবুর পরামর্শমতো আফিং খাইয়ে দেয় গার্গী। মূর্ছাহতের মতো পড়ে থাকেন নলিনী।

আজ শেষরাতে যন্ত্রণা বেড়েছিল। এখন আফিঙে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন নলিনী। রতনকুমার পা দুটো ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকাল। তারপর গার্গীর দিকে তাকাল।

গার্গী আস্তে বলল—বাবা এখন ঘুমোচ্ছেন। চলুন ভেতরের উঠোনে রোদে বসবেন। চা করব।⋯

॥ আঠারো ॥

আরও দুর্বিপাক, আরও সংশয়

গিরিজাদের মার কতটা গুরুতর, তখনকার মত টের পায় নি রতনকুমার। কিন্তু সেদিনই দুপুর থেকে তার পাঁজর ও ডান পাশের ব্যথা বেড়ে ওঠে এবং সন্ধ্যায় জ্বর এসে যায়। অসহ্য বেদনা হতে থাকে মাথায়। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

অশোক-মন্টুরা দেরি করেছিল হিরোর কাছে আসতে। গার্জেনদের শাসন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল সকাল থেকে। তাছাড়া তাদের নিজেদেরও আতঙ্ক ছিল প্রচুর। কিন্তু কৃতজ্ঞতা অথবা চক্ষুলজ্জা তাদের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল আহত হিরোর কাছে। তারপর ওরা আর সঙ্গ ছাড়ে নি তার। সেবাশুশ্রূষা করেছে। ডাক্তার ডেকে এনেছে। ধনুষ্টংকারের ইনজেকশান দিয়েছেন সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। তারপর বলেছেন, বরং সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো। এক্সরে করা দরকার। মনে হচ্ছে হাড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে।

সন্ধ্যায় রতনকুমারের বাসাঘরের উঠোনে ঘোষের ডাঙার লোকেরাও জড়ো হয়েছিল। তারা মারমুখী। গিরিজাদের ওপর হামলা করবে বলে শাসাচ্ছিল। আর শৈল এসে ভাসুরপোর মাথার কাছে চুপচাপ বসেছিল। গুনগুন করে কেঁদেছিল সারাক্ষণ।

শুধু চপলাই আসে নি।

একবার কিছুক্ষণের জন্যে নোলে ভটচাযের মেয়ে এসেছিল। সবাই তার দিকে এমন করে তাকাচ্ছিল যে সে অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে চলে গেছে।

সন্ধ্যার পর একটা টেম্পোয় শুইয়ে অশোকরা শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেল র'নকুমারকে।

টেম্পো গাড়িটা চলে গেলে হাইওয়েতে কিছুক্ষণ জটলা করল ঘোষের ডাঙার লোকেরা। হরিপদ বলল—থানায় যাওয়া উচিত ছিল নাথুখুড়ো! এর একটা আইনত পিতিকার হওয়া দরকার। চিরকাল বাবুপাড়ার ওনারা এমনি করে জব্দ করবে আমাদের?

নাথু ঘোষ বলল—পুলিশ বুঝি না বাবা। কোনকালে থানাপুলিশ করা অভ্যেস নেই।

শ্যামা বলল—কেন? শৈলকাকিকে নিয়ে যাও। তুমি পাড়ার মুরুব্বী।

ভীম আস্ফালন করে বলল—থানায় যাব ক্যানে? ঠিকই বলেছে নাখু খুড়ো। আমরা খুনের বদলে খুন নোব। শীতুকাকা আজ বেঁচে থাকলে কী হত বলো তো তোমরা?

থুথুড়ে বুড়ো উদয় চিৎকার করে বলল—এই চুপ, চুপ! আমার কথাটা শোনো।

গোলমাল থেমে গেল। নাখু ঘোষ বলল হুঁ, বলো।

উদয় গলার স্বর নামিয়ে বলল—একটা কথা তখন থেকে আমার মাথায় খালি বুজকুড়ি তুলছে, বুঝলে?

—কী, কী?

উদয় হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলল—এই ছেলেটা যদি সত্যি সত্যি শীতুখুড়োর ঔরসে জম্মো নিয়ে থাকে, ক্যানে সে চুপচাপ মার খেল বলোদিনি তোমরা?

নাখু নড়ে উঠে বলল—সেও একটা কথা বটে!

উদয় আরও চেঁচিয়ে বলল—ওর গায়ে কি শীতু ঘোষের রক্ত নেই? যদি থাকে, তাহলে তার পরিচয় পেলুম না ক্যানে বলোদিনি?

সবাই চুপ করে রইল।

অভিজ্ঞ বৃদ্ধ উদয় ফের গলা নামিয়ে বলতে থাকল—বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়, না ছাগল হয়? বাঘের বাচ্চা যেখানেই বড় হোক সে বাঘ হবে। আর এটা তো একটা ছাগল! মার খেল, নিজের রক্ত দেখল—তবু মোনে আগুন জ্বলল না? দাঁত-নখ বের করল না? এ যে অবাক লাগে!

নাখু একটু কেসে বলল—না, না। নেকাপড়া শিখলে বা ভদ্দরজনের ঠাঁই বসবাস করলে সেইরকম হয়। আমার দিবাকরের চালচলন তো দেখছ সবাই। সে কি আমাদের মতন হয়েছে?

উদয় দমে গেল। সবাই এবার নাখুকে সায় দিয়ে বলল—তা ঠিক, তা ঠিক।

উদয় তবু গোঁ ধরে জোরে মাথা নেড়ে বলল—তা বলছ বটে, আমার মোনে কিন্তু যাচ্ছে না। দিবুকে তো কেউ কোনদিন মারেনি, অপমানও করেনি। করলে দিবু কী করত দেখতে পেতুম। দিবু অফিসার হয়েছে বটে, আমার বিশ্বেস—দরকার হলে সে···

তাকিয়ে থামিয়ে দিয়ে রাস্তার ওপাশে আলোআঁধারি জায়গা থেকে কে

বলে উঠল—খুব হয়েছে, বাবা খুব হয়েছে। এখানে বক্তিমে করলে চলবে? দেখগে মোষ খুঁটো উপড়ে পালিয়েছে!

'উদয়ের মেয়ে সুধা। উদয় তক্ষুনি কেটে পড়ল। নতুন কেনা মোষটা কিছুতেই বশ মানছে না। কাছাকাছি মাঠের ধান ইতিমধ্যে কাটা হয়ে গেছে, তাই রক্ষে। তবে দূরের মাঠে গিয়ে পড়তে কতক্ষণ?

ঘোষের ডাঙার লোকেদের এতক্ষণে গেরস্থালী এবং গরুমোষগুলোর কথা মনে পড়ল। তারা ভিড় ভেঙ্গে লণ্ঠনের আলোয় ঠাণ্ডা রাস্তার ধুলোয় পা ফেলে গ্রামের দিকে হাঁটতে থাকল।

গ্রামে ঢোকার মুখে নাখু ঘোষ হঠাৎ বলে উঠল—তা উদয় একটা ধাঁধা ঢুকিয়ে দিলে বটে! আমার দিবু বড় আপিসার, কিন্তু ফটিক তো তা লয়। তার তো কাজের কৈফৎ দিতে হয় না গরমেণ্টোকে। ক্যানে সে চুপচাপ মার খেলে, এ্যাঁ?

দলটা স্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে পল্লীতে ঢুকল। প্রত্যেকের মনে এতদিনে একটা সংশয় জেগে উঠেছে। রতনকুমার কি সত্যিসত্যি সেই ফটিক? আশ্চর্য, সে মার খেয়ে দৌড়ে খবর দিতে আসেনি ঘোষের ডাঙায়—যা কিনা তাদের ছেলে-দের পক্ষে সহজাত প্রতিক্রিয়া, বরং উল্টে মার হজম করে সে গেল নোলে ভটচাযের মেয়ের সঙ্গে তাদের বাড়িতে!

তাছাড়া গিরিবাবুরা তাকে মারল কেন? অশোকরা বলেছে, গিরির স্বভাব। সে নাকি রতনকুমারকে হিংসে করত। রতনকুমারের পোশাক আর জিনিসপত্র গিরির ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। কিন্তু ঘোষের ডাঙা এ কৈফিয়ৎ মানতে রাজী নয়। ইদানীং ফটিকের চরিত্তির নিয়ে অনেক কথা রটেছিল।

নাখু ঘোষের বাড়ির সামনে পৌঁছে দলটা দাঁড়াল। যেন নাখু ঘোষের শেষ কথা শোনার প্রতীক্ষায়। নাখু লণ্ঠনের দম কমিয়ে একটু হেসে বলল—গিরি-বাবুর সঙ্গে দেখা করে বরং জেনে নোব, ক্যানে মারলে ফটিককে!

এই সময় মেয়েদের একটা ভিড় দেখা যাচ্ছিল ওপাশে। কারও কারও হাতে লম্ফ বা হেরিকেন। সেখান থেকে চপলা কয়েক পা এগিয়ে এসে পুরুষগুলোর সামনে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের কোণায় কেমন একটা হাসি। ভুরু কুঁচকে বলল—বললে তো তোমরা আমাকে দুষবে! একেই আমার ওপর সবার দিষ্টি পড়ে আছে! গিরিবাবুরা কেন মারল বোম্বাইকা বাবুকে, বুঝতে পারছ না?

শ্যামা বলল—ক্যানে রে চপলা?

চপলা চোখে ঝিলিক তুলে বলল—আমার বাবা পষ্টাপষ্টি কথা। মার খেয়ে নোলে ভটচাযের মেয়ের সঙ্গে কেন তাদের বাড়ি যায় তোমাদের ফটিক-বাবু, বুঝতে পারছ না?

নাখু হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল—চুপ, চুপ! চেপে যা বাপু!

চপলা বাঁকা হেসে বলল—কেন চাপব? এ তো সবাই জানে। নোলেবাবু বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট করছে। আর ওদিকে তার গুণবতী মেয়ে বোম্বাইকা বাবুকে নিয়ে মেতে উঠেছে। ন্যাকা! সারা দেশ জুড়ে ঢি-ঢি পড়েছে, আর ঘোষের ডাঙা ন্যাকা সেজে আঙুল চুষছে।

নাখু ঘোষ কৌতুকমিশ্রিত ভৎর্সনায় বলল—চুপ্, চুপ হতচ্ছাড়ী! তা আমাদের ফটিক যদি বামুনের মেয়ে ঘরে আনতে পারে, সেও একটা মরদের কাজ!

চপলা চোখে ঝিলিক তুলে বলল—হ্যাঁ, সেও একটা কথা। দিবুদা পারে নি। এবার ফটিকচন্দর যদি পারে!

নাখু গর্জন করে বলল—মুখ সামলে কথা বলবি বলছি!

চপলা হাসতে হাসতে অন্ধকারে মিশে গেল। নাখুর রাগের কারণ সবাই টের পেয়েছে। দিবাকর কলেজে পড়ার সময় শহরে এক বামুনের মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু সাহস করে বিয়ের দিকে এগোতে পারে নি। একটু-আধটু কেলেঙ্কারিও হয়েছিল। তারিণী উকিলের বাড়ি থেকে সে পড়াশুনো করত। আশ্রয়চ্যুত হয়ে শেষঅব্দি বাসে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলেজ যেত।

নাখু ঘোষ গুম হয়ে বাড়ি ঢুকল। ভিড়টাও ভেঙে গেল। আলোগুলো যেন গুহার ভেতর আত্মগোপন করল একে একে। অন্ধকারে হিমে ঘোষের ডাঙা আবার নিস্পন্দ হয়ে গেল। আর সেই নিস্পন্দতার আড়াল থেকে শৈলবালার ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার ক্ষীণধ্বনি ভেসে উঠল এতক্ষণে। পাগল স্বামীর জন্য সে কাঁদছে।

॥ উনিশ ॥

নিঃশব্দ প্রস্থান

শিবু তার ডেয়ারির সামনে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। সে দার্শনিক বা ধার্মিক বা কবিও নয় যে ঈশ্বর কিংবা প্রকৃতি তাকে আবিষ্ট করবে। তার হাতে গুলিভরা দোনলা বন্দুক। শেষ বেলার উড়ন্ত পাখি পাল্লার মধ্যে পেলে তার গুলি করা অভ্যেস।

শীত ফুরিয়ে এসেছে। অদূরে ব্লক আপিসের কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ায় ফুল ফোটার সময় হয়ে এল। এখানে ওখানে শিমূল অবশ্য যথেচ্ছ ফুল ফুটিয়েছে। নয়ানজুলির জল শুকিয়ে গজিয়ে উঠেছে ঘন চিকন দূর্বাঘাস। হাওয়ায় স্নিগ্ধ উত্তাপ। বছরের এ সময়টা দোমোহানীতে মানুষজনের মেজাজ ভালই থাকে।

চৌধুরীদীঘির দিক থেকে একটা শামুকখোল উড়ে এসে ওপাশের মাঠে বসতেই শিবুর চোখ জ্বলে উঠল। আজকাল শামুকখোল দুর্লভ হয়ে গেছে। শুধু শামুকখোল কেন, আর সব পাখিও ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছে যেন। শিবু অবাক হয়েছিল। বহুকাল পরে একটা শামুকখোল দেখতে পেয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে।

শামুকখোলটা বন্দুকের পাল্লার বাইরে। শিবু চঞ্চল এবং সতর্ক পায়ে নয়ানজুলিতে নামল। নয়ানজুলির ওধারে উঁচুতে শেয়াকুলকাঁটার জঙ্গল। ওখানে ঢুকতে পারলে পাখিটা নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে।

কিন্তু সেই সময় রাস্তা থেকে কেউ ডাকল—ছোটবাবু!

শিবু খচে গিয়ে ঘুরল।

চপলা তাকে ডাকছে।—ও ছোটবাবু! বাঘ মারবেন, না ভালুক?

শিবু হেসে ফেলল।—মরণ নেই রে তোর? বেমক্কা পিছু ডেকে ফেললি?

চপলা হাসতে হাসতে বলল—এই অবেলায় জীবহত্যা করতে নেই। চলে আসুন।

শিবু ভুরু কুঁচকে বলল—কী ব্যাপার? পরে শুনব। গিয়ে অপেক্ষা কর তুই।

চপলা রাগ দেখিয়ে বলল—আমার অত সময় নেই!

—তাহলে ভাগ। বলে শিবু নয়ানজুলি থেকে ওপারে উঠল। কিন্তু

হতাশ হয়ে দেখল, শামুকখোলটা উড়ে যাচ্ছে দূরের দিকে। ক্ষুব্ধ হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর সে রাস্তায় ফিরে এল। চপলা দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে শিবুর দিকে।

শিবু বলল—চপলা, তুই মাইরি মারা পড়বি!

—ক্যানে গো ছোটবাবু? হঠাৎ আমার মরণ দেখছেন ক্যানে?

—পাখিটা উড়ে গেল!

—তাহলে আমার বুকেই গুলি মারুন! কী আর করবেন?

—তাই ইচ্ছে করছে। বলে শিবু পকেট থেকে সিগারেট বের করল।

চপলা বলল—দুধ দিয়ে এলাম নটবরকে।

শিবু সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল—আমার মাথা কিনে নিয়েছিস! তো তার জন্যে আমাকে পিছু ডাকার দরকার কী ছিল?

চপলা চোখ নাচিয়ে বলল—ছিল। জানেন আজ টাউনের হাসপাতালে কী হয়েছে?

শিবু কান করে বলল—কী রে?

—আপনাদের নোলে ভটচাযের মেয়ে গিয়েছিল বোম্বাইকা বাবুকে দেখতে।

—বলিস কী! কে বলল রে?

—কে আবার বলবে! আমি নিজে দেখে এলাম। আপনার দিব্যি।

—তাহলে তুইও ওকে দেখতে গিয়েছিলি?

—গিয়েছিলাম।

—গিয়েছিলি!

—হুঁউ।

শিবু একটু হেসে বলল—ভাল। যাবি বৈকি। তোকে কী নাম দিয়েছিল যেন!

—হেমামালিনী।

—বাঃ! শিবু পা বাড়িয়ে বলল—তারপর?

চপলা চাপা গলায় বলল—শৈলকাকী বলেছিল, একবার দেখে আসিস। তাই গেলাম। নেহাৎ পাড়ার লোক তো বটে। ওমা, বাবু কেবিন ভাড়া করে আছে। বুকেপিঠে পেলাসটার বাঁধা। পাঁজরার একটা হাড় ভেঙেছে নাকি। আর……

ওকে থামতে দেখে শিবু বলল—আর ?

—মুখের কাছে মুখ রেখে কথা বলছে নোলে ভটচাযের মেয়ে।

—তারপর ?

—দরজা থেকে দেখেই চলে এলাম।

—তোকে দেখতে পেল না ?

—না। চপলা বাঁকা হাসল—তখন তো দুজনে নেশার ঘোরে আছে!

শিবু একটু পরে বলল—হুঁ। বুঝলুম।

—কী বুঝলেন শুনি ?

—তোর হিংসে হয়েছে।

চপলা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।—যা-তা বলবেন না ছোটবাবু! আমার মুখ খারাপ!

শিবু হাসতে লাগল। তারপর বলল—জানিস গিরি এসেছিল সেদিন! জিজ্ঞেস করলুম, বোম্বাইকা বাবুকে মারলে কেন হে গিরি? গিরি বলল, দাদা, চাঁদে হাত বাড়িয়েছে জানেন না! ওই হাত ভেঙে দেওয়া উচিত কি না বলুন ?

চপলা বলল—কী বললেন আপনি ?

—বললুম, তা বলে খুনখারাপি করো না হে। বরং অন্যভাবে ওকে তাড়াবার ব্যবস্থা করো।…

ডেয়ারির গেটের সামনে পৌছে চপলা বলল—চলি ছোটবাবু। তারপর হনহন করে চলে গেল।

শিবু ঠোঁটে হাসি নিয়ে গেট খুলে ভেতরে গেল। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। আলো জ্বলেছে তার ঘরের বারান্দায়। দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়েছিল সে।

তালা খুলে ঘরে ঢুকল শিবু। বন্দুকটা রেখে বেরিয়ে এল। ইজিচেয়ারে বসে রইল চুপচাপ। চপলার কথা শোনার পর সে অস্থির হয়ে উঠেছে। নলিনীর মেয়ে একটা আজেবাজে লোকের সঙ্গে প্রেম করবে! এটা শিবুর পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। তার জাত্যাভিমান বরাবর উগ্র। তার সংস্কারে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে। সে অস্থির। মনে হচ্ছে শিগগির একটা কিছু করা দরকার।

কিছুক্ষণ পরে সে বেরুল।

শিবু বরাবর বড্ড জেদী মানুষ। তার মুখ দেখে ভেতরটা বোঝা যায় না।

মুখে হাসি রেখে সে অনায়াসে চরম শত্রুতা করে যেতে পারে। তাছাড়া আগাগোড়া সে ওই উড়ো ছোকরাকে বরদাস্ত করতে পারে নি। রতনকুমারের পোশাক-আশাক, হাবভাব, ইংরেজি বুলি শিবুর অসহ্য লেগেছে। এখন মনে হচ্ছে, গিরিজারা একেবারে শেষ করে দিতে পারল না কেন ওকে? ব্যাটার এত স্পর্ধা, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে হাত বাড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত! শীতু ঘোষের ছেলে হয়ে নলিনী ভটচাযের মেয়ের সঙ্গে আসনাই!

অসহ্য ক্রোধে শিবুর চোয়াল আঁটো হয়ে গেল। নলিনীবাবু মারাত্মক রোগে শয্যাশায়ী আর তার মেয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছে! এ হারামজাদীকেও গুলি করে মারা উচিত নয় কি?

শিবু প্রগতি প্রেসের সামনে দাঁড়াল। বাড়ি অন্ধকার কেন? বাঁশের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে সে চড়া গলায় ডাকল—গাগু! গাগু!

সাড়া এল না। তখন সে ভেতরে ঢুকল। বারান্দায় উঠে শিবু একবার কাসল। তখন ভেতর থেকে মেয়েলী গলায় কে বলে উঠল—গাগুমা ফিরলে নাকি?

শিবু গলা চড়িয়ে বলল—না। আমি শিবু।

লণ্ঠন হাতে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা দরজা খুলে শিবুকে দেখে বললেন—কে বাবা আপনি? গাগু তো এখনও ফেরে নি।

শিবু বলল—আমি নলিনী জ্যাঠাকে দেখতে এসেছি।

—আসুন ভেতরে আসুন। দাদা ঘুমোচ্ছেন।

—আপনাকে তো চিনলুম না?

—আমি গাগুর কেশেভাঙার মাসি। কাল এসেছি।

ভদ্রমহিলা বিধবা। শিবু সেটা লক্ষ্য করে বলল—কিন্তু বাড়িতে তো ইলেকট্রিক ছিল!

গাগুর মাসি আড়ষ্ট হেসে বললেন—ওসব কলকব্জার ব্যাপার। আমার ভয় করে বাবা। তাই হাত দিই নি। গাগু এসে জ্বালাবে বরং।

শিবু দেয়ালে সুইচবোর্ড খুঁজে সুইচ টিপল। এটা প্রেস ঘর। একটা মলিন বাল্ব যেন ঘুম থেকে জেগে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। পাশের ঘরে ঢুকে শিবু সুইচ টিপে আরেকটা আলো জ্বালিয়ে দিল। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দু'পাশে দুটো খাট। এপাশেরটায় নলিনী কুঁকড়ে শুয়ে আছেন। চোখ বুজে রয়েছে। আর মুখের কষ থেকে বিছানা অব্দি চাপ-চাপ রক্ত জ্বলজ্বল করছে।

শিবু একটু ঝুঁকে নলিনীর একটা হাত নিয়ে নাড়ি দেখল। স্পন্দন নেই। শরীর হিম।

গাগুর মাসির চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। কাঁপা কাঁপা গলায় কী একটা বললেন, শিবু বুঝতে পারল না। সে বলল—আপনি লক্ষ্য রাখেন নি, বুঝতে পারছি। কী করছিলেন?

গাগুর মাসি ধরাগলায় বললেন—কেন বাবা? আমি রান্না করছিলুম বারান্দার উনুনে। কী হয়েছে? অত রক্ত কেন?

শিবু বলল—নলিনী জ্যাঠা মারা গেছেন।

গাগুর মাসি চেরা গলায় চিৎকার করে উঠলেন। শিবু আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। খবর দেওয়া দরকার সবাইকে। সে ব্যস্তভাবে হেঁটে রাস্তায় পৌঁছতেই দেখল, গার্গী হন্তদন্ত আসছে।

গার্গী তাদের বাড়ি থেকে শিবুকে বেরুতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। শিবু জ্বলজ্বলে চোখে তার দিকে তাকাতেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল।...

তারপর গার্গীর কানে এল অনু মাসির কান্নার শব্দ। কিন্তু সে ব্যস্ত হল না। আস্তে হেঁটে বাড়ি ঢুকল।

॥ কুড়ি ॥

চক্রান্ত ও কল্পনা

প্রখ্যাত পল্লী-সাংবাদিক নোলে ভটচায নিঃশব্দে প্রস্থান করলেন বটে, কিন্তু এতকাল বাদে নিজের প্রাপ্য সম্মান সুদেআসলে পুষিয়ে নিয়েই গেলেন যেন।

এত বড় শবযাত্রার মিছিল কস্মিনকালে এ তল্লাটে দেখা যায় নি। আসলে সবটাই শিবুর খেয়াল হয়তো। নাকি সে এভাবেই গার্গীকে বোঝাতে চেয়েছিল যে তুমি কত বিরাট মানুষের মেয়ে! ওই শীতু ঘোষের বোম্বেটে ছেলের সঙ্গে মাখামাখি তোমার সাজে না!

হয়তো তাই-ই। সে-রাতে মড়া শ্মশানে না নিয়ে গিয়ে জনসাধারণের শেষ দর্শনের জন্য শিবু আটকে রেখেছিল। তার পাশে গিরিজা ও তার দলবল। সারারাত তারা বাইরের বারান্দায় তাস পিটেছে এবং মড়া আগলেছে। শিবুও থেকেছে তাদের সঙ্গে। তারপর সকালে দেখা গেছে এক বিরাট দৃশ্য। গিরির হুকুমে ননীবাবুর বালক সংঘের ব্যাণ্ডপার্টি কালো ব্যাজ পরে এসে সার

বেঁধে দাঁড়িয়েছে। সাধু খাঁ ট্রান্সপোর্টের দুটো ট্রাক আর একটা টেম্পোও হাজির হয়েছে। গজাননের কেত্তুনে দল পাশের গাঁ থেকে এসে প্রচণ্ড উৎসাহে খোল বাজিয়ে কেত্তন জুড়েছে। রাতে খবর পেয়ে আসতে পারে নি বলে গজানন সেটা পুষিয়ে দিচ্ছে বৈকি।

তারপর শবযাত্রা শুরু হয়েছে। দশ কি. মি. দূরে গঙ্গার ধারে শ্মশানে হেমেন ভোরবেলা থেকে বসেছিল। আয়োজনে ত্রুটি রাখে নি শিবু। সারাপথ উচ্চকিত করতে পেরেছিল মানুষকে।

কিন্তু কু-লোকে রটায়, এর মধ্যে দোমোহানীর আমোদগেঁড়েদের ট্রাডিশনাল তামাসাই ছিল বেশি। এ যেন নোলে ভটচাযকে উল্টে অপমান!

তবে এই তামাসাবাজীর অন্যদিকে যথার্থ শ্রদ্ধাও ছিল। পরদিন স্কুল ও স্থানীয় সব আপিসে ছুটি ঘোষিত হয়েছিল। শহরের পত্রিকায় বড় করে শোক-সংবাদ বেরিয়েছিল। একটি পত্রিকা রীতিমতো সম্পাদকীয় লিখে শোকপ্রকাশ করেছিল। তাছাড়া শ্রাদ্ধের পরদিন স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি শোকসভা হয়। তাতে কেউ ৺নলিনীকে 'সমাজ-সমার্জনী', কেউ 'পল্লী-বিবেক' আখ্যায় ভূষিত করেন। হেমেন তো কেঁদেই ফেলেছিল। অবশ্য গার্গী এ সভায় যায় নি। পরে হেমেন সভার পক্ষ থেকে তাকে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের একটা কারবন-কপি দিয়ে যায়। তার মধ্যে দুটি প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য। এক: নলিনীর আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা। দুই: পল্লীবার্তার পুনঃপ্রকাশ করে ৺নলিনীর আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন।

হেমেনের এই দুনম্বর প্রস্তাবে আগ্রহ বেশি। কিন্তু প্রগতি প্রেস ঋণের দায়ে সরকারের কাছে বাঁধা। সময় বুঝে কুটিরশিল্প দপ্তর চরম নোটিশ ঠুকেছে। হেমেন গতিক বুঝে লেজ তুলে পালিয়েছে। শিবু তাকে ৺নলিনী স্মৃতিরক্ষা তহবিলের রসিদ ছাপিয়ে আনতে বলেছিল। সে শিবুর ছায়া মাড়ায় না।

কিন্তু শিবুর এত উৎসাহ কেন? লোকের চোখে না পড়ে পারে না। সেই কবে একানড়ে স্বভাবের শিবু চক্কোতি পৈতৃক ভিটে ছেড়ে মাঠে রাস্তার ধারে ফার্মহাউস করেছে, তারপর পারতপক্ষে সে দোমোহানী ঢোকে না। জ্ঞাতিদের সঙ্গে কথা বলে না। তার জ্যাঠা অক্ষয়বাবু বলতেন—শিবেটা অজেতে ছেলে। বামুন হয়ে শুদ্দুরের কাজ করে। দেখবে, পরিণামে কী হয়!

কিছুই তো হল না আজ অব্দি। শিবুর ফার্মে এখন চল্লিশটে দুধেল গরু। হাঙ্গেরিয়ান পিতার ঔরসজাত হরিয়ানা ষাঁড় সেই আলেকজাণ্ডারও শিবুকে পয়সা দেয়। এলাকার কত গরুর বাবা হতে চলেছে আলেকজাণ্ডার। আড়ালে

শিবুর নামেও এমন গুজব আছে। মজার কথা, নোলে ভটচাযও একবার পল্লীবার্তায় আভাসে কটাক্ষ করেছিলেন। উপলক্ষ্য ছিল আলেকজাণ্ডার। 'গ্রীক সম্রাটের দোমোহানী জয়' হেডিংয়ে একটি অনবদ্য রসরচনা বেরিয়েছিল। শিবু তো চটে লাল। সামনাসামনি শাসিয়ে গিয়েছিল। নোলে ভটচায পরে বলেছিলেন,—সাধে কি শিবেকে ষণ্ড বলেছি? মাথায় গোবর পোরা। রসবোধ নেই এতটুকু। আরে বাবা, সে-শিব কি তুই? একড়ি চক্কোত্তির এই গর্ভস্রাবটিকে মিথলজি পড়াবে কে বলোদিকি? স্বয়ং মহাদেবের বাহন নন্দী নামে একটি ষণ্ড। আমি লিখেছি, মর্তে সেই নন্দীই গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল।

রতনকুমারের ওপর বেজায় চটে গিয়ে সেই নোলে ভটচায শিবুর দারস্থ হয়েছিলেন একদিন। সেকথাও সবাই জেনে যায় ক্রমশ। নোলে ভটচায যে পিটিশনের খসড়া করেছিলেন, তা এখনও শিবুর কাছে আছে। পিটিশনটায় একগাদা সই করিয়ে ডি. এমের কাছে পেশ করলেই রতনকুমারকে পাকড়াত পুলিশ। তারপর বিনা বিচারে জেলে পচে মরত দিনের পর দিন।

এতদিনে শিবু সেই পিটিশনের খসড়া বের করে ভাবতে বসেছে। গিরিজাকে বকে দিয়েছে একহাত। ব্যাটাকে ভুলোধোনা যখন করলি, তখন সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়ে এজাহার ঠুকে দিলিনে কেন? বললিনে কেন, তোদের ওপর হামলা করেছিল বলেই তোরা নেহাৎ আত্মরক্ষা করেছিস? গিরিজা বলেছে—ভেবেছিলুম মার্ডার হয়ে গেছে। তাই থানায় যাইনি শিবুদা। আর তুমি তো জানো, এ গিরি পুলিশের কাছে যায় না। পুলিশই তার কাছে আসে।

রতনকুমার এখনও হাসপাতালে। সেটাই বাধা। শিবু খবর নিয়েছে, রতনকুমার হাসপাতালের ডাক্তারদের বলেছে, চলন্ত বাস থেকে পড়ে গিয়েছিল। অশোকরা সাক্ষী।

ঠিক আছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিবু মনেমনে ঘোঁট পাকায়। হঠাৎ মাথায় আসে, চপলাকে ভুলিয়েভালিয়ে কাজে লাগানো যায় না কি? শিবু বোঝে, চপলা প্রবল ঈর্ষায় জ্বলছে ইদানীং। গার্গীর সঙ্গে রতনকুমারের একটা সম্পর্ক আঁচ করে সে ভেতর-ভেতর ফুঁসছে। শিবু মেয়েমানুষের এসব ব্যাপার ভালই বোঝে। সারাজীবন তার কতরকম মেয়েমানুষ নিয়ে কেটে গেল। মেয়েমানুষকে সে বিশ্বাস করে না। মেয়েদের মতি একধরণের নিষ্ঠুরতাও তার মনে সেই কৈশোর

থেকে লালিত হচ্ছে। তার পারিবারিক জীবন আদৌ সুখী ছিল না। তার মা অমৃতার কলঙ্কের কথা বুড়োবুড়ীদের এখনও মনে আছে। তা নিয়ে গাজনে সে-আমলের 'চারণকবি' মাধব ভটচায ওরফে মেধোঠাকুর ছড়াগান রচনা করেছিলেন পর্যন্ত! শিবু তখন ছোট। কিন্তু এখনও ভোলেনি কিছু। তার স্ত্রী সুলতা একবার ঝগড়ার মুখে সেই খোঁটা তুলেছিল বলে শিবু সেই যে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, আর নিয়ে আসে নি। তবে মাসে মাসে খরচ পাঠাতে ভোলে না। জীবনের কতকগুলো ক্ষেত্রে শিবু আশ্চর্যরকমের নিয়মনিষ্ঠ এবং নীতিবাদী। শুধু লাম্পট্যে সে বেপরোয়া। বিবেকবর্জিত মানুষ।

নোলে ভটচাযের মৃত্যুর পর তাকে এবেলা-ওবেলা গার্গীর ভালোমন্দ খোঁজ-খবরে আসতে দেখা যাচ্ছে। নজর রাখা যাদের স্বভাব, তারা চায়ের দোকানে বা এখানে-ওখানে আড্ডায় সেই নিয়ে গাপুর-গুপুর করছে। আর স্বৈরিনী দুরন্ত মেয়ে চপলা তো শিবুর মুখের ওপর বলে দেয়—কী ছোটবাবু? বোম্বাইকা বাবুর সঙ্গে টেক্কা দেবেন ভেবেছেন নাকি? সে সাধ্যি আপনার নেই!

শিবু সকৌতুকে বলে—কেন রে?

—তাহলে ওইরকম করে চুল রাখুন। ঢোলা-ঢোলা দামী রঙবেরঙের পেণ্টুল পরুন। চকরাবকরা জামা চড়ান গায়ে। তবে না!

—ভাগ্! কী যে বলিস তুই!

চপলা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে—যতই চেষ্টা করুন। নোলে ভটচাযের মেয়ের মন পাবেন না!

শিবু হাসে।—তোর মাথা খারাপ চপলা? আমার বউ আছে না! বউ থাকতে আর বিয়ে করা বেআইনী, জানিস? নেহাৎ স্বজাতির মেয়ে। অরক্ষণীয়া। তাই দেখাশোনা করতে হয় বৈকি।

চপলা চোখ নাচিয়ে বলে—হুঁ, করুন। কিন্তু আর কদ্দিন? বোম্বাইকা বাবু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই কী হয় দেখবেন।

শিবু ভুরু কুঁচকে সিরিয়াস হয়ে বলে—কী হবে রে চপলা?

—বোম্বাই চলে যাবে দুজনে।

—যাঃ!

—যাঃ নয়, আপনার দিব্যি।

শিবু গলার ভেতর বলে—তোকে বলেছে বুঝি?

চপলা রহস্যময় চাউনি ও হাসির সঙ্গে বলে—হুঁউ।

শিবু তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফের বলে—তোকে বলেছে? কে বলেছে?

—কেউ না। বলে চপলা হনহন করে বারান্দা থেকে নেমে চলে যায়। গেট অব্দি গিয়ে সে একবার ঘোরে। বুড়ো আঙুল নাড়ে শিবুর দিকে। তারপর গেট খুলে রাস্তায় নামে। দ্রুত চলতে থাকে বাজারের দিকে।

শিবু উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ধুপ করে বসে পড়ে ইজিচেয়ারে। হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাক দেয়—টগ্‌রী! এ্যাই টগ্‌রী!

বাউরিপাড়ার যুবতী মেয়েটি আটচালায় গোবর সাফ করছিল। গোবর-মাখা হাতে দৌড়ে আসে।—ছোটবাবু!

—ওবেলা গণশাকে একবার আসতে বলবি।......

গণেশ বাউরি কুখ্যাত সিঁদেল চোর। শিবুর খামারে সে মাঝে মাঝে মজুর খাটতে আসে। তার বউ টগর এখানে দুবেলা নিয়মিত গোবর সাফ করে। কিছু গোবর ঘুঁটে হয়, কিছুটা সার। টগর কোন কোন দিন একটু রাত করেই বাড়ি ফেরে। খামারে সবাই জানে, টগর ছোটবাবুর সঙ্গে একঘরে কিছুক্ষণ নিরিবিলি কাটায়। তাতে ওদের কী? বড়লোকের ব্যাপারে নাক গলানোর মানে হয় না। বিশেষ করে শিবু চক্কোত্তি এক দুর্ধর্ষ ডিকটেটর নিজের রাজ্যে। আর, নীতি-দুর্নীতির বোধ কি তাদের গরীবের পেট ভরাতে পারবে? তারা জেনে গেছে, পৃথিবীটা এরকমই। আপাতত অন্যরকম হয়ে ওঠার লক্ষণ নেই। বরং অবস্থা দেখে আরও ভয় করে। অতএব ছোটবাবু-বড়বাবুদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে লাভ নেই।

পরদিন গার্গীর শোবার ঘরে সিঁদ কেটে চোর ঢোকার খবর দোমোহানীতে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু চোর কিছু নেবার সুযোগ পায় নি। গার্গীর মাসি জেগে গিয়েছিলেন। এই বিধবার হাবভাবে বোকা-বোকা মনে হলেও ইনি অতি সাহসী তাতে সন্দেহ নেই। চোরের চুল খামছে ধরেছিলেন। কিন্তু চুলের বদলে একটুকরো ন্যাকড়া হাতে থেকে গেল। সিঁদেল চোরের মাথায় সচরাচর চুল থাকে কম। থাকলেও তাতে আঁটো করে ন্যাকড়া টুপির মতো আটকে থাকে। সেই নিয়েও হাসাহাসি হল খুব।

পরের রাতে অন্য উপদ্রব। উঠোনে ঢিল পড়ল প্রচুর। সকালে একঝুড়ি ঢিল ছাইগাদায় ফেলে দিলেন গার্গীর মাসি। তারপর বললেন—ও গাগু, গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না মা। বরং সব বেচেখুচে দিয়ে আমাদের হরিপুরে চলো।

ভাল জায়গা। একেবারে পাড়াগাঁ। বাজার জায়গা মানেই দুষ্ট লোকের বাস। এখানে বাস করতে আছে?

গার্গী একটু চুপ করে থেকে বলল—এখানে থাকা হবে না, তা তো জানিই মাসিমা। তাই চেষ্টা করছি, শহরে গিয়ে থাকব বরং।

অনুমাসি চোখ কপালে তুলে বললেন—সে কী গো?

হ্যাঁ, মাসিমা। বাবার এক বন্ধু আছে টাউনে। একটা ছোটখাটো বাড়ি তাঁর সন্ধানে আছে বলেছেন। দেখা যাক।

—শহরে বাড়ি দাম যে অনেক, শুনেছি গাগু।

গার্গী একটু হেসে বলল—বাবার ইনসিওরেন্সের টাকাটা পেতে দেরি। প্রেসটা গভমেণ্টকে হ্যাণ্ড-ওভার করব। তারপর এ বাড়িটা বেচতে অসুবিধে হবে না। দোমোহানীতে রাস্তার ধারে এসব জায়গার এখন প্রচুর দাম।···

এর কিছুক্ষণ পরে হন্তদন্ত হয়ে শিবু চক্কোত্তি এসে হাজির।—এ কী শুনছি গাগু! তোমাদের বাড়িতে নাকি সিঁদ কেটেছে? আমায় খবর দাও নি কেন?

গার্গী শান্তমুখে বলল—বসুন শিবুদা।

শিবু বসে বলল—আজ নাকি ঢিল পড়েছে শুনলুম?

—হ্যাঁ। গার্গী ছোট্ট করে জবাব দিল।

শিবু ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বলল—মনে হচ্ছে, কেউ তোমাদের পিছনে লেগেছে। কাকে সন্দেহ হয়, বলো। উচিত-ব্যবস্থা করছি। বলো কাকে সন্দেহ হয় তোমার?

গার্গী আনমনে বলল—কাকে সন্দেহ করব? কাকেও সন্দেহ হয় না।

অনুমাসি দ্রুত বলে উঠলেন—আমি বলছি বাবা। ও সেই গিরি গুণ্ডার কাজ। গুখেকোর ব্যাটা একদিন ওই বাঁশবনে গাগুকে চেপে ধরেছিল। ভাগ্যিস, বোম্বাইফেরত ছেলেটা না গিয়ে পড়লে···

গার্গী বাধা দেবার আগেই এতখানি বলে ফেললেন অনুমাসি। গার্গী তাকে সব কথা বলেছিল। কিছু গোপন রাখে নি। অনু দেবী দূরসম্পর্কের মাসি হলেও মায়ের মতোই স্নেহশীলা। দুঃখের দিনে আবেগের বশে গার্গী তাঁকে র জীবনের সব ঘটনা শুনিয়েছে। কিন্তু ভদ্রমহিলা মুখফসকে যেন এ ব্যাপারটা উগরে দিলেন। বাধা পেয়ে কাঁচুমাচু মুখে পায়ের কাছে দৃষ্টি রাখলেন।

শিবু বলল—হুঁ। বুঝলুম। ঠিক আছে গাগু, ভেবো না। গিরিকে শায়েস্তা করে দিচ্ছি।

গার্গী ব্যস্তভাবে বলল—না, শিবুদা। গিরিকে তো আমরা দেখি নি। খামোকা তাকে ঘাঁটাবেন না প্লীজ। ছেড়ে দিন। আমরা আর দোমোহানীতে থাকব না ঠিক করেছি।

শিবু চমকে উঠল।—থাকবে না মানে? কেন থাকবে না?

—শিবুদা, বরং এ বাড়ির খদ্দের দেখে দিন আপনি।

—গাগু, নলিনীকাকা নেই। কিন্তু আমরা—মানে আমি তো আছি। ওসব দুর্ভাবনা কোরো না। আমার ক্ষমতার কথা আশা করি জানো। আমি তোমার মাথার কাছে দাঁড়ালে কারও সাধ্য নেই উৎপাত করে।

অনুমাসি আগু বাড়িয়ে বললেন—সেই তো কথা। আমি মেয়েকে বুঝিয়ে পারিনে। বরং এক কাজ করো না, বাবা! গাগুর উপযুক্ত একটা বর ঠিক করে দাও। জামাই এসে এবাড়ি থাকবে। বাস, নিশ্চিন্ত!

গার্গী চাপা গলায় বলল—আঃ, কী হচ্ছে মাসিমা!

অনুমাসি দমলেন না।—বাবা, তুমি স্বজাতির ছেলে। এ তোমার কর্তব্য কি না বলো! দোমোহানীতে তো অনেক বামুন ভদ্রলোকের বাস। তাদের অনেক শিক্ষিত ছেলে আছে বৈকি। বাবা শিবনাথ, মেয়ের উদ্ধারের ব্যবস্থা করো তুমি। না, না—আমি ওর মাথামুরুব্বী এখন। গাগু কী বোঝে?

শিবু হাসল।—সেকথাই তো ভাবছি কবে থেকে। বুঝলেন মাসিমা? ঠিক আছে। শিবু যা বলে তা করে। তাই হবে।

শিবু পা বাড়ালে গার্গী ডাকল—শিবুদা, শুনুন!

—বলো।

গার্গী গম্ভীরমুখে বলল—আমার বিয়ের ভাবনা নিয়ে আপনার ব্যস্ত হবার কারণ নেই।

শিবু হাসতে হাসতে বলল—চিরকুমারী থাকবে ভাবছ নাকি?

—কিছু ভাবি নি। শুধু বলছি, এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

শিবুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। বলল—ঘামাতে হচ্ছে যে গাগু! এখনও তো দেশ থেকে সমাজ জিনিসটা উবে যায় নি। তাছাড়া হাজার হলেও এটা পাড়াগাঁ। পাঁচকথা রটতে দেরি হয় না। বিশেষ করে নোলেকাকা ছিলেন

একটা দেশখ্যাত শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর মেয়ের সম্পর্কে নানা কথা কানে এলে আমাদের মাথায় আগুন ধরে যায়। ইচ্ছে করে…

শিবু উত্তেজনা মুহূর্তে দমন করে ফের বলল—অন্তত নোলেকাকার সম্মান রাখতে একটা কিছু করা দরকার।

অনুমাসি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। গার্গী আস্তে বলল—কী কথা কানে আসছে শিবুদা?

শিবু একটু ইতস্তত করে চাপা গলায় বলল—সত্যিমিথ্যে তুমিই জানো। তুমি নাকি হাসপাতালে শীতু ঘোষের ছেলেকে দেখতে যাও প্রায়ই।

—হ্যাঁ, যাই।

—যাও তাহলে?

—হ্যাঁ। কারণ আমার সম্মান বাঁচিয়েছিল বলেই তাকে গিরি মেরেছে, জানেন?

—জানি না। জানলুম। শিবু বাঁকা হাসল। তবে কৃতজ্ঞতাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

গার্গী ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল—সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

শিবু মুখ তুলে বলল—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারুর নাক গলানো পছন্দ করিনে।

শিবু শুধু 'ও' বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। প্রেস ঘরের টুলটা তার পায়ে লেগে নড়ে উঠল। অনুমাসি কী ভাবলেন, ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ওদিকের বারন্দায় চলে গেলেন।

॥ একুশ ॥

একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ

কদিন পরে সন্ধ্যাবেলা অনুমাসি গেছেন রায়বাড়িতে সিংহবাহিনীর আরতি দেখতে। গার্গী তার পড়ার বই নিয়ে বসেছে। সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন অনুপমা। গার্গী যায় নি। চুরির ভয়ে আজকাল সে ভারি সতর্ক। রাতে বিছানার পাশে একটা কাটারি রাখতে ভোলে না। এই কাটারিটা নলিনী ফুলবাগিচার ডালপালা আর ঘাস ছাঁটতে ব্যবহার করতেন। এখন গার্গীকে সাহস যোগাচ্ছে সেটা।

প্রেসের দিকের দরজা আটকানো রয়েছে। উঠোনের দিকটা প্রায় অন্ধকার। এ ঘরের চল্লিশ ওয়াটের বাল্ব থেকে হলদে খানিক আলো বারান্দায় পড়েছে। একটা বেড়াল চুপচাপ বসে আছে সেখানে।

কোথাও একটা আবছা শব্দ হল। গার্গী চমকে উঠল। আজকাল একটুতেই সে চমকে ওঠে। বুক কাঁপে। শরীর ভারি লাগে। খালি মনে হয়, আড়ালে তাকে কেন্দ্র করে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শিবুর লম্বাটে চেহারাটা অস্পষ্ট টের পায় সে। ভয়ে কুঁকড়ে যায়। শিবুর সম্পর্কে তার আতঙ্ক ছোটবেলা থেকে।

ফের শব্দটা শুনল সে। মনে হল, বারান্দায় কেউ হাঁটছে। নিষ্পলক তাকিয়ে রইল বারান্দা আর উঠোনের দিকে। বাবার মৃত্যুর পর কিছুদিন ভূতের ভয়ে অস্থির থাকত গার্গী—বিশেষ করে রাত্রিবেলা। মনে হত, মৃত্যুর সময় কাছে ছিল না বলে বাবার আত্মা ভীষণ ক্ষুব্ধ। হয়তো হঠাৎ দেখবে ৺নলিনী লাল চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কুকুর কি? গার্গী কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—যাঃ! যাঃ! কিন্তু কুকুর কীভাবে ঢুকবে? খিড়কির দিকটায় কবে থেকে দরজা বন্ধ করা আছে। পারতপক্ষে খোলা হয় না ওদিকটা। ডোবা আর জঙ্গলে ভর্তি। তার ওপাশে ইটখোলা। বিশাল খাদগুলো জলে ভর্তি। চোর ছাড়া অন্য কেউ ও-পথে বাড়ি ঢোকার চেষ্টা করবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ সব। তখন গার্গী ফের পড়ায় মন দিল। নিশ্চয় কানের ভুল। তবু অস্বস্তিটা গেল না তার। একটু পরে হঠাৎ তার মনে হল, কেউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আলোর ফালিটুকুর ধার ঘেঁষে সে অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। সাহসে ভর করে সে অন্ধকারের দিকটায় চোখ রাখল। তারপরই কেউ তাকে চাপা গলায় ডাকল—গাগু!

—কে? বলে উঠে দাঁড়াল গার্গী। তারপর দরজার কাছে এগোল। তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সে ফের 'কে' বলার সঙ্গে সঙ্গে কেউ দরজার ওপাশ থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মেঝেয় ফেলে দিল।

গার্গী ওঠার চেষ্টা করছিল। আতঙ্কে তার গলায় স্বর নেই। সেই মুহূর্তে আততায়ী সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

ততক্ষণে গার্গী তার উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছে। পাশেই তক্তপোষে তার

বিছানা। তক্তপোষের এদিকের পায়ার কাছে কাটারিটা রাখা ছিল। তার ওপর লোকটা যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গার্গী হাত বাড়িয়ে কাটারিটা পেয়ে গেছে।

কাটারির প্রথম চোট খেয়ে লোকটা ছিটকে সরে গেল।

গার্গী অন্ধকারে অনুমান করে কাটারি চালাতে থাকল উন্মত্তের মতো। লোকটা এবার চাপা আর্তনাদ করে দরজার দিকে এগোচ্ছিল। তার গলায় অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছিল। শব্দটা লক্ষ্য করে গার্গী প্রচণ্ড জোরে কাটারির কোপ বসাল। লোকটা 'বাপ রে' বলে চিৎকার করে বারান্দায় গিয়ে পড়ল।

গার্গী হাঁফাতে হাঁফাতে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে সুইচ টিপল।

উবুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে চৌকাটের ওপাশে গোঙাচ্ছে লোকটা। পরনে বাটিকের কাজকরা লুঙি। চাপ-চাপ রক্ত জলজ্বল করছে। খালি গা। হাতে স্টিলের বালা। ঘাড়ের দিকে সোনার চেন চিকচিক করছে।

গিরিজা!

চেনামাত্র গার্গী রক্তাক্ত কাটারিটা তুলে ফের তার ঘাড়ের কাছে কোপ বসাল। গিরিজা একটা জান্তব শব্দ করে উবুড় হয়ে হাত ছড়িয়ে পড়ে গেল।

তবু ক্ষান্ত হল না গার্গী। হত্যার নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। বার বার আঘাত করতে থাকল। রক্তে ভেসে গেল বারান্দা। গিরিজার গোঙানি আস্তে আস্তে থেমে গেল। ছিলেছাড়া ধনুকের মতো একটা খেঁচুনির পর তার শরীর বেঁকে ফের সোজা হল। গার্গীর মাথা ঘুরে উঠল এতক্ষণে। সে কাটারিটা ফেলে দিয়ে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেল।

কতক্ষণ পরে তার চেতনা ফিরে এল। কিন্তু প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারল না—কেন এমন বেয়াড়া ভঙ্গীতে সে শুয়ে আছে? তারপর চমকে উঠল। তার হাতে এবং শাড়িতে চাপ-চাপ রক্ত। সঙ্গে সঙ্গে সব মনে পড়ে গেল। সে দম-দেওয়া পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল।

যেন এক অমানুষিক শক্তি তাকে ভর করেছে। আজ এই ভীষণ সন্ধ্যায় পৃথিবী তার কাছে অন্যরকম চেহারা নিয়ে এসেছে। সে স্থির দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে গিরিজার রক্তাক্ত শরীরটা দেখল। তারপর শূন্যদৃষ্টে এপাশে-ওপাশে তাকাল। দেয়াল আঁকড়ে ধরল।

নীলমণি দারোগা সবে চণ্ডীতলা থেকে ফিরে থানার উঠোনে চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছেন। গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা খুনোখুনি বেড়ে যাচ্ছে। চণ্ডীতলায় বর্গাদার-জোতদার সংঘর্ষ ঘটেছে সম্প্রতি। একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা আছে কবে থেকে। মানলে তো লোকে! গাঁ-গেরামে আইনের শাসন কোন-কালেই ছিল না। এখন তো একেবারেই নেই। জোর যার মুলুক তার অবস্থা। এত বড় দোমোহানী থানা এলাকা শায়েস্তা ক'রে রাখতে যত পুলিশ দরকার তত নেই। তার ওপর ওই রাজনীতি। কোনরকমে চাকরি রক্ষা করে যাচ্ছেন নীলমণি। ঘুষের খবর নিয়ে লাভ কী? ঘুষ দেওয়াটাও বুঝি দুর্নীতি নয়?

থানার প্রাঙ্গণে চমৎকার একটা ফুলবাগিচা আছে। বসন্তকালের সন্ধ্যাবেলাটা বেশ সুগন্ধে ম-ম করে। নীলমণির ক্লান্তিটা ঘোচে এতে।

শূন্য চায়ের কাপ পায়ের কাছে ঘাসে রেখে নীলমণি বেল্ট ঢিলে করে সামনে দু'পা ছড়িয়ে একটু চিৎ হলেন। ওই অবস্থায় সিগারেট ধরিয়ে নক্ষত্র দেখতে থাকলেন।

গেটের মাথায় বুগানভিলিয়ার ঝাঁপিতে একটা উজ্জ্বল আলোর বাল্ব টাঙানো আছে। একজন সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে কাঠপুতুল হয়ে। অন্তত যতক্ষণ বড়বাবু তাকে দেখতে পাবেন ততক্ষণ। একটু পরে সে পাশের চায়ের দোকানের গ্যাঁড়ার মায়ের সঙ্গে হাসিতামাশা করবে। উপায় কী? এভাবে খামোকা ভারি সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয়?

নীচে হাইওয়ে। বড় বড় ট্রাক আওয়াজ তুলে যাতায়াত করছে। সারা শীত ধুলোয় ধূসর হয়ে যায় দু'পাশের গাছপালা আর ঘরবাড়ি। বুগানভিলিয়ার ঝাঁপিতে ধুলো জমতে দেওয়া হয় না অবশ্য। দু'বেলা পালাক্রমে সেপাইরা প্রকাণ্ড পিচকিরিতে জল ছেটায়। এ বড়বাবুর এইসব বাতিক আছে। বদলি হয়ে অন্য বড়বাবু আসবেন। তাঁর এমন বাতিক না থাকতেও পারে।

সেন্ট্রি চমকাল। একটি মেয়ে হাইওয়ে থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে গেটে এসে একটু দাঁড়াল। সেন্ট্রির দিকে একবার তাকাল। পাগলী-টাগলী নাকি? কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি! কিন্তু এ কী! ওর শাড়ি রক্তে মাখামাখি! সেন্ট্রির ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল।

নীলমণি চোখের কোণায় লক্ষ্য রেখে বললেন—কে?

—আমি। গিরিজাকে খুন করেছি।

নীলমণি লাফিয়ে উঠে বললেন—মাই গুডনেস! আপনি নীলিনীবাবুর মেয়ে না?

গার্গী শান্তভাবে মাথাটা দোলাল।……

॥ বাইশ ॥

পাখি উড়ে গেছে

ফাল্গুনের নিঃঝুম ভোরে তখনও ঘন কুয়াসায় ঢাকা চারদিক, চপলা বাস থেকে নামল। কলকাতাগামী ভোরের ট্রেন ধরিয়ে দিতে বাসটা আসে দোমোহানী হয়ে। এই বাসটার জন্য সারারাত জেগে থেকেছে চপলা। তাই চোখ দুটো জ্বালা করছে। সে হাসপাতালের পাশের রাস্তায় নেমে গোড়াবাঁধানো বটগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে এক হিন্দুস্থানী বংশপরম্পরা চা বানিয়ে বেচে। চপলার সঙ্গে তার চেনা হয়ে গেছে অনেকদিন থেকে। তখন সে সবে উনুনে হাওয়া দিচ্ছে টিনভর্তি জল চাপিয়ে। গ্রাম থেকে লোকেরা হাসপাতালে অসুস্থ আত্মীয়স্বজনকে দেখতে আসে এবং ভজুয়ার কাছে চা খায়। বিস্কুট বা শস্তা কেকও খায়। আর বটতলার লাল সিমেন্টের গোল বেদীতে থাকেন এক সাধু। তাঁকে দশ-বিশ পয়সা প্রণামী দিয়ে ৺নারায়ণশিলার পবিত্র স্পর্শধন্য ফুলের পাপড়ি পায়। রোগীর মাথায় গুঁজে দিয়ে আসে। চপলা চঞ্চল চোখে হাসপাতালের গেটের দিকে তাকিয়ে বলল—ভজুয়াদা, এখন ঢুকতে দেবে না ভেতরে?

ভজুয়া রসিকতা করে বলল—হাঁ, হাঁ। তুমকো কৌন মানা করবে? যাও না, চলিয়ে যাও!

চপলা হাসল।—নাঃ। চা-ফা দাও বাপু আগে।

—থোড়া দের হবে, দিদি। একটু বোসো।

—চপলা ঝুঁকে গিয়ে তার হাত থেকে তালপাখা কেড়ে নিল। বলল—থামো! ওই করে আঁচ উঠাবে, তাহলেই হয়েছে।

ভজুয়া হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। আড়ামোড়া দিয়ে কুয়াসা দেখতে দেখতে আনমনে বলল—কেত্তা কুঁহা! তারপর চপলার উদ্দেশে—হাঁ দিদি! কার বেমারি হইয়েসে?

চপলা পাখা দোলাতে দোলাতে বাঁকা মুখে বলল—আবার কার ? আমার সোয়ামীর। তা নেলে এই সাতসকালে তোমার দোরে ঝি-গিরি করতে আসব ক্যানে, বলো ?

ভজুয়া ফের হ্যা-হ্যা করে হাসল।—কী বেমারি, দিদি ?

চপলা চোখে হেসে একবার ঘুরে বলল—বুকের ভেতর ঘা গো, বুঝলে ? খুব কঠিন রোগ।

ভজুয়া জিভ চুকচুক করল। সাধুবাবা পাশেই ভাগীরথীতে স্নান করে এতক্ষণে ফিরে আসছেন। হাতে কমণ্ডলু। ভজুয়া তাঁকে দেখে মন্তব্য করল—তব্ সুরয উঠা জব্বর। বাবার আস্নান হইয়ে গেল। কেত্তা কুঁহা দেখো দিদি আজ !

চপলা পাখা রেখে উঠে দাঁড়াল। তারপর সটান সাধুবাবার কাছে গেল। শালগ্রাম লক্ষ্য করে সে একটা আধুলি ছুঁড়ে প্রণাম করল। সাধু গঙ্গাজল ছড়াচ্ছিলেন কমণ্ডলু থেকে। আড়চোখে আধুলিটা দেখে এককুচো কী ফুলের পাপড়ি এগিয়ে দিলেন। চপলা দু'হাতে ভক্তিভরে নিয়ে আঁচলে বাঁধল।

ভজুয়া দিনের প্রথম খদ্দেরকে যত্ন করে গেলাস ভর্তি চা দিল। চপলা বাঁশের বেঞ্চে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চায়ে চুমুক দিতে থাকল। এবং বলল—ও ভজুয়াদা, আমাদের গাঁয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা একটা মানুষ খুন হয়েছে, জানো ?

ভজুয়া নিরাসক্ত ভাবে বলল—খুন তো রোজ-রোজ হচ্ছে দিদি। হরঘড়ি জখমী লোক আনছে হাসপাতালে। বৈঠা-বৈঠা দেখছি। ক্যা হালত হইয়ে গেল দেশে !

চপলা বলল—সে-খুন নয় গো ! আমারই মতো একটা মেয়েছেলে একটা গুণ্ডাকে কুপিয়ে মাছকাটা করেছে।

ভজুয়া বলল—হাঁ ! তারপর কী হয়েসে ?

—তারপর নিজেই পুলিশের কাছে ধরা দিয়েছে। বুঝলে ভজুয়াদা, ভদ্রলোকের মেয়ে। এই টাউনের কলেজে পড়ে।

ভজুয়া অস্পষ্ট ভাবে কিছু বলে দ্বিতীয় খদ্দেরের দিকে মনোনিবেশ করল। একে একে তার স্থানীয় খদ্দেররা আসতে শুরু করেছে। কেউ জুতো সেলাই করে, কেউ ম্যুনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার বা মেথর, কেউ রিকশো চালায়। গাঁয়ের খদ্দেররা আর একটু বেলা হলে আসবে।

চপলা চা খেয়ে উঠল। পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে হাসপাতালের গেটের

দিকে এগিয়ে গেল। বুকের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল। কেউ যদি তাকে রতনকুমারের কাছে যেতে না দেয়? সারারাতের অস্থিরতা তাকে ঠেলে এনেছে এখানে। নোলে ভটচাযের মেয়ের কীর্তি সবিস্তারে বলবে বোম্বাইকা বাবুকে। বলবে, আর কী বোম্বাইকা বাবু? তোমার ভালবাসার মেয়ে তো জেলে ঢুকল। বিচারে ফাঁসিটাসি না হয়ে যায় না। তবে আর কিসের আশা?···তারপর চপলা প্রচণ্ড হাসবে। ভীষণভাবে হাসবে।

বোম্বাইকা বাবু যদি বলে—তাহলে ও চপলা, তুমি তো আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে, এসো—চপলা বাঁকা হেসে বলবে, সে-চপলা তো কবে মরে গেছে! এ-চপলা তার ভূত। আর দেখ বোম্বাইকা বাবু, হতভাগিনী চপলা বড় দুঃখে ঠেকে শিখেছে, উড়োপাখির ছায়ার পেছনে দৌড়ুতে নেই।

নিঃঝুম নির্জন হাসপাতালের করিডোরে চপলাকে কেউ বাধা দিল না। শেষ-দিকটায় চার নম্বর কেবিনের দরজার পর্দা তুলেই সে থমকে দাঁড়াল

এক বৃদ্ধা পা ঝুলিয়ে বসে আছেন খাটে। চপলাকে দেখে তিনি ডাকলেন —এই যে মেয়ে, শোনো।

চপলা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—আপনি কে গো? এ ঘরে যে ছিল, সে কোথায়?

বৃদ্ধা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন—তুমি জমাদারনী নও?

চপলা জোরে মাথা নাড়ল।

—যাও, জমাদারনীকে ডেকে দাও তো শিগগির! ঘরটা কী নোংরা দেখছ না?

চপলা দ্রুত সরে এল। করিডোরে একজন সিস্টার আসছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—এখানে কী করছেন আপনি? চলে যান—এখন পেসেন্টদের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম নেই। বিকেল চারটেয়।

চপলা ব্যস্তভাবে বলল—দিদি, এই ঘরের লোকটা কোথায় গেল বলতে পারেন?

সিস্টার ভুরু কুঁচকে বললেন—কোন লোকটা?

চপলা আস্তে বললে—রতনকুমার নাম। এই চার নম্বরে ছিল।

সিস্টার একটু অবাক হয়ে বললেন—উনি তো কালই রিলিজ হয়ে চলে গেছেন।

—চলে গেছেন? চপলার মাথা ঘুরে উঠল। সে ভেজা-চোখে তাকিয়ে বলল—কিন্তু···

—আপনি কে? কোথায় থাকেন?

চপলা সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—কোথায় গেছে বলে যায় নি দিদি?

—না। তবে কোথায় যাবেন ভদ্রলোক? নিশ্চয় দোমোহানীতে ফিরেছেন। আপনি কোথায় থাকেন?

চপলা শুধু বলল—দোমোহানীতে যায় নি। তারপর ঘুরে দ্রুত পা বাড়াল।

পেছনে একজন নার্স বললেন—কে স্থচরিতাদি? সেই ফিল্ম-হিরো? উনি তো বোম্বে চলে যাবেন বলছিলেন। স্থটিং শুরু হবে যেন কোন ছবির।

চপলা থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ঘুরল না। দাঁতের ফাঁকে শুধু বলল—মিথ্যে কথা।

সিস্টার হাসছিলেন।—এই ভদ্রমহিলা ওঁর খোঁজ করছিলেন, তবু। বুঝলে?

নার্স চাপা গলায় কী বললেন। তারপর দুজনে হাসাহাসি করতে থাকলেন। চপলা ফের চলতে থাকল। প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি গিয়ে সে ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর টের পেল, চোখ উপচে জল আসছে। কিছুতেই বাধা মানছে না। তখন সে 'উঃ মাগো' বলে সশব্দে কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাসপাতালে এমন কান্না কতবার কতজন কেঁদে যায়। কেউ তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য করছিল না।

রাস্তায় নেমে সে আত্মসম্বরণ করল। তারপর সাধুবাবার বটতলার পাশ দিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলতে থাকল। ভাঙনরোধী সবুজ বনের মাথায় লাল হলুদ কতরকম ফুল ফুটেছে এ বসন্তে। কুয়াসা করে রোদ্দুর ঝকমক করছে। পুরনো আমলের পাথরে বাঁধানো ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে সে আঁচলের ফুলটা জলে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর মুখ ধুলো। চোখে জলের ঝাপটা দিল।

তারপর আঁচলে মুখ মুছে ঘাটের ওপরের ধাপে চুপচাপ বসে রইল। বহতা নদীর জলের দিকে তাকিয়ে চপলা অনেক এতোল-বেতোল কথা ভাবতে থাকল।

কিছুক্ষণ পরেই তার মাথায় এল, খামোকা কী ছাইপাঁশ ভাবছে এখানে বসে? তার চেয়ে দুপুরঅব্দি এক পাতানো মাসির বাড়ি কাটিয়ে ছবিঘরে টিকিট কাটতে লাইন দেওয়াতে অনেক স্থখ। 'বানারসী বাবু' ছবিটা দেখা হয় নি। খুব ভাল ছবি নাকি।

চপলা চঞ্চল পায়ে হাঁটতে থাকল।······

॥ তেইশ ॥

উপসংহার

শিবুর প্রচুর তদ্বির, এবং দোমোহানীর সর্বসাধারণের মনে গিরিজার মৃত্যুতে স্বস্তির ভাবও একটা কারণ, গ্রীষ্মের শেষদিকে গার্গী নিম্ন আদালত থেকেই খালাস পায়। নীলমণি দারোগার চার্জশিটে গণ্ডগোল ছিল বিস্তর। মজার কথা, গিরিজার মুরুব্বী স্থানীয় রাজনীতিকবৃন্দও গা-গছ্ করেন নি। গিরিজা তাঁদের কাছেও ছিল শাঁখের করাত। দস্তুরমতো একটা প্রব্লেম। ওকে ট্যাকল করা কঠিন ছিল বরাবর।

তাছাড়া ট্রাডিশন—দুর্বৃত্তরা তুচ্ছ মৃত্যুবরণ করে। এ অঞ্চলের প্রাচীন প্রবাদঃ 'দুষ্টের মরণ গো-ডহরে।' গো-ডহর মানে গবাদি পশু চলাচলের রাস্তা।

অবশ্য প্রকৃতি শূন্যতা সয় না। ফের দুর্বৃত্ত জন্মায়। জন্মাচ্ছে দোমোহানীতে। একদিন তারও একই ভাবে মৃত্যু হবে। ট্রাডিশন।

বর্ষায় দোমোহানীকে চঞ্চল করে 'পল্লীবার্তা' আবার বেরুল। সম্পাদিকা গার্গী ভট্টাচার্য। প্রকাশক হেমেন রায়। প্রগতি প্রেসের জন্য টুকিটাকি কাজ জুটিয়ে আনে গার্গী। একজন কম্পোজিটার রেখেছে। গিরিজা-হত্যায় সে এতদঞ্চলে রক্ষাকর্ত্রী বলে সম্মানিত। এ গার্গী সেই ভীরু, শান্ত, কোমল মেয়েটি নয়। তার ঠোঁটে ও চিবুকে প্রচ্ছন্ন রেখাগুলি স্পষ্টতর হয়েছে এবং তার চেহারায় ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়েছে। 'পল্লীবার্তা'র পুনঃপ্রকাশ উপলক্ষে স্বয়ং জেলা-শাসক এসেছিলেন অনুষ্ঠানে। গার্গী দৃঢ়কণ্ঠে মাইকের সামনে ঘোষণা করে—বাবার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করব আমরা। সে-সভায় অন্ধ হিতেনবাবুও গিয়েছিলেন। তিনি আচমকা বিকট চেঁচিয়ে বলে ওঠেন—জয়মারস্তু শুভায় ভবতু।

ছেলেমেয়েরা এবং আমোদগেঁড়েরা হেসে খুন। এক কপি করে 'পল্লীবার্তা' বিলোনো হয়েছিল। সম্পাদকীয়ের ভাষা হুবহু নোলে ভটচাযের। তাঁর আত্মা মেয়েকে ভর করেছে নিঃসন্দেহে।

কিন্তু ওই নবপর্যায় প্রথম সংখ্যায় 'রতনকুমারের পুনঃ অন্তর্ধান—কে ছিল ওই আগন্তুক' শীর্ষক রচনাটি কার লেখা ? হেমেন মুচকি হেসেছে প্রশ্নের জবাবে। ওটা জার্নালিস্টিক সিক্রেট। ফাঁস করা যায় না।

সেই রচনার কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে, আসুন পাঠক, আমরা এই উদ্ভুটে আখ্যানের নটেগাছটি মুড়িয়ে দিই। ফের পাতা গজাতে পারে। গজাবে।

'...সতের বছর পরে ঘোষের ডাঙার যে নিরুদ্দিষ্ট বালকের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল সুদর্শন সুশিক্ষিত যুবকরূপে, সে আবার অন্তর্হিত হয়েছে। সত্যই কি সে ফটিক? এখন বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ ফটিকের কাকা কেষ্টপদর উন্মাদরোগ সম্প্রতি সেরে গেছে এবং সে সব শুনে নাকি বলেছে, হতেই পারে না। ফটিককে সেই হাতিওলা সাধু বলি দিতেই নিয়ে গিয়েছিল। তোমরা কি ফটিকের গলার কাছে ঘায়ের দাগ লক্ষ্য করেছিলে? দাগ ছিল না? তাহলে সে ফটিক নয়। তোমরা তো জানো, আমার দাদা শীতু ঘোষ বড় রাগী লোক ছিল। ছেলেও ছিল মহা পাজি। দাদা রাগের চোটে কাটারি ছুঁড়ে মেরেছিল। গলায় সেই দাগ বরাবর ছিল ফটিকের।...না, সম্ভবত আমরা কেউ রতনকুমারের গলায় তেমন কোন ক্ষতচিহ্ন দেখি নি। কেউ কেউ বলে, বড় চুলে গলাঅব্দি ঢাকা ছিল। কে জানে! যাই হোক, তার অন্তর্ধানের ব্যাপারটাও রহস্যময়। অবশ্য আমাদের মাঝে মাঝে ধারণা হয়, বোম্বাইয়ের ঔরসে পল্লীবাংলার গর্ভে এমন দু'একটি রত্ন অদূর ভবিষ্যতে জন্মাতেও পারে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু মনে ঈষৎ বিষণ্ণতা থেকে যায়, যুবকটির স্বভাব বড় মধুর ছিল। দোমোহানীর আবালবৃদ্ধবনিতা তার হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি আমৃত্যু হৃদয়ে গেঁথে রাখবে।...'

এর ক'দিন পরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। গার্গী বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ির সামনে সেই নষ্ট বাগান পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত। নতুন চারা ও বীজ এনেছে শহরের নার্শারি থেকে। অনুমাসি বারান্দা থেকে বার বার বলছেন—ও গাগু, আর ভিজিসনে মা। জ্বর বাধাবি নাকি? এমন সময় পলিথিনের রেনকোট গায়ে সাইকেল চেপে পিওন এল। ঘন্টি বাজাল বাঁশের গেটের কাছে। গার্গী এগিয়ে গেল। রোজই অনেক চিঠিপত্র আসছে। গল্প কবিতা প্রবন্ধ আসছে নানা জায়গা থেকে। আগেও এমনি আসত।

চিঠির গোছা আঁচলে ঢেকে দৌড়ে গার্গী বারান্দায় গেল। অনুমাসির হাতে সেগুলো রাখতে দিতে গিয়ে একটা নীল খাম দেখে চমকাল।

সেই খামটা ভিজেহাতে ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল সে। নিষ্পলক হয়ে গেল তার দুটি চোখ। রতনকুমারের চিঠি। ইংরেজিতে গোটা গোটা সুন্দর হরফে লিখেছে: 'গার্গী ডার্লিং, বলেছিলে, তোমার পরীক্ষা শেষ হলেই তুমি চলে